মজা নদীর কথা

(উপন্যাস)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাত্যায়নী বুকষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম
কাত্যায়ণী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আড়াই টাকা

১৩৪৮, ফাল্গুণ

প্রিণ্টার—পরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রজতুল্য সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু।

ভাগ্য ভাল, তাই হাজার কয়েক আবেদনকারীর মধ্যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা
অমিয়র যোগ্যতা নিরূপিত হইল। অমিয় রেল-আপিসে চাকরি পাইল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শোনা যাইত এই বিভাগ পথের লোককে ডাকিয়া
ডাকিয়া চাকরি দিত। তখন এত আবেদন-নিবেদনের বালাই ছিল না,
বাছাবাছার হাঙ্গামা ছিল না, বয়স-জাতির প্রশ্নও সঙ্গীন হইয়া উঠে
নাই। একাদিক্রমে ৫০ বৎসর চাকরি করিয়াও অবসর লইবার কল্পনা
কেহ করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া হাজার হাজার যুবক
বাছাই-ছাঁটাই ধান্যের মত বাজারদরকে মৃত্তিকার সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া
তোলে নাই। বৃদ্ধেরা বলিবেন, সে সব দিন ছিল সোনার দিন, এখনকার
ছেলেরা আজিকার দিনকে বলেন সঙ্গীন। সে যাহা হউক, জগৎ-
সভ্যতার হরেক রকমের প্রগতিবাহী ধ্বজার মধ্যে বেকার-সমস্যার
ধ্বজাটিও প্রায় সব দেশে সবেগে আন্দোলিত হইতেছে। জগৎ সভ্য
হইতেছে, ভারতবর্ষকেও সেই সভ্যতার তাল বজায় রাখিতে হইতেছে।

রেল-আপিসের অনেক বিভাগ, তন্মধ্যে যে-বিভাগে অমিয় স্থান
পাইল তাহার কথাই ধরা যাক।

বিভাগটি ছোট; মাত্র ত্রিশ জন কেরানী দশটা পাঁচটায় কলম চালনা
করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একজন কর্ম্মীর
পরলোকপ্রাপ্তির সুযোগে অমিয়র সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। তাহারই
শূন্য চেয়ারে গিয়া অমিয় বসিল।

চেয়ারের বিপরীত দিকে বসিয়া যিনি কাজ করিতেছিলেন তিনি চশমার ফাঁক দিয়া অমিয়র পানে চাহিলেন। লোকটির বয়স বলা রেল-বিভাগীয় নিয়মানুসারে অবসরমুখী। চেহারাটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দশাই এবং রংটি কালো। মাথার চুল একটিও পাকে নাই, টাকের ক্ষেত্রটি [illegible] প্রসার লাভ করিয়াছে। কালো ফ্রেমের বৃহৎ চশমার অভ্যন্তরে সুবৃহৎ চক্ষু দুইটি কখনও বিস্ফারিত, কখনও ধ্যানস্তিমিত। মুখে ঊর্ধ্বোষ্ঠ ঢাকিয়া এক জোড়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন গোঁফ এবং সদাহাস্যকুঞ্চনে সে-গোঁফ নৃত্যচঞ্চল।

প্রায় মিনিট-খানেক তিনি নিঃশব্দ দৃষ্টির দ্বারা অমিয়র আপাদমস্তক উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিলেন ও আপন স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "আপনার নামটি কি ভাই?"

অমিয় নাম বলিল।

"বাড়ী?"

"হরিপুর।"

"কোন জেলায়?"

"নদীয়া!"

অমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সেকথা আমারই ধরে নেওয়া উ[illegible]ত ছিল। কথায় যখন টান নেই তখন ফরিদপুর জেলা হ'তে যাবে কে[illegible]! তা বরাত আপনার ভাল, এই তো ত্রিশ টাকার পোষ্ট তার জন্যে ক[illegible]সে কম দরখাস্ত পড়েছিল হাজার পাঁচেক।"

অমিয় মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিল।

অমলবাবু বলিলেন, "ছিল আমাদের দিন! হুট্ বলতেই চাকরি। যা করতেন ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু। এখন ওঁরা হয়েছেন জগন্নাথ। য[illegible]

করেন সিলেকসান্ বোর্ড। তা আপনাকে ইণ্টারভিউ দিয়ে কি কি জিজ্ঞেস করলে ?"

অমিয় বলিল, "প্রথমে বললে, বোম্বে যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা কোন্‌টা।"

অমলবাবু চশমার মধ্যে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলিলেন, "বম্বে যাবার সোজা রাস্তা! শোন একবার কথা! আমরা এত দিন রেল-আপিসে চাকরি করছি, পাস নিয়েছি কত দিকে, বম্বে গিয়েছিও বার কতক, আমরাই কি বলতে পারি ছাই! বললে তুমি ?"

"বললাম বই কি। সদ্য রেলওয়ে ম্যাপখানা দেখে এসেছিলাম। জিওগ্রাফি, হিষ্ট্রি, কয়েকদিনের খবরের কাগজ এমন কি আপনাদের কোচিং টেরিফের খানিকটা মুখস্থ ক'রে ফেলেছি যে।"

"বটে! তার পর কি জিজ্ঞেস করলে ?"

"মান্দ্রাজ গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস কোন্‌টা ?"

সবিস্ময়ে অমলবাবু বলিলেন, "বললে, বললে তুমি!"

"বল্‌লাম বইকি। বললাম 'উটি', কিনা ওটাকামণ্ড।"

"তার পর ?"

তার পর জিজ্ঞেস করলে, "এ বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় হকি টীমের নাম কর।"

অমলবাবু বিস্ময় আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উচ্চৈস্বরে জনৈক সহকর্ম্মীকে আহ্বান করিলেন, "ওহে শম্ভু, ও ভাই, শোন, শোন। ওঁকে, এই অমিয়-ভায়াকে, তোমাদের সিলেক্‌সান বোর্ডের প্রভুরা কি কি জিজ্ঞাসা করেছেন, শোন। শুনে হেসে আর বাঁচি না।" বলিয়া পরম খুশীভরে তিনি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শম্ভুচন্দ্র অমলবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াও অমলবাবুর মাথা-সমান হইলেন। রঙে রং মিলিল। আর কিছুরই

সাদৃশ্য দেখা গেল না। বয়সের বহু প্রভেদ; চোখে চশমা, মুখে গোঁফ, মাথায় টাক, কোনটারই মিল নাই।

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন "দাদা যে হেসেই অস্থির। বলি ব্যাপারখানা কি?"

অমলবাবু বলিলেন, "শোন, ঐ ভায়ার মুখেই শোন। বলুন ত ভায়া।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "দাদা, এ আপনার বড় অন্যায়। ওঁকে ভায়া বলছেন, আবার আপনিও বলছেন!" পরে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "বুঝেছেন অমিয়বাবু, ইনি আমাদের সার্ব্বজনীন দাদা। সাহেব বড়বাবু থেকে বাচ্চা চাপরাশী পর্য্যন্ত এঁকে দাদা ব'লেই জানে। আপনিও—"

অমলবাবু হো হো করিয়া হাসিলেন, "শোন, শম্ভু-ভায়ার কথা শোন। আমি নাকি সবারই দাদা!"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "যে-কোন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে আমরা বাঙালীরা বড় তৃপ্তি পাই, তার মধ্যে দাদা-সম্পর্কটি বড় মিষ্ট। বাবু বলাটা সব সময়ে আমাদের ধাতুসহ নয়। আপনি কি বলেন, অমিয়বাবু?"

অমিয় বলিল, "তা সত্যি। কিন্তু এইমাত্র আপনি সে নিয়ম লঙ্ঘন করলেন।"

শম্ভুচন্দ্র হাসিলেন, "পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'লে নিয়ম মেনেই চলব। আমরা না চাইলেও আমাদের ভদ্রতার বালাই বড় বেশী। সাহেবরা দিনরাত বাবু ব'লে ব'লে আমাদের কান দুটিতেও ঐ মধু ভরে দিয়েছে। 'বাবু' ব'লে সম্বোধিত না হ'লে, তাই, আমাদের কান ও মন দুই-ই গরম হ'য়ে ওঠে।"

অমলবাবু হাসিলেন, "ঠিক বলেছ ভায়া, ঠিক বলেছ। আমরা বামুনের ছেলে, হিন্দুর ছেলে, আমাদের এসব ম্লেচ্ছপনা চলে না। কি

করি, বাপপিতামহ কিছু রেখে যান নি, বিদ্যাস্থানে নৈবচ, পৈতে দেখিয়ে যজমান ভোলানর দিন আর নেই, কাজেই এই গোলামগিরি।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন "ভাবতে গেলে অনেক কিছুই ভাবতে হয়। ও বামুন কায়েত বণিক সকলের দশাই সমান, অথচ জাত জাত ক'রে আমাদের বড়াই আজও গেল না।"

অমলবাবু চশমার ফাঁকে এদিক-ওদিক চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "জাতিতত্ত্ব থাক ভায়া, বড়বাবু এদিকে আসছেন।" পরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "এঁর কাজকর্ম্ম তুমিই না-হয় একটু দেখিয়ে দাও, ভায়া। আমার আবার উইথড্রন রেজেষ্ট্রিখানা আজ সারতে হবে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গভীর মনোযোগভরে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

বড়বাবু ততক্ষণে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একটু থামিয়া তিনি শম্ভুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার বুঝি কাজ নেই?"

শম্ভুচন্দ্র শুষ্ক মুখে বলিলেন, "না তা নয়, এই দাদা ডাকলেন—"

টপ করিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া অমলবাবু বলিলেন, "ইনি নূতন লোক কি না কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার কাজের তাড়া না থাকলে—"

বড়বাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কাজ বোঝাবার নাম ক'রে তো দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছেন আপনারা। প্রায় পনর মিনিট হ'ল লক্ষ্য করছি, আপনাদের হাসি গল্প আর থামেই না! তাই তো উঠে আসতে হ'ল।"

অমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাসছিলাম কি আর সাধে। শুনুন না আপনাদের সিলেক্‌সান্ বোর্ডের আজগুবি আজগুবি কোশ্চেন! বম্বে

যাবার সোজা রাস্তা কোন্‌টা ? বলে পঁচিশ বছর রেলে কাজ ক'রে বম্বে গিয়ে আমরাই—"

বড়বাবু বলিলেন, "আরও পঁচিশ বছর কাজ করলেও আপনার জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়বে না দাদা। এক ডি. টি. এস.'র কাগজপত্র আর এক ডি. টি. এসকে পাঠিয়েছেন, সাহেব তো রেগে আগুন।"

অমলবাবুর চক্ষুর জ্যোতি সহসা চশমার মধ্যেও স্তিমিত হইয়া গেল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কোন্‌ ষ্টেশন দাদা ?"

বড়বাবু নাম করিলেন।

অমলবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সহসা খপ করিয়া বড়বাবুর ডান হাতখানি ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এইবার বাঁচা দাদা, আর এমন ভুল হবে না। যে সব টেবিলের চার দিকে জটলা করে ওতে কখনও মাথা ঠিক থাকে।"

বড়বাবু বলিলেন, "আর কারও টেবিলে জটলা হয় না আপনার এইখানেই যত গল্প, আড্ডা। যদি বাঁচতে চান আজ থেকে আড্ডাটা—"

"আবার ! এই নাক মলছি, কান মলছি, আজ থেকে টুঁ শব্দটি নয়। পঁচিশ বছর কাজ ক'রে এমন ভুল তো কোন দিন হয় নি।"

বড়বাবু সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া শম্ভুচন্দ্রের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তা, ওঁকে এখানে কি কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছ ? নতুন লোক, রেট-চেক করার সুবিধা হবে কি ?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "তবে কি কাজ দেবেন ?"

"আমি বলি কি রেট-চেকের ভার তুমি নাও, এঁকে তোমার জায়গায় লেজারে দাও। সাদা কাজ, পারবেন।"

শম্ভুচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কিন্তু রেট-চেকারের পোষ্টেই ত ওঁকে নেওয়া হ'ল, শিখিয়ে দিলে কেন পারবেন না।"

বড়বাবু বলিলেন, "দশ-পঁচিশ বছর কাজ ক'রে তোমাদেরই সেক্সন জ্ঞান হ'ল না, উনি নূতন এসে সে-সব পারবেন?"

অমলবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা পারবেন উনি। ইন্টারভিউ দিতে এসে আদ্ধেক কোচিং টেরিফখানা নাকি মুখস্থ ক'রে এসেছিলেন।"

বড়বাবু অমলবাবুর কথায় কর্ণপাত না-করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে বলিলেন, "যাও, ওঁকে কাজ বুঝিয়ে দাওগে।"

গম্ভীর ভাবে আদেশ দিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিতেছিলেন। অমল বাবু ওরফে দাদা তাঁহাকে ডাকিলেন, "আরে দাদা চললেন যে! একটা পান মুখে দিয়ে যান।" বলিয়া ঘটাং করিয়া ড্রয়ারটা টানিয়া পানের ডিবা বাহির করিলেন।

দাদা পান খান প্রচুর। দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অনবরত পানের জাবর না-কাটিলে কাজে নাকি তিনি উৎসাহ পান না। কাজেই কাশী বেড়াইতে গিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জার্ম্মান সিলভারের বৃহৎ ডিবা ওরফে টিফিন্-বাক্সটি কিনিয়া আনিয়াছেন। পণ-দুই পান উহার গর্ভজাত করিয়া বাক্সটিকে উত্তমরূপে ঝাড়নে মুড়িয়া ডেলী প্যাসেঞ্জার দাদা ন-টা একত্রিশের ট্রেনখানিতে চাপেন। পান তিনি খাইতেও যেমন ভালবাসেন, বিলাইতেও ততোধিক। ট্রেনে এবং আপিসে কেহ চাহিয়া লয়, কাহাকেও ডাকিয়া দেন। এইরূপে ডজনদুই পান নিত্য দান-খয়রাতে যায়।

বড়বাবু ফিরিলেন এবং গোটা-চারেক পান কৌটা হইতে তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন। বলিলেন, "দোক্তা!"

দাদা মাথা নাড়িলেন, "ঐটির অভাব দাদা, তোমাদের বৌদিদির

ঠেলায় পড়ে ওটি ত্যাগ করতে হ'ল। সেদিন হঠাৎ একটা কলিক্ পেন উঠল রাত্তিরে, প্রাণ যায় আর কি। ডাক্তার এসে নানা প্রশ্ন ক'রে বললেন, অম্বল। দোক্তা খাওয়াটি আপনাকে ছাড়তে হবে। এই আর যায় কোথা। ডাক্তার চলে যেতে না-যেতে দোক্তার কৌটো গেল পুকুরে, তার জায়গায় এল তামা, তুলসী, গঙ্গাজল।"

বড়বাবু হাসিলেন, "তুমি তাই ছুঁয়ে দিব্যি গাললে?"

দাদা করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "গাললাম বইকি, ভাই।"

বড়বাবু বলিলেন, "নাঃ, তুমি একেবারে গুড বয় হয়ে গেলে শেষে! তোমার ত এমন স্ত্রী-ভক্তির কথা কোন কালে শুনি নি।"

"বয়স যে বড় বালাই ভাই। একমাত্র স্ত্রী, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কাজেই ওর মনে কষ্টটা দিলাম না। কি জান দাদা, বাড়ীতে যা একটু কষ্ট, দোক্তা না মুখে দিলে মনে হয় ঘাস চিবুচ্ছি, কিন্তু আপিসে তোমরা পাঁচ জন আছ, তোমাদের দৌলতে আমার ভাবনা কি!"

বড়বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সাধু, সাধু! আমি দোক্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"শম্ভু-ভায়ার কাছে এই মাত্র পেলাম। টিফিন পর্য্যন্ত এতেই দিব্যি চলবে।"

বড়বাবু স্বগত-উক্তি করিলেন, "আমি ভাবলাম বুঝি দাদা সত্যি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করলেন।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "রামঃ বল। চিরকাল যেমন প্রতিজ্ঞা ক'রে আসছি, এও তেমনি। কাউকে কষ্ট না দিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাতে কার কি ক্ষতি বল তো শম্ভু-ভাই। হ্যাঁ, দেহের মধ্যে আত্মাপুরুষ এক জন আছেন, অন্যের মুখ চেয়ে তাঁকেও তো অবহেলা করা যায় না। যায় কি?"

শম্ভুচন্দ্র প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কক্ষনো না। আর আত্মাকে যদি তুষ্ট করতে না পারলুম তো খেটে ম'রে আমার লাভ ?"

দাদা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "শোন তবে একটা গল্প। একবার বেনারস বেড়াতে গিয়ে—"

বড়বাবু বলিলেন, "গল্পটা বরং টিফিনের সময় বলবেন, এখন কাজ করুন।"

দাদার উৎসাহ-বহ্নিতে এইরূপে এক কলসী জল ঢালিয়া দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

চশমার মধ্যে স্তিমিতপ্রায় নয়ন দুটি বড়বাবুর স্থানত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। দাদা চাপা গলায় বলিলেন, "ঐ ওঁর বড় দোষ, বড় একরোখা। যখনই তুমি ছেড়ে আপনি বলেন তখনই বুঝতে পারি গতিক সুবিধের নয়। অথচ গল্প বলবার ইচ্ছে হ'লে কাজ কি ছাই ভাল লাগে ? এই একটানা, একঘেয়ে কাজ ? বল না শম্ভুচন্দ্র ?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কাজ যদি একঘেয়ে মনে হয় আসুন না বদলা-বদলি করি। আপনি রেটে যান—"

দাদা চশমার ফাঁক দিয়া বৃহৎ চক্ষু দুটি ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, "রেট! ঐ জ্যান্ত কাজ! মাপ কর দাদা! এ তবু যাহোক নেড়ে চেড়ে খাচ্ছি, ওখানে গেলে আর নড়ে পথ্যি করতে হবে না। তোমরা বল মরা কাজ, এই আমার ভাল দাদা।"

শম্ভুচন্দ্রও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পাইয়া স্বস্থ বোধ করিতেছিলেন না। কিন্তু অলঙ্ঘ্য আদেশ বড়বাবুর, উপায় নাই।

২

ঘণ্টা বাজাইয়া টিফিন হইল।

ও-ধারে মেশিন-রুমে খটাখট আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। বিশ্রামের মুহূর্ত্তটিতে ইহাদের সময়ানুবর্ত্তিতার প্রশংসা না-করিয়া উপায় নাই। প্রায় জন-ত্রিশেক লোক হাত মুছিতে মুছিতে ও গল্প করিতে করিতে ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখে খোলা মাঠ। সেখানে কেহ কাগজ পাতিয়া শুইয়া পড়িল, কেহবা খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল, কেহ বিড়ি টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, কোথাও বা কয়েক জন মিলিয়া ময়লা ছেঁড়া তাস বাহির করিয়া "বিন্তি" খেলিতে লাগিল। আধ ঘণ্টা মাত্র বিরাম, এই অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে তাসখেলা, নিদ্রা, সংবাদপত্র পাঠ ও নানা প্রকারের সমস্যা লইয়া আলোচনা চলে। হয়ত কোনটাই সম্পূর্ণ হয় না; সম্পূর্ণ না-হইলেও অসন্তোষ উহাদের কাহারও নাই। যে-জীবনপুষ্প অকাল বসন্তের দিনে সহসা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, শোভা ও সুগন্ধ তাহার পক্ষে অনাবশ্যক; দক্ষিণের বাতাস না পাইলেও বৃন্তে তাহারা দুলিয়া থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়ে। সেজন্য কাহারও মাথাব্যথা নাই; না ফুলের, না দক্ষিণা বাতাসের। আল্‌গা বৃন্তে বসিয়া তাহারা ক্ষণিকের দৃষ্টিতে যতটুকু নীল আকাশ দেখিতে পায়, যতটুকু সূর্য্যকিরণ পান করিতে পারে, রৌদ্রে এবং ছায়ায়, বাতাসে এবং বাদলে, যে অসম্পূর্ণ দাক্ষিণ্য তাহাদের ভাগ্যে মেলে তাহাতেই তাহারা ধন্য হইয়া যায়। যাহাদের আরম্ভের ইতিহাস নাই, উত্তরকাণ্ডরচনায় তাহাদের মন স্বভাবতঃই বিমুখ।

দাদার টেবিলের চারি পাশে গল্পের আসর জমিয়া উঠিয়াছে।

ছোকরা দলের অভয়, বিপিন, অমূল্য আসিয়াছে, বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে সুরেন, শান্তি, খগেন ও নিত্যহরি জুটিয়াছেন। পান, দোক্তা, বিড়ি, সিগারেট মুহুর্মুহু চলিতেছে; দাদাকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য এই আসর জমিয়া উঠে।

নবাগত অমিয় চুপি চুপি উঠিয়া গিয়াছে। গল্প এবং ধোঁয়া দুইটাই সে সহ্য করিতে পারে না। সে স্বভাবতঃ লাজুক-প্রকৃতির, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তার নাই। কলেজ-জীবনের পর চাকুরি জীবন ঠিক বিস্তীর্ণ রৌদ্রালোকিত প্রান্তর-ভ্রমণের পরক্ষণেই আলোবায়ুহীন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে আত্মসমর্পণের মত। অন্ততঃ একটি দিনের অভিজ্ঞতায় অমিয়র তাই মনে হইল।

মাঠের ধারে লৌহবৃতির উপর পা রাখিয়া সে উপর পানে চাহিল।

মধ্যাহ্নের আকাশ। রৌদ্রদীপ্তি আছে ও চক্রাকারে চিল উড়িতেছে। মুক্ত আকাশে উঠিয়াও চিল চক্রাকারে ঘুরিতেছে কেন? প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ, জীবজগতের কার্পণ্য সেখানে সমধিক। মুক্ত আকাশ পাইয়াও খানিকটা জায়গায় চক্র রচনা করিয়া চিল উড়িতেছে, টিফিনের ছুটিতে খোলা মাঠে বৃত্তাকারে বসিয়া ইহারাও তেমনই গল্প করিতেছে, তাস খেলিতেছে!

ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিতেই অসম্পূর্ণ খেলা, গল্প বা ঘুম ফেলিয়া লোকগুলি ত্বরান্বিত হইল। ক্ষুদ্র গৃহে আবার জনস্রোত প্রবেশ করিল, মেশিনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজ উঠিল।

দাদার টেবিলের ধারে গল্পের স্রোত তখনও উদ্দাম।

অমিয় একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন বলিল, "ঘণ্টা পড়ল।"

দাদা বলিলেন, "বড়বাবু কোথায়?"

অমূল্য উঁকি মারিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "বোধ হয় সাহেবের ঘরে।"

দাদা সোৎসাহে বলিলেন, "সারাদিন গো-খাটুনি খেটে মানুষ বাঁচে? একটু গল্পও যদি না করব—"

খগেনবাবু আপন স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "ভয় করগে তোরা, আমরা ওসব কেয়ার করি না। বলে ডুবেছি না ডুবতে আছি।"

দাদা বলিলেন, "ওরে ভাই, জগন্নাথ ঁটো শুধু ভাল করবার বেলায়, মন্দতে ওরা কম মজবুত নয়।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ভেড়ার পাল চালান আর শক্তটা কি? আমাদের অবস্থা ওপরের প্রভুরা কেউ জানেন? কচু। যা বোঝাচ্ছে, তাই।"

শান্তি সহসা অমিয়র পানে চাহিয়া খগেনবাবুকে চোখ টিপিলেন। অমিয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

খগেনবাবু শান্তির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "উনি কে? বড়বাবুর আত্মীয় বুঝি?"

নিত্যহরি বলিলেন, "তুমি যে দেখি জগৎসুদ্ধ বড়বাবুর আত্মীয় দেখ।"

খগেনবাবু বলিলেন "না, তো কি! জামাই, বেয়াই, ভাই, সম্বন্ধী, নাতজামাই, মেসমশাই, পিসেমশাই কোন্ সম্পর্কটা বাদ আছে এখানে শুনি? আমি স্পষ্ট কথা বলি, তাই মন্দ। তাই এক গ্রেডে আজ দশ বছর পড়ে আছি।"

দাদা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যারা মন্দ কথা বলে না, বাটি বাটি তেল মাখায়, তাদের অবস্থাও ত বিশেষ ভাল দেখি না, খগেন।"

খগেনবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আজও টেবিলের তলা দেখ;

ঐ কুমড়ো, ডাব, মানকচু, পেঁপে, কলা। গ্রেড না-বাড়ুক, চাকরি বজায় থাকে তো।"

এই মাত্র টিফিন না-হইলে অমিয় পুনরায় মাঠে চলিয়া যাইত। গাঢ় ধূমের চেয়ে এই আলোচনা শ্বাসরোধকর। শুধু কি শ্বাসরোধকর আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে অভিধানবহির্ভূত অশ্লীল কথার বর্ষণ। আশ্চর্য্য, কথায় কথায় উত্তেজনা যাহাদের শোভা পায় সেই যুবক দলের ক্ষোভ ততটা মারাত্মক নহে, কিন্তু ঐ সব শুভ্র কেশ, বয়োবৃদ্ধদের মুখে শ্রুতিকটু আলোচনা ও অভিধানবহির্ভূত সম্বোধন অমিয়র অন্তরে তীব্রভাবেই আঘাত করিল। ইহাদের সান্নিধ্যে ভক্তিশ্রদ্ধাকে বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত সুকঠিন সন্দেহ নাই। আধবেলার মধ্যেই চাকরিজীবন দাসত্বের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া সদ্যবিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত অমিয়কে অস্থির করিয়া তুলিল।

বাকী তিন ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না। অমিয়কে শম্ভুচন্দ্র কাজ বুঝাইয়া দিলেন, অমিয়ও খাতাকলম লইয়া কাজে মনোনিবেশ করিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাজ ছাড়া কোন কিছুতে সে মনঃসংযোগ করিবে না। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য সে চাকরি লইয়াছে, চাকরি গ্রহণ না-করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই হয়ত চাকরি লইয়াছে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বসিয়া প্রবল ভাবে স্বার্থচর্চ্চা নাই বা করিল। কে কি করিতেছে না-করিতেছে সে সন্ধান রাখিয়া তাহার লাভ কতটুকু।

ছুটি হইলে বড়বাবুকে একটি নমস্কার করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। পথে পা দিয়াই মনে হইল, কে যেন তাহাকে পিছন হইতে ডাকিতেছে।

অমিয় মুখ ফিরাইতে দেখিল, একটি সুদর্শন যুবক তাহাকে

ডাকিতেছে। অমিয় থামিতেই সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল ও হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "আজ প্রথম দিন বুঝি?

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"তা আমি মুখ দেখেই বুঝেছি।"

যুবকের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল, মুখের হাসি, কণ্ঠের স্বরে তেমনই হৃদয়বত্তার আভাস পাওয়া যায়। অমিয়র চেয়ে বড়-জোর বছর চারেকের বড়।

অমিয়র দৃষ্টিতে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "কি ক'রে বুঝলেন?"

যুবক হাসিয়া বলিল, "আরও কি বুঝলাম জানেন, চাকরি পাবা মাত্রই যারা হাতে স্বর্গ পায়, আপনি সে-দলের নন। আপনার মধ্যে শক্তি আছে, তাই ক্ষেত্র মাত্রকেই সুযোগ ব'লে গ্রহণ ক'রে ধন্য হন নি।"

অমিয় মুগ্ধ হইল। এমন ধরণের কথা এই আপিসের কর্ম্মীর মুখে শুনিবে আশা করে নাই। খুশীভরা কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু ধন্য না-হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই, এই ত্রিশ টাকার জন্য—"

যুবক বলিল, "পাঁচ হাজার দরখাস্ত, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্নেরও অভাব ছিল না, এই তো? সে হিসাবে ভাগ্য আপনার ভাল। হয়ত চাকরি পেয়ে দু-মুঠো খেয়ে বাঁচবেন—মাথা গোঁজবার একখানা চালাও জুটবে! কিন্তু তার পর? সারা জীবন এই নিয়ে কাটবে তো? এত অল্পমূল্যে অত বড় জীবনটাকে চিরটা কাল বিকিয়ে রাখবেন?"

অমিয় বলিল, "যাই হোক্, দাঁড়াবার একটা আশ্রয় পেলাম। চেষ্টা ক'রে এর থেকে ভাল একটা কিছু জুটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।"

যুবক হাসিল এবং হাসিতে হাসিতেই বলিল, "ঐটি ভুল কথা। একটা কিছু পাবা মাত্রই উদ্যম আমাদের একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভাবি, মন্দ কি, এই তো বেশ। আয় আরও কিছু বাড়বে—একটা সংসার পাতা যাক না। যখন ছোট সংসার খুব শীঘ্র বেড়ে ওঠে—আর

আয়ের আলস্যও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, মুস্কিল বাধে তখনই। তখন একটি মাত্র জিনিষের আমরা অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠি। এই যুবা বয়সে সে ভক্তিচর্চ্চা আমাদের বিষবৎ জ্ঞান করা উচিত।"

অমিয় বলিল, "কি সে জিনিষ ?"

"অদৃষ্ট। যা চিরকাল অ-দৃষ্ট, তাকে আমরা অত্যন্ত ভক্তিভরে গ'ড়ে তুলি। আমাদের পরম সান্ত্বনার অমন জিনিষ যে আর নেই।"

"বড় বড় মনীষীরাও তো অদৃষ্টবাদ মেনেছেন।"

"তাঁরা আগে বড় হয়েছেন—মনীষী হয়েছেন, পরে অদৃষ্টবাদ স্বীকার করেছেন। মনীষী হবার আগে যদি অদৃষ্টবাদ মেনে হাত-পা ছেড়ে দিতেন তা হ'লে তাঁরা আমরাই হতেন। আসল কথা কি জানেন, উপরে উঠে যা খুশী করুন বেমানান হবে না; চাই কি থুথু ফেললেও নিজের দেহটি শুদ্ধই থাকবে, নীচে থেকে থুথু ফেলতে গেলেই নিজেকে তার ফলভাগী হ'তে হবে।" একটু থামিয়া বলিল, "আর কি জানেন, বড়রা আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছেন—ঐ মনীষী, মহাপুরুষ, ঋষি, ওঁরা আমাদের জীবনকে বাণী দিয়ে দিয়ে পঙ্গু ক'রে রেখেছেন। আমরা দোষ করি—আর ওঁদের বিধান নিয়ে সে দোষ স্খালন করি। যখন সংসারে আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তখন বৈরাগ্যকে জড়িয়ে ধরি। উপায় কম হ'লে অদৃষ্ট মানি। সামাজিকতা বজায় রাখতে গিয়ে দরিদ্রবেশে দেশমাতৃকার স্তবে গদগদচিত্ত হই। ঐ খদ্দরকেও আমি পাপ ব'লে মনে করি।"

"কেন ?"

"কেন ? সত্যকে সামনে রেখে যে চলতে শিখি নি তাই তো আমাদের ভয় পদে পদে। আমরা কি সত্যই দুঃস্থ নরনারীর কথা স্মরণ ক'রে খদ্দর কিনি, না অল্পমূল্যে নিজেকে শোভন ও লোকচক্ষে মহৎ ক'রে

প্রচার করবার চেষ্টা আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে? একখানা খদ্দরের ধুতি কিনে আমরা অনেকগুলি মানুষকে অনায়াসে ঠকাতে পারি।"

অমিয় এবার হাসিল, বলিল, "আপনার যুক্তি অদ্ভুত! প্রত্যেক ভাল কাজের মন্দ দিক আছে; তাই ব'লে ভাল কাজকে ঘৃণা করা—"

যুবক হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি আমার যুক্তিকে স্পর্শ করতে পারলেন না। হয়ত আমার বলবার দোষ। দোষ মহৎ প্রচেষ্টার নয়, দোষ তো আমাদেরই। নিজের প্রবল স্বার্থের অনুকূলে যখন ঐগুলিকে আমরা লাগাই—ঐ খদ্দরের খোলস, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, মহাত্মার ত্যাগ, তখনই তা সমাজ এবং দেশকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

অমিয় বলিল, "তা হ'লে বলতে চান ওগুলি না থাকাই ভাল?"

যুবক বলিল, "তা আমি জানি না। যেখানে পাপ সেইটুকু শুধু আমার চোখে পড়েছে, প্রতিকার কিসে, কোন দিন তা ভাবি নি।"

অমিয় বলিল, "তা হ'লে খদ্দর পরাকে পাপ বলবেন না। প্রকৃত সাধুর ভান ক'রে জালিয়াতও সাধু হয়েছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। খদ্দর পরাকে আপনি পাপ বলবেন না।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "না, বলব না। বরং আমরা দরিদ্ররা কৃতজ্ঞই থাকব। কেন না, ওর সামাজিক মূল্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই পেয়ে থাকি।"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অমিয় যুবকের প্রত্যুত্তরে কি বলিতে গিয়াই দেখিল, সে হাত তুলিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে বলিতেছে, "আমার বাঁ-দিকের পথ—তা হ'লে আসি।"

অমিয় সসঙ্কোচে সহসা প্রশ্ন করিল, "আপনার নামটি—"

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাম আমার বিশ্বজিৎ। একটু অদ্ভুত, নয় কি?"

অমিয় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "বাপ-মা ছেলের যশ, বিদ্যা, ধন, ইত্যাদির কামনা ক'রেই নাম রাখেন। বিশ্বজয়ের বদলে ছেলে নগণ্য রেল-আপিসের ত্রিশ টাকার একটি চাকরি জয় করেছেন—এই আনন্দেই তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করতেন। সে-আনন্দের কল্পনা করতে পারেন কি, অমিয়বাবু?"

"আপনি আমার নাম জানলেন কি ক'রে?"

"পাঁচ হাজার বেকার যুবকের মধ্যে যিনি মহা ভাগ্যবান তাঁর নাম এবং কার্য্যাবলী জানা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের নয়। আপনি থাকেন শ্যামবাজারে, তাও জানি। আর যা জানি, পরে বলব। নমস্কার।" বিশ্বজিৎ দ্রুতপদে বাম দিকের গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিশ্বজিৎকে অমিয়র অদ্ভুতই ঠেকিল। অনায়াসে সে আলাপ জমাইতে পারে, অনায়াসেই সে আলাপের সূত্র ছিঁড়িয়া পথের ভিড়ে মিশিয়া যায়। কে জানে, মনের মধ্যে তার শক্তি আছে কতটুকু? তাহার দারিদ্র্যই তাহাকে হয়ত তীব্র সমালোচক সাজাইয়াছে। ভালর মধ্যে তাই সে মন্দটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালবাসে এবং অদ্ভুত যুক্তি-সাহায্যে নিজের মতবাদ-প্রতিষ্ঠারও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে।

৩

শ্যামবাজার হইতে শিয়ালদহ পায়ে হাঁটিয়া আসা পয়সা হাতে থাকিলে কষ্টকরই মনে হয়। অমিয়র হাতে পয়সা ছিল না এবং পথের দু-ধারে বৈচিত্র্য কম, কাজেই ঠিক দশটায় সে আপিসে হাজিরা দিল।

২

আসিয়া দেখে খগেনবাবু হাজিরা-খাতা টেবিলে রাখিয়া লাল কালির কলমটি উঁচাইয়া বসিয়া আছেন। আর দশ মিনিট হইলেই দ্রুত করে তিনি লাল কালির লাইন টানিতে আরম্ভ করিবেন।

অমিয়কে দেখিয়া তিনি আপন স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "এই যে ছোকরা, ঠিক সময়ে এসেছ। নাও, সই কর।"

অমিয় স্বাক্ষর করিলে বলিলেন, "কোত্থেকে আসছ? শ্যামবাজার? হুঁ, তা পাসটাস কিছু করেছ, না বড়বাবুর রেকমেণ্ডেসন্?"

অমিয় মুখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

খগেনবাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "বাইরে প্রচার আজকাল বড়বাবুদের কোন হাত নেই। ওটা নিছক মিথ্যা কথা। হাত আবার নেই? খোঁচা দেবার বেলায় তো দেখি রাবণ রাজার তুল্যমূল্য! একটু পরেই দেখবে টেবিলের তলা ওপর তিল ধারণের স্থান নেই।" বলিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন। পরে কলম নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, "নূতন লোক, ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছ, নয়? বলি ছোকরা, সাবধান। দেশে যদি পাটালি গুড় থাকে, ব'লো, পাওয়া যায় না। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, নারকেল গাছ থাকলে বলবে, গাছ আছে বটে, ফল হয় না। হয়ত খবর নেবে, তোমাদের গোয়ালে মৌচাক হয়েছে কি না, স্রেফ জবাব দেবে, না তো! তার পরে দুধ, মাছ, চাল, ডাল, মায় তেল নুন পর্য্যন্ত একবার দিয়েছ কি বার্ষিক বন্দোবস্ত! বলি জমিদারের বার্ষিক খাজনা বোঝ তো? এও তাই।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন, চারি পাশের লোকগুলিও কৌতুকে ফাটিয়া পড়িল।

কে এক জন বলিল, "ওঁকে অত ক'রে বলছেন কেন খগেনবাবু। ও বেচারা সবে কাল এসেছে, কি-ই বা বোঝে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "তাই তো হালচাল বাংলে দিচ্ছি। ওরাই তো শিকারের জিনিষ, মিষ্টি কথায় ওদেরকে ভোলান খুবই সোজা।"

"তা যা বলেছেন। এই দেখুন না, সাত সকালে নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে ছুটতে আসছি। আর মজাসে বাবু আসবেন বারটায়। যাদের মাইনে বেশী, সুখও তাদের বেশী।"

খগেনবাবু ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন, "আর এক মিনিট—যে আসুন না-আসুন লাইন টানব কিন্তু।"

"তা টানুন, তবে কিনা মরতে আমরা মরি। বড়দের তো ভুলচুকও নেই, লেটও নেই। দিব্যি আছেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমি কি আপনাদের বাঁচাতে পারি নে? পারি। দশ-বিশ মিনিট পরে লাইন টানলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়, বলুন? কিন্তু আপনারাই তখন আমার নামে লাগাবেন। বলবেন, বড়বাবু, খগেনবাবু আজ দশটা কুড়িতে লাইন টেনেছেন। দশটা উনিশে এসে ফণী বাঁচলে, আর দু-মিনিটের জন্যে আমার হল লেট্!"

"তাই কি বলেছি কোনদিন?"

"আপনি না বলুন, আর কেউ বলবেন! কান ভারী করবার লোকের অভাব নেই তো। ঐ দেখুন।" বলিয়া খগেনবাবু এক জন নবাগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটি শীর্ণকায়, পরনে ময়লা ধুতি, জামা এবং ততোধিক ময়লা এক খানা চাদর কাঁধে ঝুলিতেছে। মাথার চুল দেখিয়া অনুমান হয় মাসাবধি সেখানে তৈল বা জলবিন্দু পড়ে নাই। গায়ের রং তামাটে, হাতে একটি নাতিবৃহৎ পুঁটুলি। তিনি দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিলেন।

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যদ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে ফণীবাবু, আসুন, আসুন। আপনার জন্যে কলম ধরে ব'সে আছি।"

ফণীবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে হাজিরা সহি করিলেন।

খগেনবাবু বলিলেন, "বলি এতে কি? ধান না চাল?"

ফণীবাবু পুঁটুলিটি বড়বাবুর টেবিলের তলায় রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "ধানই বটে। লক্ষ্মীপূজোর ধান।"

খগেনবাবু বলিলেন, "তা বটে, ধান তো কলকাতায় পাওয়া যায় না—"

ফণীবাবু বলিলেন, "এ ধান কলকাতায় কোথা পাবেন? এ একেবারে টাটকা জমি থেকে আনা, এখনও গোলাজাত হয় নি।"

খগেনবাবু সব্যঙ্গ-হাস্যে বলিলেন, "আমরা সব কিনি বাসি ধান—পচা পুরনো জিনিষ। কি করি বলুন, আপনারা ত দয়া করেন না। যাঁর লক্ষ্মীশ্রী বেশী, তাঁকে সাহায্য করবার লোকাভাব হয় না।"

ফণীবাবু বলিলেন, "কেন, আমায় বললেই ত পারতেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমায় ধান জুগিয়ে পুরো জিনিষটাই ত লোকসানের খাতায় জমা হ'ত আপনার। চাই নি, সে ত ভালই হয়েছে।"

ওধার হইতে কে এক জন বলিল, "আপনাকে দিলে পুরো লোকসান নাও হ'তে পারে। ওঁর পরেই ত সিংহাসন আপনার। ফণীবাবু বেহিসাবী নন, চিরকালই গোড়া বেঁধে কাজ করেন।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

ফণীবাবু তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় গিয়া বসিলেন।

বিনয় খগেনবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ ফণী সব কথা বড়বাবুর কাছে লাগাবে নিশ্চয়।"

খগেনবাবু নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, "লাগাক গে। যার যা কাজ সে তা করবে না? ওতেই ওদের অন্ন, ওতেই ওদের জীবন।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, ফণীবাবুকে ওয়ারে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"ভালই হয়। গুপ্তচরের কাজটা ওর জন্মগত বিদ্যা কিনা, ভালই পারবে।"

বিনয় উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেই কারণ না বুঝিয়াই সারা আপিস হাসিয়া উঠিল।

অনলবাবু ওরফে দাদা সেদিন আপিসে আসেন নাই। মাসের মধ্যে তিনি আট-দশ দিন কামাই করেন এবং বছরের মধ্যে লম্বা ছুটি লইলে মাস-পাঁচেকের কম ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেন না। সকলে বলে, কাজের একটু চাপ পড়িলেই দাদার শরীর অসুস্থ হয়। তিনি আসেন নাই বলিয়া সকালের মজলিসটা আজ ভাল করিয়া জমিল না।

বিশ্বজিৎ আসিয়া অমিয়র চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগছে অমিয়বাবু?"

অমিয় বলিল, "রোজই এ রকম চলে?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বড়বাবু উপস্থিত না থাকলেই চলে। আজ যা হ'ল এ ত যৎসামান্য; অপেক্ষা করুন আরও দেখবেন।"

অমিয় বলিল, "পরস্পরকে আঘাত ক'রে এঁরা আনন্দ পান কেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায় তা এঁরা জানেন না বলেই। আমার যা আছে—আপনার তা না থাকলেই—আপনি আঘাত দিয়ে সেই লোভকে প্রকাশ করবেন বইকি।"

অমিয় বলিল, "এ রকম আলোচনায় মানুষ নীচু হয়ে যায় না কি?"

বিশ্বজিৎ হাসিল, "চাকরির ক্ষেত্রে যাদের আয় কম, অভাব ষোল আনা, তাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা যে স্তরের, সেই আলোচনাই আমাদের শোভা পায়।"

অমিয় অধীর কণ্ঠে বলিল, "এ আপনি শুধু তর্কের খাতিরে নীচু হচ্ছেন। সত্যকার আন্তরিক কথা এ নয়। দারিদ্র্য মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা দেয়, এ-কথা দুর্ব্বল লোকেরাই মেনে নেয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "এবং দরিদ্র লোক মাত্রই দুর্ব্বল লোক এ-কথাও সর্ব্ববাদিসম্মত।"

"না।" টেবিলে মৃদু চাপড় মারিয়া অমিয় বলিল, "যারা দারিদ্র্যকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারে সেই সব মেরুদণ্ডহীন মানুষের কথা এ সব। দুঃখের মধ্যেও মাথা উঁচু ক'রে ও সম্মান বজায় রেখে চলার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসি না-থামাইয়া বলিল, "আগে অন্ন-সমস্যা, না আগে সম্মান-সমস্যা, অমিয়বাবু? আপনার জীবনের থেকে মানুষের প্রিয়তর কিছু জগতে আছে? বলুন।"

অমিয় বলিল, "এক কথায় এর কি উত্তর দেব? যদি বলি, সম্মান বড়, আপনি বলবেন নাটকের ভাষা।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বলবই ত। যাঁরা দু-মুঠো খেয়ে সভ্য সমাজে লজ্জা বাঁচিয়ে চলতে পারেন, তাঁরাই ত সৃষ্টি করেছেন ঐ নাটকের ভাষা। মুখে কথা ফোটবার আগে যেমন বাক্‌পটুত্বের মূল্য, অন্ন-সমস্যার আগে তেমনই সম্মান-সমস্যা! আপনি ভাবতে পারেন, অমিয়বাবু, যখন আমরা আর্য্যমাত্র ছিলাম—বল্কলে লজ্জা বাঁচত, অর্দ্ধদগ্ধ মৃগমাংসে উদর পূর্ত্তি হ'ত, গুহায় ছিল বাসগৃহ, গোষ্ঠীতে ছিল না সামাজিক প্রথা, তখন আমাদের সম্মান আজকের দিনের এই পালিশ-করা সম্মানের মতই ছিল কি না? আমরা যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে যেই মাত্র জমি ভাগ ক'রে সমাজ বাঁধলাম, সঙ্গে সঙ্গে এল অনেক উপসর্গ। মৃগমাংস ছেড়ে অন্নে আমাদের রুচি এল, ধনুর্ব্বাণ ফেলে লাঙ্গল ধরলাম। গুহার কদর্য্যতায় মন খুঁৎ খুঁৎ করতে

লাগল, কুটীর তৈরি করলাম এবং জমি ভাগের মত স্ত্রীসম্পত্তিও ভাগ ক'রে নিলাম। যা ছিল সর্ব্বসাধারণের, তাই হ'ল ব্যক্তিবিশেষের। কাজেই ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে আমরা এক একটি পৃথক পরিবার গ'ড়ে তুললাম। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার মূলে সেই প্রথম সভ্যতার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই বর্ত্তমান।"

অমিয় বলিল, "দাঁড়ান, আপনার তর্ক ঠিক যুক্তিসহ নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "আমার যুক্তি নয়, অনুমান। কল্পনায় আমি অনেক কিছু ভাবি, যখনই এই আপিসের কথা ভাবি, তখন মানব-সভ্যতার গোড়ার ইতিহাস ভাবতে ইচ্ছে করে। আমার কাছে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ; যতটুকু জানি—তার ওপর যতটুকু জানি না তারই রং মেশাই বেশী করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, আমরা শক্তি হারিয়ে তার ফল ভোগ করছি। আবার আমরা যে-স্বপ্নে জীবন কাটাচ্ছি তার ফল ভোগ করতে দিয়ে যাব আমাদের মেরুদণ্ডহীন বংশধরদের।" একটু থামিয়া বলিল, "দুঃখের মধ্যে জীবন কাটিয়ে অভাবকে প্রতিনিয়ত সম্মুখে রেখে যিনি সত্যকারের বড় হয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহ প্রতিভাবান, তাঁর দেবদত্ত ক্ষমতা, দৈব না মেনেও আমরা স্বীকার করতে পারি। কিন্তু অমিয়বাবু, আপনি, আমি, আরও লক্ষ কোটি মানুষ এই দুঃখদৈন্যের অতল সাগরে যে তলিয়ে গেলাম, তার কি! আমরা তলিয়েই যাচ্ছি, টেনে তোলবার কেউ নেই।"

"টেনে কেউ তুলবে না, আমাদের নিজের চেষ্টাতেই—"

"তাও জানি। মাস কাবার হোক, আপনিও তা বুঝবেন।"

"কি হে বিশ্বজিৎ, নূতন ভদ্রলোককে কি লেকচার দিচ্ছ? হাতে কাজ কিছু কম আছে বুঝি?"

খগেনবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে বিশ্বজিৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিল, "হাতের

কাজ মুখে পুষিয়ে নিচ্ছি, খগেনবাবু। ঐটুকুই তো আমাদের সম্বল।"

"তাহলে ফণীর পথ ধর, উপকার পাবে।"

বড়বাবুর প্রবেশ-ক্ষণটিতে আপিসের চেহারা একদম বদলাইয়া গেল। প্রবল বর্ষণের পর শান্তিময় বিরতি—আকাশ এবং পৃথিবী কোমল কিরণ স্নাত হইয়া হাসিয়া উঠিল। অন্ততঃ অমিয় নিশ্বাস ফেলিয়া তাই ভাবিল।

বড়বাবুর গাম্ভীর্য্য অসাধারণ; যখন হাসেন, সে হাসি অপরিমিত, এবং গম্ভীর হইলে সে গাম্ভীর্য্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ফুলকাটা চেয়ারে পুরু একটি গদি আঁটা—গদি মুড়িয়া পরিষ্কার একখানি ঝাড়ন পাতা। নূতন ব্লটিং পেপারে সম্মুখের প্যাডটি ঝকঝক করিতেছে,—প্যাডের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ ভাগের বর্ডারে কালীমাতার জয়কীর্ত্তন। বনাত-মোড়া টেবিলে কোথাও ধুলার বিন্দুটি নাই, কাগজ বা ফাইল পাশের বেতের ট্রেতে সাজান, সেখানে এক পয়সার কালীমূর্ত্তি কেবল সিন্দুরচর্চ্চিত ললাটে টেবিলের একধারে দণ্ডায়মানা হইয়া ভক্তপ্রবরের মনে সাহস ও লেখনীতে শক্তির প্রেরণা দিতেছেন। মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বপ্রথম বড়বাবু তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসন (অর্থাৎ চেয়ার) গ্রহণ করিলেন। চেয়ার গ্রহণ করিয়া কয়েক মিনিট স্তিমিত চক্ষে নিস্তব্ধ থাকিয়া কালীমূর্ত্তি স্মরণ, প্যাডের বর্ডারে কালীমাতার জয়ধ্বনি পাঠ ইত্যাদি ভক্তজনোচিত কর্ত্তব্য পালন করতঃ টানা ড্রয়ার হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন। খাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই আঁকা—জ্যোতির্ম্ময়ী কালীমাতার অভয়হাস্যরঞ্জিত মুখমণ্ডল ও ঈষৎ উত্তোলিত বরাভয়যুক্ত শ্রীকর—এবং অসুর-রক্ত-রঞ্জিত শ্রীচরণের প্রতি গভীর মনঃসংযোগপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বড়বাবু ধীরে ধীরে সেই বরদায়িনী দেবীমূর্ত্তি-সম্বলিত খাতা-

খানি ললাট স্পর্শ করিলেন। সেই অবস্থায় পাঁচ মিনিট কাটিল—সমাধির পূর্ব্ব অবস্থা আর কি! অতঃপর প্রণাম-পর্ব্ব শেষ করিয়া অর্থাৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লাল কালির কলম বাহির করিলেন। খাতার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আরও পাঁচ মিনিট ধরিয়া 'জয় কালীমাতার জয়' এক শত আটবার লিখিয়া লেখনীর শক্তি সঞ্চয় করিলেন—অর্থাৎ অতঃপর যে হুকুমনামাই লিখুন না কেন—কাহারও অনিষ্ট হইলে কালীনাম লেখার পুণ্য সলিলে সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া যাইবে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

অমিয় কলেজ হইতে আপিসে ঢুকিয়াছে বলিয়া এই ভক্তি-নিবেদন ও কালীনাম-লিখন নূতন বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চাকরি মাত্র ভরসা করিয়া যাঁহারা বৃহৎ সংসারের হিসাব রাখেন, তাঁহাদের কাছে এই ভক্তিনিবেদনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। শুদ্ধমাত্র ভক্তির জোরে কত মহাপাপীর মহাপাপ যে খণ্ডন হইয়া যায় তাহা ভক্তিমান না হইলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। ভক্তির অনুশীলনে ভক্তের পরকাল এবং ইহকাল দুই-ই সম্পদযুক্ত হয়। চাকুরীয়ার পক্ষে ভক্তি জিনিষটা অমূল্য রত্ন বিশেষ। যে হতভাগ্য এই ভক্তির ধার দিয়াও ঘেঁষিতে চাহে না, তাহার দুর্গতি দেবদেবী তো তুচ্ছ, স্বয়ং বড়বাবুও দূর করিতে পারেন না।

বড়বাবুর প্রণামপর্ব্ব নূতন না হইলেও অনেকে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সে পর্ব্ব শেষ হইবামাত্র ফণীবাবু টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন। বড়বাবু স্মিতহাস্যে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাল তো ?"

ফণীবাবু কৃতকৃতার্থ হইয়া আনন্দগদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ধান এনেছি।"

বড়বাবুর প্রসন্নমুখে জ্যোতি খেলিয়া গেল, কহিলেন, "এনেছ, বেশ, বেশ। যদিও লক্ষ্মীপূজোর দেরি আছে—তবু আগে আনিয়ে রাখা গেল। দু-একটা নারকোল পাওয়া যাবে তো ?"

"আজ্ঞে, তা এক কুড়ি দিতে পারবো বোধ হয়।" বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কহিলেন।

বড়বাবুর প্রফুল্ল মুখে অকস্মাৎ মেঘ নামিল, অস্ফুট কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "হুঁ।"

ফণীবাবু টেবিল ত্যাগ করিতে না-করিতে হরেন আসিল। মিনিট পাঁচ-ছয় তাহার সঙ্গে অন্যের অশ্রুতস্বরে বড়বাবুর আলাপ আলোচনা চলিল। সে আলাপের মুহূর্ত্তে কখনও তাঁহার মুখে মেঘ নামিল, কখনও বা সূর্য্যকিরণ ফুটিল এবং হরেন টেবিল ত্যাগ করিবামাত্র অনাদি আসিল। এইরূপে একে একে অনেকেই আসিল, অনেকেই চলিয়া গেল।

একটার সময় বড়বাবু শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিলেন।

শম্ভুচন্দ্র আসিতেই বলিলেন, "নতুন ছোকরা কাজ করছে কেমন?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন. "ছোকরা ইন্‌টেলিজেণ্ট আছে, পারবে।"

শুনিয়া বড়বাবু-বিশেষ খুশী হইলেন না; মন্তব্য করিলেন, "ইন্‌টেলিজেণ্ট নিয়ে তো আপিস চলে না, তাতে গোলই বাধে। আমি চাই কর্ম্মী লোক। যারা অনেক জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায় না, একটি জিনিষই বোঝে। যা হোক, আপিস সম্বন্ধে ছোকরা কোন মন্তব্য করেছে?"

শম্ভুচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "না, নেহাৎ ভালমানুষ।"

বড়বাবু বলিলেন "নজর রেখ, খগেনের দলে যেন মেশে না। লোক বিগড়াবার উনি একটি যন্ত্র-বিশেষ।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "না, না, ছোকরা ভাল।"

বড়বাবু ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "বাইরের ভালমন্দয় আমার দরকার নেই। ওরা বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বলছ—ওরা একবার কোন জিনিষ বুঝলে

সহজে ভোলে না। শাস্তির কথা জান তো ? আমিই আনলুম, চাকরিতে উন্নতি হ'ল, এখন আমার নামেই ওপরে দরখাস্ত পাঠায়। নেমকহারাম সব !"

শম্ভুচন্দ্র বড়বাবুর উত্তেজনার মূহূর্ত্তে চুপ করিয়াই থাকেন—আজও কথা কহিলেন না।

বড়বাবু একটু শান্ত হইলে শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আমার কিছু আশা আছে কি ?"

"কিসের ?"

শম্ভুচন্দ্র একটু থামিয়া সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "গ্রেড সম্বন্ধে।"

"ও, হ্যাঁ,"—বলিয়া বড়বাবু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামাইয়া বলিলেন, "দাদা রয়েছে তোমার সিনিয়র, ওকে ডিঙিয়ে কি ক'রে দেওয়া যায় তাই ভাবছি। আগের দিনে হ'লে ভাবতুম না। যা করেছি সাহেব চোখ বুজে সই করেছেন। এখন নানান রকম আইনকানুন —।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "এফিসিয়েন্সির দিক দিয়েও সুবিধে হয় না ?"

বড়বাবু বলিলেন, "সেই কথাই কদিন ধরে ভাবছি। কাজে কর্ম্মে দাদার অবশ্য ত্রুটি কম,—কিন্তু একটা উপায় আছে।"

শম্ভুচন্দ্র আগ্রহোত্তেজিত চক্ষে বড়বাবুর পানে চাহিলেন।

"উপায় হচ্ছে এই, ওর কামাই বড্ড বেশী। ছুটি নিয়ে রেকর্ড খুবই খারাপ ক'রে রেখেছে ! আইন বাঁচিয়ে তোমার আর দাদার দু-জনের নামই প্রপোজ করব। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সার্ভিসটাও রেকর্ড করা থাকবে। তোমার নামে থাকবে রেকমেণ্ডেসন—দাদার নামে থাকবে ছুটির অঙ্কটা, অর্থাৎ ইরেগুলার অ্যাটেন্‌ডেন্স ; যাও, যাও, মা কালীর পূজোর ব্যবস্থা কর গে। আর ভাল কথা, এ সংবাদ যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

সে কথা শম্ভুচন্দ্রকে বলাই বাহুল্য। নিজের ভাল যে না বুঝিবে তাহার কেরানীগিরি করিতে আসা বিড়ম্বনা নহে তো কি।

আশ্চর্য্যের কথা, আপিসের দেওয়ালগুলিরও শ্রবণশক্তি আছে। বড়-বাবুর গোপন অভিলাষটি কি করিয়া খগেনবাবুর কানে গেল। তিনি জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিলেন।

দাঁতে দাঁত রাখিয়া তিনি আপন মনেই খানিকটা বকিয়া গেলেন, অবশ্য সে বক্তৃতা বড়বাবুর অনুপস্থিত-মুহূর্ত্তে আর সকলকে উদ্দেশ করিয়াই দিলেন। দাদা আসিলে তিনি যে এই ষড়যন্ত্রজাল ছিঁড়িয়া দিবেন ও বড়বাবুকে অপমানিত করিবেন সে ভয়ও দেখাইলেন।

সুতরাং পরদণ্ডেই বড়বাবু খগেনবাবুর শাসনবাক্য অন্যের মারফৎ শুনিলেন। শুনিবামাত্রই তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "খগেন।"

খগেনবাবু সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি উষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "কি সব ছোটলোকমি হচ্ছে?"

চক্ষু পাকাইয়া খগেনবাবু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "কিসের ছোটলোকমি?"

বড়বাবু বলিয়া চলিলেন, "একসঙ্গে থিয়েটার যাত্রা করেছি, আড্ডা ইয়ার্কি দিয়েছি, বন্ধুত্ব করেছি কিনা, তাই তোমার বড় বাড় হয়েছে। ভাব পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার কিছুই করতে পারি না?"

"পার না আবার? যা করেছ, তারই ঠেলায় মরে আছি—আবার করবে কি? তোমার মাইনে আর আমার মাইনে ছিল সমান সমান। আজ তুমি আমার তিন গুণ পাচ্ছ, আমায় সেই গর্ত্তেই রেখেছ ফেলে। নিজে কলম উঁচিয়ে ব'সে ব'সে পান চিবুচ্ছ আর গল্প করছ, আর আমার তিন দিন অন্তর নিব বদলাতে হচ্ছে—সব কাজ দিয়েছ চাপিয়ে। একটি

ভুল পেয়েছ কি গলা কাটবার ব্যবস্থারও ত্রুটি হচ্ছে না! তোমার অফেন্স বইটা খোল ত ভাই; কার নামটা ওতে বেশী ক'রে লেখা আছে, দেখি।"—বলিয়া হো হো করিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন।

বড়বাবু ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিলেন "ভুল করলে সায়েব কি সন্দেশ খাওয়াবেন তোমাকে?"

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যে বলিলেন, "সন্দেশ কেন, দিব্যি রাজভোগ তো খাওয়াচ্ছ। ভুল হবে না? যে কাজ করে তারই ভুল হয়—যে ব'সে থাকে তার আবার ভুল কি।"

"কাজ তুমিই কর—আর কেউ করে না, না?"

"ভুল কি তাদেরই হয় না?"

"না, তোমার মত হয় না।"

"আমার মত হয় না, কেন না তারা ভুল কাটাবার ফন্দিফিকির জানে, আমি জানিনে। জিনিষ বয়ে তাদের হাত ব্যথা, কাঁধ ব্যথা, ট্যাঁক খালি—অনেক কিছুই হয়,—আমরা ত ওসব খোসামোদের তোয়াক্কা রাখি নে, কাজেই ভুলটা আমার বেশীই হয়।"

বড়বাবু মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "যান্, যান্, সিটে গিয়ে বসুন। মেলা গোলমাল করবেন না।"

সত্য কথা বলিতে কি, বড়বাবু আপিসের মধ্যে একমাত্র খগেন-বাবুকেই ভয় করেন।

৪

পরদিন টিফিনের সময় অমিয় একমনে কাজ করিতেছে, এমন সময় কালো, রোগামত একটি ছেলে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পাশে দাঁড়াইল। এক মিনিট দাঁড়াইয়া, একটু কাশিয়া সে অমিয়র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "আপনার নাম বুঝি অমিয়বাবু?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"আপনি ত বি-এ পাশ?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! অমিয় আশ্চর্য্য চোখে তাহার পানে চাহিল।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যি বি-এ পাস হ'লে আমাদের সঙ্গে কথা কবেন কি না ভাবছি! আমাদের দৌড় তো ফোর্থ ক্লাস,, ফিফ্‌থ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

অমিয়র ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুক হাস্য ভাসিয়া উঠিল, সে বলিল, "গ্রাজুয়েটরা ফোর্থ ক্লাস পড়িয়েদের সঙ্গে কথা বলে না, এ ধারণা আপনার হ'ল কেন? তারা কি আলাদা জীব?"

ছোকরা অমিয়র হাসি দেখিয়া সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, "এই সেক্‌শনের অনন্তবাবুকে চেনেন না বোধ হয়? ওই যে কালো মত, বেঁটে মত, মাথায় অল্প টাক—ও-ঘরে ব'সে হাত নেড়ে আর মাথা নেড়ে গল্প করছেন, উনিও বি-এ পাস কি না—আমাদের দরখাস্ত—ভুলের কৈফিয়ৎ সবই উনি লিখে দেন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যা আমরা বুঝতে পারি না।"

"বটে! তা হ'লে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে তো।"

"উনি কি বলেন জানেন? বলেন—অনেক পয়সা খরচ ক'রে তেল পুড়িয়ে তবে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। প্রথমটা দরখাস্ত লেখাতে গেলেই অনেক কথা শুনিয়ে দেন—তার পর অবশ্য—"

"তা আপনার কি কিছু লেখাবার দরকার আছে ?"

"না, না, আমার নয়—খগেনবাবু একবার আপনাকে ডাকছেন।"

"খগেনবাবু ! কেন ?"

"কি জানি কি লিখেছেন— আপনাকে দিয়ে করেক্ট করিয়ে নেবেন।"

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল। ওই রাশভারী লোকটির সম্বন্ধে ধারণা তাহার ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, উঁহার চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরশ্রীকাতরতা বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, উনি স্পষ্ট বক্তা, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তথাপি উঁহার ভদ্রতালেশহীন উক্তিগুলি অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলে। নিজের পুরুষকারের অভাবে উন্নতি করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্যকে অভদ্র-ভাবে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিজে বঞ্চিতের দলে না-পড়িয়া, নিজের স্বার্থকে সম্মুখে না-রাখিয়া যদি অন্যের যথার্থ দোষত্রুটি দেখাইবার সৎসাহস তাঁহার থাকিত তো কেহই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে সাহস পাইত না। কাল দাদাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহাতে বড়বাবুর চেয়ে খগেনবাবুর লজ্জাটাই বেশী হওয়া উচিত।

অমিয়কে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছোকরা বলিল, "বড়বাবু তো সিটে নেই, আসুন না একবার ?"

অমিয় সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

খগেনবাবু মিষ্ট হাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও পাশের টুলে বসাইয়া বলিলেন, "কিছু মনে না-করেন যদি আপনাকে গুটি-কয়েক কথা বলব।"

"বেশ ত বলুন না ?"

"বড়বাবুর থ্রু দিয়ে আসেন নি নিশ্চয়ই, তা হ'লে আপনাকে ডাকতাম

না। আপনারা শিক্ষিত মানুষ, নিজের বিত্তের জোরে হাজার হাজার লোককে হটিয়ে চাকরি পেয়েছেন, আপনারা খোসামোদ করতে যাবেন কি দুঃখে ?”

অমিয় চুপ করিয়া রহিল।

খগেনবাবু এক মূহুর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, “এসেছেন আজ দু-তিন দিন, এর মধ্যে দেখছেন তো এখানকার হালচাল। সাজিয়ে রেখেছে, মশাই, সাজিয়ে রেখেছে। সব আত্মীয়গোষ্ঠীতে ভরা ; আপনি জোরে হেঁচেছেন কি বড়বাবুর কানে সে হাঁচির কথা উঠবে। আমি খোসামোদের ধার ধারি না কিনা, তাই আমি পরম শত্রু।” আর এক মূহুর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, “চাকরি যখন পেয়েছেন ক্রমে ক্রমে সবই জানবেন। আপনারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান, আপনাদের বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। শুনলেন তো, নিজের আত্মীয়টিকে গ্রেড দেবার জন্য কি ভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা দু-মুখো ছুরি—যখন যেদিকে সুবিধা সেই দিকেই কাটতে থাকে! যখন সিনিয়রিটিতে পায় তখন এফিসিয়েন্সির কোশ্চেন উঠায় না, আবার সিনিয়রিটি টপকাতে এফিসিয়েন্সির কলকাঠি টেপে।”

এতক্ষণে অমিয় কথা কহিল। বিস্ময়মাখা স্বরে বলিল, “উপরের অফিসাররা কিছু দেখেন না ?”

খগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, “তা হ’লে আর আমাদের এত দুঃখ কেন ? ওঁরা কি দেখেন, জানেন ? ডাইরেক্ট ইন্‌চার্জ্জ অর্থাৎ বড়বাবু কি রিমার্ক দিয়েছেন। কাউকে ডাকিয়ে পরীক্ষা ক’রে ওঁদের অমূল্য সময় ওঁরা নষ্ট করতে চান না।”

“তা হ’লে তো বড়বাবুদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট।”

“যথেষ্টই তো। আজকাল বাইরের খোঁচা খেয়ে খেয়ে কিছু কমেছে সে প্রতিপত্তি। আমাদের এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েসন্ আছে, জানেন তো ?

তাদের ঠেলায় প'ড়ে সিলেক্‌সন কমিটি হয়েছে, সিনিয়রিটি বা এফিসিয়েন্সি রেকর্ডেড্ হচ্ছে। কোম্পানীর আমলের স্বেচ্ছাচার অনেক কমে গেছে। এই যে আপনাকে হার্ডকম্পিটিসনে চাকরি লাভ করতে হ'ল, আগেকার দিনে, ধরুন বছর-দশেক আগে হ'লে কি হ'ত জানেন, অন্য কোন কোয়ালিফিকেসন দরকার হ'ত না, স্রেফ বড়দের সঙ্গে কুটুম্বিতা ছাড়া।"

অমিয় হাসিল।

খগেনবাবু ড্রয়ার টানিয়া এক গোছা কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "এক খানা দরখাস্ত লিখেছি, আপনাকে কাটকুট ক'রে এটা দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। পড়ুন না, পড়লেই বুঝবেন কি সম্বন্ধে।"

দরখাস্তখানা পড়িয়া অমিয় চিন্তাযুক্ত হইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "দাদাকে ওরা কন্‌ডেম্ করতে চায় এফিসিয়েন্সির পাথর চাপিয়ে—আমরা সেই ক্লিক ভাঙবো, অমিয়বাবু।"

অমিয় শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি তো আপিসের কায়দা-কানুন জানি না, আমার লেখা সুবিধা হবে কি ?"

খগেনবাবু বলিলেন, "পড়লেন তো ভাবার্থটা। সবটা না লেখেন কিছু সংশোধন করে দিন ওই লেখাটাই।"

অমিয় ঘামিয়া উঠিল। এত শীঘ্র যে তাহার নির্লিপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা সে ভাবিতেই পারে নাই। মাত্র দুই দিন সে আপিসে আসিয়াছে, কয়েক জন ছাড়া অধিকাংশের সঙ্গে আলাপ তো দূরের কথা চাক্ষুষ দেখাই ভাল করিয়া ঘটে নাই, অথচ এত শীঘ্র দলাদলির নিম্নগামী স্রোতের মধ্যে তাহাকে পা রাখিতে হইতেছে! সে মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "আমি নূতন লোক, আমায় দিয়ে আর কেন ?"

খগেনবাবু ঈষৎ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "নূতন লোক হলেও চাকরি

নিয়েছেন যখন, তখন আপনাদের ভালমন্দ বুঝবেন না? আপনারাও যদি চোখ বুজে স্বপ্ন দেখেন তাহ'লে বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই কিসের?"

অমিয় বলিল, "বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই আমি করি নে, আমায় এই অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে রেহাই দিন।"

খগেনবাবু তীব্র দৃষ্টিতে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বিশেষ ক'রে এ ব্যাপারে আপনার যখন কোনই স্বার্থ নেই! আর আপনি লিখলে জানবেনই বা কে? নিন্, নিন্, বাসায় গিয়ে ভাল ক'রে এখানা দেখবেন—কাল চাই।" বলিয়া অমিয়কে আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে না-দিয়াই কাগজের তাড়াটি তাহার জামার পকেটে গুঁজিয়া দিলেন।

এ-ঘরে আসিতেই শম্ভুচন্দ্র অমিয়কে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "অমিয়-বাবু, খগেনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন বুঝি?"

"না, উনি ডাকলেন,—"

বিস্মিত হইয়া শম্ভুবাবু বলিলেন, "ডাকলেন? কেন? কোন দরকারী কাজ ছিল বুঝি?"

অমিয় বুঝিতে পারিল না সত্য বলিবে, না সত্য গোপন করিবে। শম্ভুবাবু লোকটি মিষ্টভাষী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—যত্ন করিয়া অমিয়কে কাজ বুঝাইয়া দিয়াছেন—অথচ ইঁহারই উন্নতির পরিপন্থী হইয়া তাহাকে লেখনী ধরিতে হইবে। খগেনবাবুর উপর তাহার রাগ হইল, সত্য কথা না বলিতে পারিয়া নিজেকে সে বহুবার মনে মনে ধিক্কার দিল।

"না, এমনি।"

শম্ভুচন্দ্র অমিয়র বিবর্ণ মুখভাব দেখিয়া কি অনুমান করিলেন বলা যায় না। তীব্র দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহসা তাঁহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শম্ভুচন্দ্র সাগ্রহে বলিলেন, "আপনার পকেটে ওটা কিসের কাগজ ?"

অমিয় সরল সত্য কথা না বলার জন্য মরমে মরিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া বলিল, "ও একখানা দরখাস্ত।"

"দেখি—", বলিয়া অমিয়র অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া ফস্‌ করিয়া কাগজের তাড়াটি তাহার পকেট হইতে টানিয়া তুলিলেন।

এতখানি অভদ্রতা অমিয় প্রত্যাশা করে নাই।

অপমানে লাল মুখের সমস্ত রেখা তাহার সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। ঈষৎ তীব্র কণ্ঠেই সে বলিল, "আপনি আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে পকেটে হাত দিলেন ?"

প্রত্যুত্তরে শম্ভুচন্দ্র কোন কথা না-বলিয়া কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠশেষে শম্ভুচন্দ্র কাগজগুলি অমিয়কে আর না ফিরাইয়া দিয়া আপন পকেটে রাখিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে লেখা., এতে আপনার চেয়ে আমারই দরকার বেশী।"

অমিয় স্তম্ভিতের মত খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। নিদারুণ অপমানে চোখে তাহার জল আসিবার উপক্রম হইল, তাড়াতাড়ি সে আপনার জায়গায় ফিরিয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বড়বাবু উপর হইতে ফিরিয়া আসিলেন, শম্ভুচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তাঁহার টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, পকেট হইতে সেই কাগজের তাড়া বাহির করিলেন এবং বড়বাবুর টেবিলের উপর রাখিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব বলিলেন। বড়বাবু কাগজের লেখা সবটা পড়িলেন, শম্ভুচন্দ্রের কথা শুনিলেন, কর্ম্মরত অমিয়র পানে কয়েক বার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিও হানিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না। ঝড় উঠিল না, মেঘও কাটিল না। অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল। ভয়ের জন্য অস্বস্তিবোধ

নহে, নূতন লোক হইয়া অপরের ব্যাপারে মাথা দিবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কেন যে হইল, সেই কথা ভাবিয়াই সে সঙ্কুচিত হইল।

সমস্ত দিনটা তাহার অস্বস্তিতে কাটিল, ছুটির ঘণ্টা বাজিলে সকলে যখন বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বড়বাবুর টেবিলের সামনে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়বাবু।"

বড়বাবু প্যাডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "কি চাই ?"

"কাগজ ক-খানা ফিরিয়ে দিন, খগেনবাবুকে দিয়ে দেব।"

ক্রুদ্ধ চক্ষের দৃষ্টি অমিয়র মুখের উপর ফেলিয়া বড়বাবু বলিলেন, "আপনারা কালকের ছেলে হয়ে আমার উপর টেক্কা দিতে আসেন? হ'তে পারে আপনারা শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান, কিন্তু এই আপিসে এতটুকু বেলা থেকে ঢুকে আজ পঁচিশ বছর কেটে গেল—এক চাউনিতে বুঝতে পারি কে কেমন লোক। খগেনটা আসল পাজী, লোকের হিংসে করা ছাড়া ওর দ্বিতীয় কাজ নেই। আমি জানতুম এই রকম একটা কিছু করবে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "এ-কাগজ সাহেবের কাছে যাবে। তাঁকে আমি সবই খুলে বলব, কি সব লোক নিয়ে আমায় আপিস চালাতে হয়। বাছাধন এত কাল ঘুঘুই দেখে এসেছেন, এইবার ফাঁদ দেখবেন।"

অমিয়কে তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি ধমক দিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, "যান্। আপনার খগেনবাবু যা পারেন করুন, আমিও যা পারি চেষ্টা করব।"

অমিয় বলিল, "আমি নূতন লোক, আপনাদের আপিসের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে—"

"জানেন না তো ওটা লিখবার ভার নিলেন কেন ?"

"উনি জোর ক'রে আমার পকেটে কাগজের তাড়াটা ঢুকিয়ে দিলেন।"

"আপনি তো বালক নন, পকেট থেকে বার ক'রে ওরই টেবিলে রেখে এলেন না কেন ?"

অমিয় কি বলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। ঠোঁট দুইটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল, চোখে ফোঁটা-দুই জলও চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

বড়বাবু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে খুশী হইলেন। প্রকাশ্যে কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মোলায়েম করিয়া কহিলেন, "আপনারা শিক্ষিত বলেই বলছি—যে কেউ কোন একটা অন্যায় কাজ করতে বললে তাই করেন কি ? যারা বোকা তারা লোকের কথায় ঘরে আগুন দেয়। আপনারা তা দিতে পারেন না।"

অমিয় তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ইচ্ছাকৃত না হ'লেও দোষ আমারই।"

বড়বাবু বলিলেন, "এ তত মারাত্মক হয় নি, এখনও শোধরাবার উপায় আছে। আপনারা শিক্ষিত—আশা করি সেটুকু মনের জোর আপনার আছে ?"

অমিয় বলিল, "কি করতে হবে ?"

"কাল এই কাগজগুলো আমি সাহেবকে দেখাব, যারা আমার পিছনে লেগেছে, তাদের হিষ্ট্রীও সব তাঁকে বলব। আমার কথা যে সত্য সে কথা, আপনি নূতন লোক,—আপনারই সাক্ষ্যে প্রমাণিত হবে।"

অমিয় অন্তরে আবার কাঁপিয়া উঠিল। শুষ্ক মুখে বলিল, "আমি কি সাক্ষ্য দেব ?"

"যা জানেন ফ্যাক্ট তাই বলবেন। আপনার পকেটে জোর ক'রে কাগজ গছানো, আপনাকে আমার বিরুদ্ধে তাতান—সবই।"

অমিয় শুষ্ক মুখে বলিল, “এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হোক না, বড়বাবু। এ নিয়ে—”

বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিলেন। প্রায় দুই মিনিট কাল সেই হাসিকে বিলম্বিত করিয়া অবশেষে কহিলেন, “আপনি সত্যই ছেলেমানুষ, অমিয়বাবু! লেখাপড়া শেখা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। ওর সঙ্গে ঝগড়া আমার আজ প্রথম নয়, যেদিন থেকে আমার উন্নতি হয়েছে—এই পাঁচ বছর—এই পাঁচ বছর ধরে নানা প্রকারে ও আমায় অপদস্থ করবার চেষ্টা ক'রে আসছে। পেতুম আমরা এক মাইনে, একসঙ্গে অনেক কীর্ত্তিই করেছি—হয়ত এক সময়ে দু-জনে বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু সাহেবের সুনজরে প'ড়ে যেমন আমার মাইনে বাড়ল, ওর হ'ল জাতক্রোধ। লোকে শ্রদ্ধা করে আমায় জিনিষ দেয়, ও ব'লে বেড়ায় আমি ঘুষখোর। লোকে ছুটিছাটার দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে হাঁটাহাঁটি করে—ও রটায় আমি খোসামোদপ্রিয়। কেউ দুটো পান আমার টেবিলে রাখলে ওর চোখ টাটায়। সে যাই হোক, ওকে ভয় আমি করি না, ভয় করলে বড়বাবু হ'তে পারতুম না। আমি যা করব তা ধর্ম্ম বজায় রেখেই করব—এতে কেউ চটেন, নিরুপায়।”

বলিয়া কালী-নামাঙ্কিত প্যাডের বর্ডারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মূহূর্ত্ত তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

“তারা, তারা,” বলিয়া বড়বাবু পুনরায় অমিয়র পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

“অনেক সহ্য করেছি, অমিয়বাবু। কাল শনিবার, কাল থাকুক, সোমবারে এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। আপনাকে সব সত্য কথা বলতে হবে। পারবেন না বলতে সত্য কথা?”

অমিয় বিশেষ উৎসাহ বোধ করিল না। সব সময়ে সত্য বলায় নিছক

আনন্দ লাভ হয় না। বিশেষতঃ এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়াইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। হায় রে চাকরি! হায় রে নির্লিপ্ত থাকার বাসনা!

কোনমতে বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া সে পথে বাহির হইল।

অপরাহ্নের বাতাস পথের ধুলা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। অন্য সময় হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সে নাকে কাপড় তুলিয়া দিত, আজ নির্ভীক চিত্তে সেই ধুলিপ্রবাহকে সে নাসিকা-পথে গ্রহণ করিল। মন্দ কি! অস্বাস্থ্যের ভিতর দিয়া যদি অসুখই করে, সে অসুখ তাহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। কিন্তু ত্রিশ টাকার চাকরির এতই কি মমতা! কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া এই অমূল্য রত্ন লাভ না করিলেই বা কি এমন ক্ষতি হইত? লাভ এবং ক্ষতির অঙ্ক কষিতে কষিতে সে শ্যামবাজারের পথে অগ্রসর হইল। পথের দু-ধারে দেখিবার কিছু ছিল না, অথচ আজ মনে হইল, এই সব নিত্যদেখা বস্তুগুলিকে সে তুচ্ছ মনে করিত কোন্ হিসাবে? যে-বাড়ী রোজই চোখে পড়ে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য যেমন বিশেষ দৃষ্টির দ্বারা প্রশংসিত হয় না, এই সার্কুলার রোডের দু-ধারে যাহারা আছে তাহারাও পথিকের চোখে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। পথের এক ধারে প্রাসাদ, আর এক ধারে বস্তি। এক দিকে অপচয়, আর এক দিকে অভাব। ধনীর দুয়ারে ডাষ্টবিনগুলিতে যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া আশ্রয় লাভ করে, গরীবের ভাঙা চালায় সে-জিনিষ কল্পনাতীত। প্রতিযোগিতা কি এখানেও চলিতেছে না? ফুটপাতে ময়লা মাদুর বিছাইয়া বস্তির অধিবাসী কোন বৃদ্ধ আরামে তামাক টানিতেছে, কোন বৃদ্ধা হয়ত কোন বালিকার দ্বারা মাথার উকুন বাছাইতেছে, কেহ শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছে আর হাসিতেছে, কেহ ডাল ঝাড়িতেছে, কেহ ছেঁড়া চটে বিড়ির মশলা বিছাইয়া দিয়াছে।

ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে সুপরিস্ফুট দৈন্য, মুখে হাসি আনন্দের বিরাম নাই। যাহারা ত্রিতল চারি তল প্রাসাদে বিজলীবাতি জ্বালাইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দেহ রাখিয়া পরম আলস্যে পড়া কিংবা গল্প করিয়া জীবন উপভোগ করিতেছে তাহারা, এবং ফুটপাথে মাদুর বিছাইয়া খোলা হাওয়া ও ধুলার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে শত দিকে সুপ্রকটিত দৈন্যকে অবহেলা করিয়া আমৃত্যু উদ্দাম বাতাসের মত বহিয়া চলিতেছে ইহারা—কাহারও মুখে তো পরাধীনতার বেদনা ঘনাইয়া উঠে নাই! অন্ন ইহাদের ব্যক্তিগত সমস্যাকে সঙ্গীন করিতে পারে নাই; প্রতিযোগিতা হয়ত আছে, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা আলোর সঙ্গে ফুলের বিকাশের প্রতিযোগিতার মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মধ্যবিত্তের মত সংসারে ক্ষুধা এবং সম্ভ্রম দুই তীক্ষ্ণমুখী তীরের আঘাত উহাদের জর্জ্জরিত করিয়া তোলে না। একটি মানুষের উপার্জ্জনের উপর বৃহৎ সংসারের মরণ-বাঁচনের সমস্যা তো নাই! তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ইহারা পরম অসুখী নহে। ইহারা আকাশ-বিচ্যুত বারিধারার মত—উপরের বিন্দু নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যাইতেছে প্রতিমুহূর্ত্তে—কিন্তু যে ক্ষেত্রটিতে পড়িয়া বিন্দুলীলা সংবরণ করিতেছে সেটি উষর মরুভূমি নহে, কাজেই নদীরূপে না হউক, নালারূপেও কিছু দিন তার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেশ আছে ইহারা; আপিস নাই এবং আবর্ত্ত নাই। সত্যকারের সুখ নাই এবং সত্যকারের দুঃখও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গলায় ঝুলাইয়া অমিয় আজ এতটুকু সৎসাহস তো দেখাইতে পারিল না! বর্ষার দিনে এঁটেল মেঠো পথে কাদা বাঁচাইয়া কে চলিতে পারে?

৫

সোমবার বহুদূরের কথা, আপাততঃ শনিবার আসিল। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সুবিধা অনেক। সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকেট পাওয়া যায়। অমিয় সপ্তাহান্তিক যাত্রীর সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে—অল্প ভাড়ায় টিকেট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিয়াছে। খগেনবাবু দরখাস্তটি ফেরত পাইবার আশায় অমিয়র কাছে আসিয়া সত্য কথাই শুনিয়াছেন—এবং হবিপুষ্ট পাবকের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ছুটি না পাওয়া পর্য্যন্ত সেকৃশ্যনটিকে জ্বালাইয়া মারিয়াছেন। দাদা অনুপস্থিত বলিয়া কলহটা ভাল করিয়া বাধে নাই। সে সুযোগ সোমবার হয়তো মিলিবে। কিন্তু আজ শনিবার—লোকজনের ব্যস্ততার অন্ত নাই। কাহারও ভুল লইয়া কাহারও সঙ্গে দীর্ঘ কলহ বাধাইবার দিন আজ নহে। আপিসের কঠিন শাস্তির ধারা আজ কিছু কোমল বোধ হইতেছে, প্রবল এক অনুভূতি অন্য সব চেতনাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। আজ পোঁটলাপুঁটুলিতে মানুষ ভারাক্রান্ত; ব্যাগে, ঝাড়নে, ঝুলিতে সে সঞ্চয় করিয়া চলিতেছে। এক পয়সার পাতিলেবুর পাশে এক টাকা দামের সুরভিত কেশতৈল ও লালপাড় শাড়ীর সঙ্গে বার্লির কৌটা—কোনটার মূল্যই আজ তুচ্ছ নহে। কপি আছে, বালতি আছে; পাঁউরুটি, বিলাতী কুল, কমলা লেবু, বেদানা ও মশলাপাতি, খোকাখুকীর লজেঞ্জ, বিস্‌কিট্—কোন্‌টা নাই? বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর চাপে অন্তরের অভাব এই একটি দিনের জন্য কোথায় যেন তলাইয়া যায়। কেন যায়? মুক্তিপ্রয়াসী ও বৈচিত্র্যপ্রয়াসী মানুষ আজ ট্রেনে চাপিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য জীবনকে এই সব তীব্র অনুভূত আনন্দের মাঝে চাখিয়া চাখিয়া ভোগ করিতে পারিবে। আপিসের

উৎপীড়ন ও বাড়ীর দুঃখকষ্ট—তারই মাঝখানে রেলপথের সুদীর্ঘ মুক্তি-সেতু।

অমিয়র হাতে পয়সা বিশেষ কিছু ছিল না। মাহিনার দেরি আছে, কিন্তু টাকার অভাব হয় নাই। যে-আড়তদারের বাসায় সে থাকিত সেই যাচিয়া টাকা দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। লক্ষ্মীর প্রাসাদপথটি যে সৌভাগ্যবান একবার চিনিয়াছে সূচীভেদ্য অন্ধকারেও সে পথ ভুল করিবে না, এই বিশ্বাস আড়তদারের ছিল। দুটি টাকা হাতে দিয়া সে বলিয়াছিল,—"বাড়ী ঘুরে এস, ঠাকুর।"

দুটি টাকার মধ্যে আট আনা মাত্র ভাড়ায় যাইবে। বাকীটায় কি জিনিষ সে কিনিবে? শিবপূজার জন্য একখানি তামার টাট মা কিনিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। পুরানো টাটখানি ফুটা হইয়া গিয়াছে, জল পড়িয়া যায়। আরও বহু জিনিষ আছে, কিন্তু সে-সব মাসকাবারের প্রতীক্ষায় থাকুক।

ছুটি হইলে টিকেট কাটিয়া সে শিয়ালদহের বাজার ঘুরিতে গেল। শীত শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি কপির আমদানি কমে নাই। গরিবের পক্ষে তরকারি কিনিবার কালাকাল নাই। এ সময়ে দেশে পাতিলেবু পাওয়া যায় না, দামও চড়া। কমলা লেবু শুকাইয়া গেলেও অখাদ্য নহে। ভাল কথা, মাথা আঁচড়াইবার জন্য চিরুণী একখানি আবশ্যক। পটোলের সের বার আনা হইলেও তরকারি হিসাবে নূতন এবং লোভনীয়। একখানা গন্ধ সাবান, কাপড়কাচা সাবানের একটা ডেলা, সুপারি, খয়ের, কিছু কিছু মশলা—নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ দোকানে ঠাসা রহিয়াছে। বাজারে ঢুকিয়া মনে হয়, কত বৃহৎ অভাবকে আমরা ক্ষুদ্র সংসারে চক্ষু বুজিয়া গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। শুধু আলুভাতে দিয়া ভাত খাওয়া চলে, আবার বার আনা সেরের পটোল সম্মুখে পড়িলে রুচির

দোহাই দিয়া তাহাও কিনি। শুধু খয়ের-সুপারিতে যে-পান মিষ্ট লাগিবার কথা, অনেক রকমের মশলা দেখিয়া সে-পানের স্বাদ বদলাইয়া যায়। যে শাড়ীর বিবিধতর পাড় না দেখিয়াছে—সেই হয়তো আটপৌরে কাপড় খুশী মনে গ্রহণ করে।

সে যাহা হউক, একটি সিকি হাতে থাকিতে অমিয়র ট্রেনের সময় হইয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সে ট্রেনে চাপিল।

ট্রেনে ভিড় হইয়াছে মন্দ নহে; গরমও কিছু বোধ হইতেছে। সূর্য্য-অভিমুখী জানালার দিকে কেহ বসিতে চাহিতেছেন না, মাঝ-খানেও বসিবার আগ্রহ কম। একটি কোণ ঘেঁষিয়া, রৌদ্র বাঁচাইয়া ও ফাঁকা মাঠের পানে চাহিবার সুবিধা করিয়া বসিবার আগ্রহই সকলের বেশী। প্রত্যেকেই আধময়লা ঝাড়ন বা বাদামী রঙের কাগজ অথবা পুরাতন সংবাদপত্র পাতিয়া বসিয়াছেন। ফরসা কাপড়কে ফরসা রাখিবার চেষ্টা ও ছারপোকার আক্রমণ হইতে দেহরক্ষা—দুটি কার্য্যই ইহাতে চলে ভাল। নিজে বসিয়া আরও পরিচিত পাঁচ জনকে ডাকিয়া পাশে বসাইতেছেন। পান, সিগারেট ও বিড়ি বিতরণে আজ কাহারও কার্পণ্য নাই; হাতের সংবাদপত্র যেখানি ছিল, তাহার পাতাগুলি বণ্টিত অবস্থায় বেঞ্চিস্থ সকলের সংবাদ ক্ষুধাই কিঞ্চিৎ মিটাইতেছে। কিন্তু শনিবারের দুপুরে বাড়ী যাইবার সময়ে এ-সবের আবশ্যকও বড় বেশী দেখা যায় না। কোন বন্ধুর সঙ্গে সপ্তাহ-পরে দেখা হইয়াছে, কেহ বা মাসান্তের অপরিচয়ের যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাদের সংসারের ও জীবনের বিচিত্র কলরব ও কাহিনীতে কয়েক ঘণ্টা সুখস্বপ্নের মতই হয়তো কাটিয়া যাইবে। হাসিমুখে তাহারা দুঃখের গল্প জমাইবে—এবং চোখের জল না ফেলিয়াই করুণ কাহিনীতে বর্ণ সমাবেশ করিবে। সত্যই কি এই গতিশীল ট্রেনের পথে কেহ কাহারও দুঃখ বুঝিবার চেষ্টা মাত্র করিয়া থাকে? দুঃসহ

গতিবেগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহিঃপ্রকৃতি যেখানে পরিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছে, সেখানে—অথবা যে আকাশের মেঘে কালবৈশাখীর ঝড় লাগিয়াছে—তাহারই একটি কোণে দুঃখনীড় রচনা করিবার হাস্যকর প্রয়াস মানুষের কেন ? প্রকৃত আনন্দের ভাগ দিবার বেলায় যে পরম কৃপণ, কিন্তু গভীর দুঃখকে বিলাইয়া দিবার ঔদার্য্যে সে তত চঞ্চল। আসলে মানুষ দুঃখকে লইয়া বিলাস করিতে ভালবাসে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সঙ্গে অমিয়র সারা অন্তর দুলিয়া উঠিল। ঠাসাঠাসি মানুষ বসিয়াছে, বাঙ্কের উপর জিনিষপত্র উপচিয়া পড়িতেছে, তথাপি শহরের ধূমমলিন আকাশ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে মন মাতিয়া উঠিতেছে। ইষ্টক-অরণ্য হইতে বহু দিন পরে আজ সে মুক্তিলাভ করিতেছে। পীচ-বাঁধান উত্তপ্ত রাস্তার ধারে একটিও সতেজ, সবুজ পল্লব-শ্রীমণ্ডিত বৃক্ষ চোখে পড়ে না। আকাশের নীল বর্ণ নাই, চাঁদকে মনে হয় ঘষা কাচের থালা। এখানে কেয়ারী-করা লনে মরসুমী ফুলই মানায় ভাল। বিস্তীর্ণ জমি নাই, জমিকে অতিক্রম করিবার সতেজ স্বাস্থ্য বা স্পর্দ্ধাও নাই কোন গাছের। লতার আলিঙ্গনে গোলাপের চারা নষ্ট হয় না, এবং যেখানে-সেখানে দূর্ব্বা জন্মিয়া গাছের গোড়া জঙ্গলময় করে না। মাপা জমিতে—মাপা গাছের পরিমিত সৌন্দর্য্য ;—শাখা মেলিলে মালীর কাঁচি আছে, শিকড় মেলিলে সিমেণ্ট-বাঁধানো চত্বর আছে। মানুষ আপনার ধর্ম্ম অনুসারে গাছকেও দীক্ষা দিয়াছে। শহরতলী ছাড়াইতেই ফাঁকা মাঠের প্রসার বাড়িল ; রুক্ষ, বন্ধ্যা মাঠ, তথাপি কি গভীর সৌন্দর্য্য। দূর দিক্‌চক্রবালসীমায় আকাশ যেখানে ভূমিলক্ষ্মীর চরণ চুম্বন করিতেছে সেই অস্পষ্ট ধূমরেখায় সৃষ্টির অনন্ত রহস্য হয়তো সর্ব্বমনের অগোচরে নিত্য লিখিত হইতেছে ! ঊর্দ্ধশির নারিকেলতালশ্রেণী চিহ্নিত কত গ্রাম

দু-ধারে পড়িতেছে। কোথাও বৃত্তাকারে চিল উড়িতেছে, কোনও মাঠে দলবদ্ধ গো-মহিষ গোচারণ-ভূমিতে মুখ সংলগ্ন করিয়া পুচ্ছ আন্দোলন করিতেছে, কোন নিষ্পত্র বাবলা গাছের শাখায় বকের সারি সাদা ফুল ফুটাইয়া বসিয়া আছে, কোন অগভীর ডোবায় ঝাঁক বাঁধিয়া হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। সশীর্ষ আমের বোল কোন বাগানে পুড়িয়া কালো হইয়াছে—কোথাও বা কচি ফলভারে গাছের শ্রী বর্দ্ধন করিতেছে। দূর মাঠে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলিতেছে বেশ।

লোকাল ট্রেন হইলেও গতিবেগ আছে; ছোটখাট ষ্টেশন সদম্ভে ও ও সশব্দে পার হইয়া যাইতেছে। ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় যাত্রীদের মনে আভিজাত্যবোধও একটু জাগাইয়া দিতেছে বুঝি! আমরা যেখানে যাইব সে-ষ্টেশন বড়—সে-দেশের মূল্য আছে। আমাদের বহন করিয়া ট্রেন তাই অজ্ঞাত অখ্যাত পথিপার্শ্বস্থ ষ্টেশনে থামিয়া নিজের তথা আমাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছে না। ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় কোন অতি উৎসাহী মর্য্যাদাবান যুবক হয়তো দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জানালার বাহিরে আনিয়া সে-কথা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না।

কেহ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পরম উৎসাহে বলিতেছে, "যা চালিয়েছে গাড়ী। উঃ! বিফোর্ টাইমে না পৌঁছায়।"

ট্রেনের নীচেয় বাঁধা লৌহপথ আছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আছে সে-কথা অতি উৎসাহে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে বুঝি!

ইছাপুরে গাড়ী থামিলে অমিয়র পরিচিত এক যুবক উঠিল। উঠিয়াই সোৎসাহে চীৎকার করিল, "হ্যাল্লো, অমিয় যে।"

চীৎকারের প্রত্যুত্তরে অমিয় আর একটু সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে বসিবার জায়গা দিল।

বীরেন বসিয়া অমিয়র পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, “তার পর ভাল তো? চাকরি-টাকরি কিছু হ’ল ?”

অমিয় মৃদু হাসিয়া বলিল, “কি মনে হয় ?”

বীরেন তাহার পানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

“হাসলে যে ?”

“এক মাস আগের কথা মনে পড়ল। শ্যামবাজার না বেলগেছে কোথায় যেন দেখা হয়েছিল তোর সঙ্গে। আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম, তুইও ঠিক এই উত্তর দিয়েছিলি। আমি তোর মুখ দেখেও কিন্তু ঠিক অনুমান করতে পারি নি।”

অমিয় হাসিয়া বলিল, “তুমি বলেছিলে আমার চাকরি হয়েছে এবং সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাও নি যতক্ষণ না তোমার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলাম।”

“ঠিক, ঠিক!” একটু থামিয়া বলিল, “আজ কিন্তু আমি ঠিক অনুমান করেছি, আমার সে-টাকাটা বোধ হয়—”

অমিয় বলিল, “তোমার প্রথম অনুমান সত্য, দ্বিতীয় অনুমান ভুল।”

সাশ্চর্য্যে বীরেন বলিল, “অর্থাৎ ?”

“অর্থাৎ চাকরি আমার হয়েছে, কিন্তু টাকা শোধ দেবার সামর্থ্য নেই।”

“যাঃ—কি বাজে বকিস্? একটা বিড়ি দে।”

“বিড়ি আমি খাই নে।”

বীরেনের বিস্ময় যেন বাড়িতেই লাগিল, “বিড়ি খাস নে? তবে যে বললি চাকরি হয়েছে ?”

অমিয় হাসিল, “বাঃ রে, চাকরি হ’লেই বিড়ি খেতে হবে—এ কোন্ ন্যায়শাস্ত্রের বিধান ?”

বীরেন বলিল, "আমাদের শাস্ত্রটা আমরাই গড়ি যে, ন্যায় অন্যায় অত বাছি নে। কতকগুলো ফরমূলা নিয়ে আমাদের জীবন। দশ জনের যেটা আছে সেটা তোর বেলাতেই কি ব্যতিক্রম ?"

"কি ফরমূলা বীরেন-দা ?"

"তুই ছেলেমানুষ, অমিয়, সব বুঝবি নে। যেটা আমরা পাই নে সেটার জন্য আগ্রহও আমাদের বড় বেশী। আমরা যোগ্যতার কথা ভুলে যাই, লোভের বশেই কাজ করি। এই ধর, স্বরাজ পাব ব'লে এক বছরের মেয়াদে যেমন সিগারেট ছেড়ে ছিলাম। স্বরাজ তো কেউ পাইয়ে দিলে না, আকাশ থেকেও পাকা ফলটির মত টুপ ক'রে খসে পড়লো না, কাজেই আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ঠিক একটি বছর পরে আবার আমরা সোৎসাহে সিগ্রেট টানছি। কলম পিষতে পিষতে ক্লান্তি আসে যখন, ধরাও একটা বিড়ি—কোথায় সে ক্লান্তি উবে যাবে! যে কেরানী—সে যদি বলে বিড়ি-সিগ্রেট খায় না তো আমার মনে হয় বাঙালী হয়ে মাছ না-খাওয়াটা তার চেয়ে কম আশ্চর্য্যের নয়! বিড়ি ধর, অমিয়, বিড়ি ধর, চাকরিতে না হ'লে উন্নতি হবে না।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "তোমার মতামতগুলো এখনও তেমনি আছে। রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ ক'রেও কিছু বদলায় নি। কই, তোমার টাকার কথা কিছু বললে না তো ?"

"ধার নিয়েছিস তুই—শোধ দেবার ভাবনা তোরই ; তোর সুবিধা ও সুযোগে সে-ব্যবস্থা আপনিই হবে। রাইফেল-ফ্যাক্টরিতে কাজ ক'রে আমার একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে। শুনবি ? খবরদার শুনে হাসিস না যেন।"

"না, তুমি বল।"

"আসলে আমরা গড়ছি খোকাদের খেলনা, ওরা খেলবে ব'লে।"

"তার পর ?"

"যাই বলিস ওরা আমাদের কম মাইনে দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের বাঁচবার অস্ত্র তৈরি করিয়ে নিচ্ছে, সেটা ভুল। ওরা যদি বাঁচবার ইচ্ছেই ক'রে থাকে, সে আমাদের হাত থেকে নয়, ওদের চেয়ে যারা শক্ত তাদের হাত থেকে। আমরা বড় জোর নিঃশব্দে মরতে জানি। হাত তুলতে জানি না, সুতরাং আমাদের মেরে ওদের অনিষ্ট করতে যাবে কেন ? বরং আমরা বেঁচে থাকলে ওদের অস্ত্র তৈরির ভাবনা থাকবে না।"

"তার পর ?"

"তাই, আমাদের কোন ভয় নেই চাকরি যাবার।"

"চাকরিটাই তোমার কাছে প্রধান বস্তু তাহ'লে ?"

"কার কাছে নয় ? এই হাজার হাজার বি-এ, এম-এ, তোদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরচ্ছে, ওদের একমাত্র লক্ষ্যই তো চাকরি। যে-লেখাপড়ায় অর্থ উপার্জ্জন হয় না, সে-বিদ্যার কদর আমাদের দেশের মেয়েদের কাছেও নেই।"

"হ্যাঁ, মেয়েদের কাছেই নেই! যারা শিক্ষিত তাদের কাছেও কি—"

"তোর তথাকথিত ডিগ্রিধারী শিক্ষিতদের কথা আর বলিস নে। সাতটা মাষ্টার রেখে আর সাত-শ খানা নোটের বই মুখস্থ ক'রে ওরা উচ্চ-শিক্ষার নদী পেরবার চেষ্টা করে। লক্ষ্য থাকে ঐ ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি। যে এই পরম পদ পেলে—সেই ভাগ্যবান, যে পেলে না, সে কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারের কীর্ত্তন ক'রে মনঃক্ষোভ মেটায়।"

অমিয় ম্লানমুখে বলিল, "এ-কথা যে কতখানি সত্য তা চাকরি পাবার সময়ে বুঝেছি। কেন এমন হয় জান, বীরেন-দা? আমরা

নিতান্ত অন্নগত প্রাণ ব'লে। আমাদের দৈন্য তো এক পুরুষের নয়, পিতৃপিতামহের কাছ থেকে ঐ মূলধনটুকু পেয়েই মেরুদণ্ড আমাদের বাঁকা হয়ে পড়েছে।"

বীরেনের দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "কেন তাঁরা এত বড় অন্যায় ক'রে গেছেন, অমিয়? তাঁদের জীবনে যে তুষানলের দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন আমাদের জীবনকে তারই মধ্যে রেখে তাঁরা দায়িত্ব এড়িয়েছেন। সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই যাঁদের, তাঁদের সংসার পাতার বিড়ম্বনা কেন? এক-একটি দুঃখী পরিবারের সৃষ্টি ক'রে নিজের পারলৌকিক জল-গণ্ডুষের ব্যবস্থা করতে যাঁদের বাধে নি, তাঁদের সঙ্গে এতটুকু ঋণের সম্পর্ক আমাদের নেই; না শ্রদ্ধার, না কৃতজ্ঞতার।"

বীরেনের ক্রোধ দেখিয়া অমিয় কৌতুক অনুভব করিল। কহিল, "তাঁদের সামনে পেলে তুমি দেখছি গলা টিপে মারবে!"

বীরেন বলিল, "তাঁদের জিজ্ঞাসা করতাম, দেহের ক্ষুধা মেটাবার তো অন্য উপায় যথেষ্ট ছিল, কেন তোমরা আরও গোটাকতক দরিদ্র দাস তৈরি করবার জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসার পেতেছিলে? কেন আমাদের দুঃখের হ্রদে নামিয়ে দিয়ে সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলে? খুব চালাক তাঁরা, তাই আমার জ্ঞান হবার আগেই সরে পড়েছেন।"

অমিয় বলিল, "তাহ'লে তুমি বিয়ে কর নি?"

বীরেন বলিল, "ও জিনিষটা কি অত্যাবশ্যক? দাস সৃষ্টি করার উৎসাহ আমার নেই। একটি দরিদ্র কম জন্মালে বেকাররা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, দেশমাতাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।"

অমিয় বলিল, "দারিদ্র্যের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখও আছে। বৃহৎ দুঃখ বইবার যোগ্যতা যার নেই—"

বীরেন হাসিল, "দুঃখকে যতই মহত্ত্বমণ্ডিত কর না কেন, দুঃখ আসলে দুঃখই। যোগ্যতা, দায়িত্ব, সম্মান বোধ—ও-সব স্রেফ মন-ভুলানো কথা। যেটা সহ্যের সীমা ছাড়ায়, সেইটার মধ্যে মহত্ত্বের আরোপ না করলে মানুষের আত্মহত্যা করা ছাড়া যে পথ নেই।"

অমিয় বলিল, "মানুষ চায় সঙ্গী। একা যে জিনিষ বহন করতে ভয় পায় বা ক্লান্তি বোধ করে, দু-জনে অনায়াসে তা মাথায় তুলে নিতে পারে। দু-জনের দুঃখ দিয়ে রচনা করে তারা সুখের একটি সুকোমল কবিতা—"

বীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আর জ্বালাস নে; রবিবাবুর 'শেষের কবিতা'র ন্যাকামিপূর্ণ অনুকরণ আমার ভাল লাগে না। যাদের ব্যাঙ্কের খাতা পরিপুষ্ট তাদের ওই সব স্রেফ ন্যাকামি সাজে। তবে এ-কথা সত্য, মানুষ সুখে বা দুঃখে সঙ্গী চায়। সঙ্গীকে নিয়ে নরক সৃষ্টি ক'রেও তার উল্লাস।"

অমিয় বলিল,"দুঃখবাদ মেনে তুমি বড্ড কঠিন হয়ে পড়েছ, বীরেন-দা!"

বীরেন বলিল, "মন কঠিন না হ'লে শেল্ ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে পারব কেন? আমরা মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করি যে!"

অমিয় বলিল, "যদি বলি তুমি কাপুরুষ। দুঃখ পাবার ভয়ে দুঃখকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছ?"

বীরেন বলিল, "স্বচ্ছন্দে সে কথা বলতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। দুঃখকে এক পাশে ঠেলে ফেলাই আমার উদ্দেশ্য।"

"কিন্তু পেরেছ কি তাকে ঠেলে ফেলতে? হাতের ঐ সিগ্রেটটার মত জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেই সে চলে যায় কি?"

বীরেন বলিল, "সিগ্রেট গেলেও ওর ধোঁয়া আর গন্ধ যেমন খানিকক্ষণ ওটাকে মনে করিয়ে দেয়, দুঃখটাও তাই। সিগ্রেটের যেমন একটি আকার, দুঃখের তা তো নয়। কোন্ আকারে সে যে মনকে পেয়ে বসে তার

ঠিকানা পাওয়াই যে মুস্কিল! যাক্, গল্পে গল্পে নৈহাটি এসে গেল, পান কেনা যাক্।'

বীরেন দুয়ারের কাছে উঠিয়া আসিল, উচ্চৈঃস্বরে পানওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।

অমিয় একমনে যাত্রীদের ওঠানামা দেখিতে লাগিল। বৃহৎ পোঁটলা, স্ত্রীলোক, এবং কুলি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করিতে করিতে প্রত্যেক কামরায় উঁকি মারিতেছেন। শনিবার বলিয়া গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। তাঁহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়াও কেহ সহানুভূতি দেখাইতেছে না। ভদ্রলোক ভাঙা আর্ত্তস্বরে মিনতি করিতেছেন, "মশাই দয়া ক'রে একটু জায়গা দিন। মশাই—"

বীরেন ঘটাং করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং ভদ্রলোকের হাত হইতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, ছোটখাট পুঁটুলি, লাঠি, ও টুকিটাকি জিনিষভরা বালতিটি লইয়া গাড়ীর মধ্যে রাখিল।

ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। করুণ চক্ষে বীরেনকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। কুলির হাতে চারিটি পয়সা দিতেই সে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "এক আনা! নেহি বাবুসাব—এতনা হায়রানি কিয়া—"

ভদ্রলোকের করুণ চক্ষে তৎক্ষণাৎ রোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, "তোদের স্বভাবই ঐ। যত দাও—মন আর ওঠে না।"

পুরা দুই মিনিট ধস্তাধস্তি করিয়া গাড়ী গতিলাভ না করা পর্য্যন্ত আর একটি পয়সা দিয়া ভদ্রলোক নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিও পয়সা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভদ্রলোকের সাধুত্বের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া ফুটবোর্ড হইতে নামিয়া পড়িল। এমন ঘটনা প্রত্যহই ঘটে, নূতন বলিয়া কাহারও মনে বিশেষ রেখাপাত করিল না।

মহিলাটি ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

বীরেন অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "ওঠ্ রে অমিয়, ওঁকে বসবার জায়গা দে।"

অমিয় উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দুঃখকে সব সময় অস্বীকার করা চলে কি বীরেন-দা ?"

বীরেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "না। যত দিন আমাদের সেন্টিমেণ্টালিটি না যাবে। উঃ, কি জিনিষই আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ !"

"কেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আগে কি ও জিনিষটা আমাদের দুর্লভ ছিল ?"

"না রে, যে-মাটিতে শ্রীখোল তৈরি হ'ল—তা যে বহু কাল থেকে আমরাই নরম করে রেখেছিলাম। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ ব'লেই ভাবের চাষ-আবাদে ফসল ফলে ভাল। শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেছিলেন, তাই ধর্ম্ম চালাতে এবং ধর্ম্ম বাঁচাতে তরবারির আশ্রয় নেন নি, শ্রীখোলের আশ্রয় নিয়েছিলেন !"

"তাতে ফল হ'ল—"

"একটা ভাল ফল হ'ল বইকি, অমিয়। একতারা বাজিয়ে চাল আদায় করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। গতরকে গতর বজায় রইল, আলস্যের কাঁথাখানি গা থেকে খুলতে হ'ল না, সময় কাটাবার জন্য উচ্চরোলে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা রইল। কম লাভের কথা কি! সুখদুঃখের ইকুইলিব্রিয়ামে কেমন সহজ জীবনধারণ-প্রণালী এটি বল দেখি।"

অমিয় বীরেনের গা টিপিয়া বলিল, "আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোকসুদ্ধ আসন গ্রহণ করলেন যে !"

বীরেন বলিল, "হয়তো স্ত্রীর সম্ভ্রমরক্ষার খাতিরে। দেখছ না, উনি না বসলে ওপাশের ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে পর্দ্দা সৃষ্টি হ'ত কি ক'রে।"

তত ক্ষণে ভদ্রলোক পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন।

"ক'টা পুঁটুলি আছে গুনে নিয়েছ তো? তোমার কাপড়ের ট্রাঙ্কটা—ঐ যে, গহনার বাক্স—হ্যাঁ, সদাসর্ব্বদা হাতে ক'রে রাখবে; এই বালতি, বিছানা, পুইডাঁটা, কুমড়ো, হ্যারিকেন, সব আছে তো? ব্যস, ব্যস! হুঁকোটা কোথায় রাখলে—এক ছিলিম টানতে পারলে মন্দ হ'ত না।"

মহিলাটি মৃদুস্বরে বলিলেন, "হুঁকো তো আনা হয় নি।"

"আনা হয় নি! য়্যাঁ!" খানিক বিস্ময়ে চাহিয়া সহসা স্থানকাল ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মেয়েমানুষের ডিম কত আর হবে, আসল জিনিষেই ভুল হ'ল তো? হাজার বার পই পই ক'রে বললাম, ওগো কিছু যেন ভুল হয় না, ভুল হয় না। বলা হ'ল, না গো না, তোমার কাজ তুমি কর গে। এখন?"

মহিলাটি ঘোমটা খুলিলেন না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ঈষৎ চড়াইয়া ব্যঙ্গভর কণ্ঠে কহিলেন, "কি ভুলটা হয়েছে শুনি? গহনার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, পুঁইশাক, লণ্ঠন—কোন্‌টা ভুলেছি শুনি? নিই নি ইচ্ছে করেই হুঁকোটা। বলি কি, আধ পয়সার বিড়ি কিনে মুখে আগুন জ্বেলো এখন। ইষ্টিশান তো মরুভূমি হয় নি যে—"

ভদ্রলোক চাপা কণ্ঠে বলিলেন, "থাক, থাক, আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। খুব হয়েছে। আমার যেমন মরণ তাই মেয়েমানুষের কথায় বিশ্বেস করে চুপ ক'রে রইলাম! ষ্টেশন ছেড়ে গেল, এখন বিড়ি পাই কোথায়?"

ভদ্রলোক হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিলেন।

বীরেন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া কহিল, "দেশালাই দেব নাকি?"

"না, না, আপনি আবার কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তুমি ছেলের বয়সী হ'লেও বিড়ি-সিগ্রেটে দোষ নেই! বিদ্যেসাগর কি বলতেন জান—খাবি তো সামনে খা, লুকিয়ে খাওয়াটা দোষের, পাপের।"

দুই হাতের তালুতে ব্যূহ রচনা করিয়া তিনি দেশলাই জ্বালিলেন এবং বিড়ি ধরাইয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

"নিবাস অনেকদূর—রাণাঘাট। আপনি কোথায় নামবেন?"

"এই শিমুরালি। শিমুরালি ওঁর—এই আমার শ্বশুরবাড়ী কি না। যাচ্ছি অনেক দিন পরে। দ্বিতীয় পক্ষ হ'লে হবে কি মশাই, মাসে মাসে এখানে সস্ত্রীক যদি না আসি তো শ্বশুরপক্ষের অনুযোগের অন্ত থাকে না।"

"আপনার নিবাস কোথায়?"

"মাজদিয়া ষ্টেশনে নেমে কেষ্টগঞ্জে যেতে হয়। নামমাত্র বাড়ী প'ড়ে আছে, বন-জঙ্গল—কেউ সেখানে বাস করতে পারে না।"

"নৈহাটিতে থাকেন বুঝি!"

"হ্যাঁ, কর্ম্মস্থল কি না। গৌরীপুর মিল জানেন তো, তারই বড়বাবু আমি। মাইনে কম হ'লেও উপায় কিছু আছে—উপরি। ছিল এক সময়ে যখন মাসে চারটি অঙ্ক বাঁধা ছিল মশাই। সেই ঝোঁকের মাথায় জমি কিনে বাড়ী পর্য্যন্ত তৈরী করলাম ওখানে।"

"তাহ'লে জন্মভিটা ত্যাগ করলেন।"

ভদ্রলোক হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মার সেই বনজঙ্গলে-ভরা ভাঙা ভিটের মাথায়। সাত সরিক, মশাই—সাত সরিক। তিনটি বছর খাজনা টেনে টেনে দিলাম ছেড়ে, আমি উপায় করি ব'লে ওরাও জো পেয়ে খাজনা বন্ধ করেছিল। ভাবলে ভিটের গরজ ওর বেশী—না দিয়ে পারবে না। আজ পাঁচ বছর আর ও-মুখো হই নি, এক পয়সা

ঠেকাই নি। শুনেছি বাকী খাজনার দায়ে বাস্তুভিটে নিলাম হয়ে গেছে। আপদ গেছে।" ভদ্রলোক পরম খুশীভরে হাসিতে লাগিলেন।

বীরেন বলিল, "তবে তো মহৎ কাজই করেছেন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি হয়তো বলবেন সাতপুরুষের ভিটে, জন্মভূমি—ইত্যাদি। কিন্তু সাপখোপের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, রোগে জেরবার হয়ে, জ্ঞাতিশত্রুর সঙ্গে খাওয়াখাওয়ি ক'রে সে-ভিটেয় বাস করা কি খুবই সুখের হ'ত? আমরা বাঙালী, সারা দেশটাই তো আমাদের জন্মভূমি। হয় এ-জেলা, নয় আর এক জেলা, বাংলার বার হই নি তো।"

বীরেন বলিল, "না, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যাঁরা বাঙলা মুলুক ছেড়ে প্রবাসী হন তাঁরাও স্বাস্থ্যবিধানের নজির দেখান। ঐ সাপ, শেয়াল, বনজঙ্গল, মশা, ম্যালেরিয়া, বিশ্রী গরম আর জ'লো শীতের কথা তাঁরাও শতমুখে কীর্ত্তন করেন। বাংলা দেশ বাঙালীর বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে দিন দিন। না?"

ভদ্রলোক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "সে-কথা তো আমি বলি নি। চাকরি-স্থলে কাটে আমাদের সমস্ত জীবন। বুড়ো বয়সে কি রোগেব সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে?"

বীরেন উচ্চহাস্যে বলিল, "আমরা যুদ্ধ করি কখন, মশাই? ছেলে, বুড়ো, যুবো, সবাই তো আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছি। স্কুলের পড়া, চাকরি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন দিব্যি পর পর সাজানো থাকে; মাঝখানে অবশ্য কিছু জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদির সমারোহ আছে; কতক বা অর্থকষ্ট, রোগভোগ, মৃত্যুর উপসর্গ আসে। কিন্তু সবই সাজানো পর পর।"

ভদ্রলোক সরবে হাসিলেন, ট্রেনসুদ্ধ লোকই হাসিয়া উঠিল।

অমিয় বীরেনের হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, "তোমার লেকচার দেওয়ারও অভ্যাস আছে ?"

বীরেন বলিল, "কিন্তু শ্রোতা পাই না তেমন। হাসির কথা বললে, ওঁরা মুখ ভার করেন, আবার গম্ভীর কথায় হাসেন। দোষটা আমার বাক্‌ভঙ্গীর না অঙ্গভঙ্গীর, অমিয় ?"

অমিয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শিমুরালি ষ্টেশন আসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গাড়ী থামিতে-না-থামিতে বিছানা-বাক্স টানাটানি করিতে লাগিলেন এবং ট্রেন থামিবামাত্র ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া বালতির উপর পড়িলেন। ঝন্‌ঝন্ শব্দে বালতিটা বাজিয়া উঠিল এবং কয়েকটি ছোটখাট জিনিষও এধার ওধার ছড়াইয়া পড়িল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রকরে সেগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "এই কুলি, কুলি, ইধার আও।"

ষ্টেশনটি ছোট, কুলিপ্রধান নহে। যে দুই-এক জন কুলি ছিল তাহারা অন্য প্রান্তে থাকাতে ডাক শুনিতে পাইল না। ভদ্রলোক অগত্যা বালতি হাতে করিয়া প্লাটফরমে নামিলেন, এবং একে একে ট্রাঙ্ক, বিছানা, পুঁইডাঁটা প্রভৃতি নামাইতে লাগিলেন। তখনও মহিলাটি এক পাশে দাঁড়াইয়া নামিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোক পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রোকো—রোকো—গার্ডসায়েব, রোকো—"

গাড়ীর গতি আরম্ভ হইবার মুখেই থামিয়া গেল। বীরেন অতি কষ্টে মহিলাটিকে নামাইয়া দিল।

ও-পাশ হইতে একটি ছোকরা মন্তব্য করিল, "আসল জিনিষ রইল পড়ে, উনি লাউডাঁটা পুঁইডাঁটা নামাচ্ছেন। আরে বউ না থাকলে তোর পুঁই-ডাঁটা খাবে কে ? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে স্রেফ গবেট বনে গেছ, যাদু।"

উচ্চ হাসির মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বীরেন এবং অমিয় নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

অমিয় বলিল, "ভদ্রলোক বাস্তবাগীশ—"

বীরেন বলিল, "ছোটখাট ঘটনায় মানুষ চেনা যায়। উনি একটি টাইপ।" সহসা অমিয়র পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তুই বিয়ে করেছিস, অমিয়? করেছিস? বাঃ রে, একটা খবরও তো দিস নি আমায়!"

অমিয় বলিল, "খবর দেবার অবসর পাই নি। আমরা যখন জন্মাই তখন থেকেই পাত্রী ঠিক হয়ে থাকে! গরিবের কন্যাদায় বড় জিনিষ।"

মুখ বিকৃত করিয়া বীরেন বলিল, "ওই ন্যাকামিপূর্ণ কথাগুলো আর বলিস নে। যে গরিব, সে ইচ্ছে ক'রে কন্যাদায়গ্রস্ত হয় কেন? কন্যা যদি জন্মায় তাকে দায় মনে করেই বা কেন? দারিদ্র্য যে মহাপাপ, তা আমাদের কাপুরুষতাই পদে পদে প্রমাণ ক'রে দেয়।"

অমিয় বলিল, "তোমার যুক্তি বিয়ে না করার দিকে, তুমি হয়তো এ-সব বুঝবে না, বীরেন-দা।"

বীরেন বলিল, "আমি বুঝতেও চাই নে, অমিয়। তোরাই দায় সৃষ্টি করিস, পুণ্য সৃষ্টি করিস, আবার নরকবাসের ব্যবস্থাও দিয়ে রেখেছিস। কন্যার জন্ম তোদের দাম্পত্যজীবনে মহা অকল্যাণ! যখনই বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিস হাসিমুখে—তখনই দায় বইবার শক্তি সঞ্চয় করিস না কেন? কাপুরুষ তোরা, এক বার নয়, হাজার বার।"

ক্রুদ্ধমুখে বীরেন অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটায় একটা প্রচণ্ড টান দিয়া সেটা জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল। অমিয় কোন কথা কহিল না। গাড়ী ছুটিয়াছে, সশব্দে মাঠপ্রান্তর অতিক্রম করিতেছে। এদিকে মাঠ-প্রান্তরের প্রসার ও আকাশে নীলের গাঢ়ত্ব বেশী। মাঝে মাঝে আমবাগান পড়িয়া সেই একটানা ফাঁকা সৌন্দর্য্যকে খণ্ডিত করিতেছে, তথাপি সে সৌন্দর্য্য

চোখকে স্নিগ্ধ করে। এই মাত্র লতাজালবেষ্টিত গুল্মগুলিতে বনপুষ্প ফুটিয়া উপরের শোভা এবং নীচের ভীতিপ্রদ অন্ধকার মেলিয়া ধরিতেছে; পরক্ষণেই পাটকাপাটি রচিত অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যা তাম্বুলিকার অবস্থিতি মনে বিস্ময় জাগাইতেছে। দণ্ড পরেই কলা-বাগানের সারি, নারিকেল-কুঞ্জশোভিত পুষ্করিণী, কোথাও বা বনাভ্যন্তরে ভগ্ন দ্বিতল অট্টালিকা, দূরে শিবমন্দিরের চূড়া, জাগিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। দ্রুতগামী ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া মনও দ্রুতগামী হইয়াছে; কাজেই ঐ ভগ্ন অট্টালিকার, ঐ নারিকেলকুঞ্জশোভিত পুষ্করিণীর, ঐ শিবমন্দিরের, ঐ আমবাগানের বা লতাবেষ্টিত গুল্মের অন্তরালে যে ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার কাহিনী জানিবার বিন্দুমাত্র বিস্ময় কোথাও নাই। একদা যে জিনিষ সমারোহে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কালের প্রবাহে নিঃশব্দে তাহা মিলাইয়া যাইতেছে। যাহা পরিত্যক্ত, তাহার উপর মমতা পোষণ হয়তো দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতেই বাহিরের দৃশ্য বদলাইয়া গেল। ঘন সেগুন গাছের সারি দুই ধারের মাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মাঠ আর নাই, শুধু সেগুন বন—বাঁকুড়ার শাল-জঙ্গলের স্মৃতি বহিয়া আনে। এই বনের মাঝখান দিয়া চলিবার সময় লাইনের উপর লৌহচক্রের অদ্ভুত সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। এমন শব্দ ই. বি. আরের আর কোথাও শোনা যায় না। চক্ষু বুজিয়াও যাত্রী অনায়াসে বুঝিতে পারে—রাণাঘাট আসিতেছে। রাণাঘাট বড় রেলওয়ে জংসন হওয়াতে শহরের আকার ধারণ করিতেছে। এখানে বহু জেলার লোক বাসা বাঁধিয়াছে; বহু বাড়ীঘর তৈয়ারী হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সেগুন-বনের অস্তিত্ব থাকিবে না, লাইনে তেমন সোঁ সোঁ শব্দও উঠিবে না। প্রকৃতিজননী মানুষের তাড়নায় দূরে পলায়ন করিবেন! সেদিন

যাঁহারা শহরে বাস করিবেন তাঁহাদের আভিজাত্যের ও সুখসুবিধার অন্ত থাকিবে না, এবং বয়োবৃদ্ধ যাঁহারা ট্রেনে চাপিয়া সেই অট্টালিকা-অরণ্যের মাঝখান দিয়া ষ্টেশনে পৌছিবেন, অতীতের একটি সুমধুর স্মৃতির দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া হয়তো বা একটি অনতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবেন। পল্লী যখন শহরের শাড়ী পরিয়া আধুনিক কালের দরবারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তখন বৈভব-সমৃদ্ধ ধনিকের পংক্তিতেই তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

অমিয় এবং বীরেন দুই জনেই নামিল। অমিয় গাড়ী বদল করিবে, বীরেনের বাড়ী এইখানেই। নামিয়া বীরেন বলিল, "আবার সোমবারে হয়তো দেখা হবে। প্রতি শনিবার ও প্রতি সোমবার, বুঝলি?" আর কোন কথা না বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া গেট পার হইয়া গেল।

অমিয় ভাবিল, অদ্ভুত বীরেন। কলেজে পড়িবার সময় ও ছিল পুরা গৃহস্থ। গার্হস্থ্য-জীবনের সুখদুঃখ লইয়া আলোচনা করিত; নিজে ভালবাসিবার আগেই সংসার পাতিবে এবং হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবে—এই ছিল উহার জীবনের লক্ষ্য। চাকরিতে ঢুকিয়া এমন ভাবে মত বদলাইল কেন? উহার বিবাহ-বিদ্বেষের মূলে কোন রহস্য আছে, না, দারিদ্র্যের পেষণে এই অদ্ভুত মনোভাবের উৎপত্তি?

শান্তিপুরগামী গাড়ীতে উঠিয়া অমিয় অবশ্য বীরেনের কথা ভুলিয়া গেল। বহু পরিচিতের সম্মুখে তাহার চাকরিপ্রাপ্তির গৌরবময় ইতিহাস বহু বার আবৃত্তি করিয়া সে ক্লান্তি বোধ করিল। ক্লান্তি এবং আনন্দ, দুইই তাহাতে ছিল। এ দিকে রুক্ষ মাঠের বুক চিরিয়া ট্রেন আসিয়া আম-বাগানের মধ্যে পড়িল। দু-ধারে অজস্র আমগাছ, বাগানের পর বাগান চলিয়াছে—শেষ নাই, বিরাম নাই। অমিয় চক্ষু মুদিয়া শীতল আম্রবনছায়া, মুকুল-গন্ধ এবং কল্পনায় আপন ভগ্ন সৌধের অবস্থানটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। এমন সুন্দর দেশ আর কাহার আছে?

৬

আমবাগানের মধ্যেই ষ্টেশন—কয়েকখানি চালাঘর মাত্র এদিকে-ওদিকে দেখা যায়। শান্তরসাস্পদ তপোবনের খানিকটা সযত্নে কে যেন এখানে বসাইয়া দিয়াছে। ষ্টেশনের বাহিরে পাকা রাস্তার উপর অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। না গাড়ী, না ঘোড়া, কাহারও সৌষ্ঠব নাই। ষ্টেশন হইতে গ্রাম পুরা দু-মাইল; যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া স্ত্রী-কন্যা এবং অতিকায় মোটঘাট লইয়া ঐ সব পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত অপূর্ব্ব যানে চাপিয়া থাকেন—তাঁহারা জানেন কোনরূপে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই গাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্কের সমাপ্তি হইবে! এ গাড়ীতে বসিয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া প্রীতির সম্পর্ক পাতান চলে না। এ নিতান্তই দায়ে পড়িয়া ঢেলা বহিবার মত।

ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র চারি দিকে চীৎকার, কলরব এবং হুড়াহুড়ির উদ্দাম স্রোত ঘনাইয়া উঠিল। আগে নামিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। মুটে এবং গাড়ী যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহারা সচীৎকারে সেগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। ষ্টেশনের সঙ্কীর্ণ লৌহদ্বার দিয়া বহুক্ষণের আবদ্ধ জলস্রোতের মতই সবেগে জনস্রোত বাহিরে আসিতে লাগিল। আগে আসিবার আগ্রহে কেহ অল্পাধিক আহত হইল, কাহারও বা ভঙ্গুর জিনিষ কিছু অপচিত হইল।

অমিয় গাড়ীর চেষ্টা দেখিল না, তাহার বন্ধুরাও না।

প্রথমটা স্থরেন বলিয়াছিল, "নতুন চাকরি হ'ল, গাড়ী চড়াবি তো, অমু?"

অমিয় প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, "ভয় কি. পা-গাড়ী আছে। আমবাগানের মধ্য দিয়ে দিব্যি যাওয়া যাবে।"

পাকা রাস্তায় প্রচুর ধুলা, ঘোড়ার গাড়ী দৌড়াইলে হোলির উৎসব আরম্ভ হইয়া যাইবে। বড় রাস্তার পাশেই পায়ে-চলা একটি রাস্তা আছে আমবাগানের মধ্য দিয়া। নির্জ্জন এবং ধুলিলেশহীন। সে রাস্তার দু-ধারে যা চোরকাঁটা আছে, আর কোন উৎপাত নাই। বহুদিন পরে এই রাস্তায় নামিয়া অমিয় সারা দেহে রোমাঞ্চ অনুভব করিল। রাস্তা তো নহে যেন পরম প্রিয়ের প্রসারিত অঙ্গুলি, যাহা স্পর্শমাত্রই পুরাতন স্বপ্ন নূতন রঙে জন্মলাভ করে। আমের বোলে বাগান সুগন্ধময়, পত্রান্তরালে কোকিল ডাকিতেছে, সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছেন। আর কোথাও কোন শব্দ নাই। শুধু তাহারা পাঁচ জনে পথ অতিক্রম করিতেছে। কে এক জন কথা বলিতে গিয়াছিল—অমিয় মিনতি করিয়াছে, এখন কথা নহে, গল্প নহে, কোন প্রকার শব্দ নহে, মৌন প্রকৃতির কোলে বসিয়া নির্ব্বাক্ স্নেহকে শুধু উপভোগ করিয়া যাও। শুক্‌না গাছে কাঠঠোকরা ঠকাঠক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে—কোকিলের মিষ্ট স্বরের বিরাম মুহূর্ত্তে এটিও উপভোগ করা যায়; কাপড়ের প্রান্তে চোরকাঁটা ঘন কালো হইয়া আঁটিয়া গেল, যাক, সাবধানীর মত হাঁটুর কাপড় তুলিয়া ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া-যাওয়া সংসারী-মনকে সচেতন করিয়া লাভ কি? সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে আকাশ যদি দ্রুত আলো নিবাইয়া নীল বসনে সাজিতে থাকে, উতলা মনে—আশু অন্ধকারের ভয়ে পায়ের গতি কেন দ্রুত কর? বাড়ীতে যে পরিপূর্ণ সুখ সঞ্চিত আছে, এই পথের দু-ধারে ক্ষুদ্র খণ্ডসৌন্দর্য্যে সেটি কায়া লাভ করিতেছে। পথকে বাদ দিয়া বাড়ীর কথা ভাবিলে অলঙ্কার-বিহীনা প্রতিমার কথাই মনে জাগিবে।

আমবাগান পার হইয়া তাহারা পুকুরপাড়ে আসিয়া পড়িল। পথে বালির রাশি, পুকুর কাটানর দিন হইতে সে বালি জমিয়াছিল—হয়তো কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—আজও শেষ নাই। এখানকার বসতি কম,

কাজেই বাড়ী তৈয়ার করিতে অল্প লোকেরই বালির প্রয়োজন হইয়াছে, চাল-ছোলা ভাজিতে গৃহস্থের আর কতটুকু বালি লাগে?

পুকুরের শেষে পুনরায় আমবাগান—ঘন ভাঁটবনে ভরা বাগান। অজস্র সাদা ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধও বাহির হইতেছে। কিন্তু আমগাছ ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া অন্ধকার এখানে গাঢ়তর। উহার এক পাশে 'খড়জলা' বাগানের উচ্চ প্রাচীর; কালের আঘাতে সে প্রাচীর কোথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোথাও সংস্কৃত হইয়াছে। অমিয়র সঙ্গীরা হাততালি দিয়া আমবাগানে প্রবেশ করিল।

সৌন্দর্য্য মানুষ কতক্ষণ উপভোগ করিতে পারে? অন্ধকার নামিয়া আসিলেই ভয়ের খাদ সেখানে আপনি মিশিয়া যায়। সবে শীত শেষ হইয়াছে, উপরে অন্ধকার, নীচে ভাঁটের ঝোপে হাঁটু অবধি ঢাকিয়া গিয়াছে—সাপের ভয়ে হাততালি না দিয়া অগ্রসর হইবার জো কি!

হাততালির সঙ্গে কথাও আরম্ভ হইল। সুরেন বলিল, "তুই ভাগ্যবান অমিয়, এক কথায় চাকরি পেলি।"

পাঁচু বলিল, "রেল-আপিসে উন্নতি আছে, না? গ্রেড কত?"

"তা তো জানি না। এখন দেবে ত্রিশ, পরের কথা পরে।"

সুরেন বলিল, "আরম্ভটা কম। তা হোক, গুড্স কোচিং পাস ক'রে যদি ষ্টেশন-মাষ্টার হ'তে পারিস—"

অবনী বলিল, "তা হ'লে মাস গেলে চার-পাঁচ শ টাকা তোর নেয় কে।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "মাষ্টারি নয়, জমিদারি বল। এই তো সবে আরম্ভ, দেখা যাক।"

সুরেন বলিল, "হ্যাঁ, একবার যখন ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিস, ফাল হয়ে বেরতে কতক্ষণ! এ তো আমাদের মার্চেন্ট আপিস নয়, এক কথায়

চাকরি যায়, এক কথায় মাইনে কমে। মন দিয়ে কাজ করবি, উন্নতি হবেই।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "বাঁধা কাজে মনোযোগের বালাই নেই, স্থরেন। ও কলেজের পড়া নয়। কিন্তু ভাবছি চাকরি কি বরাতে সইবে?"

"কেন, কেন?" প্রায় সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিল।

"যে ব্যাপার দেখি আপিসে—দলাদলি, রেষারেষি—"

স্থরেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই! দলাদলি রেষারেষি নেই কোথায়? আমাদের পাড়ায় নেই? আমাদের বাড়ীতে নেই? মায়ে বৌয়ে, জায়ে জায়ে? কংগ্রেসে নেই? ধর্ম্ম নিয়ে নেই? আরে, ইস্কুল লাইফেই কত মারপিট করেছিস, অমিয়—"

পাঁচু বলিল, "দলাদলি না থাকলে কি কাজে লাইফ আসে। অনেক কষ্টে চাকরি পেয়েছিস, তোর ওসব ভাবনা কেন রে?"

অবনী বলিল, "সে যদি বলিস, আমাদের পোষ্ট আপিসে কিছু কম। বছর বছর বাঁধা ইন্‌ক্রিমেণ্ট, এক-শ ষাট অবধি চক্ষু বুজে চলে যাও,—কারও খোশামোদ নেই, চোখরাঙানির ভয় নেই।"

স্থরেন বলিল, "হবে না কন? তোমাদের ইউনিয়নটি কেমন!"

পাঁচু বলিল, "তা ছাড়া তোমাদের ডাইরেক্ট মনিবের সঙ্গে ব'সে কাজ করতে হয় না। সে আমাদের মার্চেণ্ট আপিসে; সামান্য ভুলে যেমন ধমকায়, কাজের লোক হ'লে উন্নতিও আছে।"

অমিয় বলিল, "বাড়ী যাবার সময় আপিসের গল্প ভাল লাগে না, এখন বাড়ীর কথা বল। এবার খালে জল এসেছিল কেমন? খুব বাচ খেলেছিস তো?"

অবনী বলিল, "জল কোথায়! দিন দিন জমি উঁচু হয়ে উঠছে। জল

যা-ও বা আসে, বেশী দিন থাকে না, বাঁধ না কাটালে পুকুরে নৌকা ভাসিয়েছি ব'লে মনে হয়।"

অমিয় বলিল, "খাল ভরাট হয়ে আসছে, আর বেশী দিন আমাদের ভাগ্যে নৌকা ভাসান চলবে না। আচ্ছা অবনী, কেউ যদি খাল কাটিয়ে গঙ্গাটিকে গ্রামের নীচে বার মাস বেঁধে রাখতে পারে ?"

স্থরেন বলিল, "তাহলে গ্রাম দেখতে দেখতে শহর হয়ে ওঠে। শুনেছিস তো, এখানে লাইট নেবার কথা হচ্ছে।"

অমিয় বলিল, "হচ্ছে নাকি ?"

অবনী বলিল, "জলের কলও হয়তো বসবে !"

অমিয় বলিল, "আমাদের দেশে তো বাড়ী বাড়ী পাতকুয়া, জলকষ্ট নেই, অথচ জলের কল হবে ?"

পাঁচু বলিল, "হোক না, কত ছোটখাট অজ-পাড়াগাঁয়ে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে, জলের কল হয়েছে, আমাদের এত বড় গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে !"

স্থরেন বলিল, "রাস্তায় জল দেবার মোটর এসেছে দেখেছিস্ ?"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "না, দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয় নি, শুনেছি। গরিব দেশকে প্রাণপণে শহর বানাবার চেষ্টা চলছে, শুনেছি। মোটরের খরচ কম নয়। তার পেট্রোল আছে, মাইনে-করা ড্রাইভার আছে, কল বিগড়োলে খরচ আছে। কিন্তু গরুর গাড়ী ক'রে জল দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তা খুব মন্দ ছিল ব'লে বোধ হয় না। খরচও তাতে কম ছিল হয়ত। গরিব গাড়োয়ানরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু কিছু পেত তো।"

পাঁচু বলিল, "তা পাড়াগাঁ যদি শহর হয়, মন্দ কি ? সকলে উন্নতি চায়।"

সুরেন সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "শহর যখন তৈরি হয়—তার ধুলোয়, তার ইট-কাঠে কত গরিবের বুকের রক্ত মিশে থাকে জানিস্? আমরা, যারা কিছু উপায় করি, তাদের আজীবন কাটে শহরে, উন্নতি বলতে শহরের আদর্শই আমাদের মনে পড়ে, তার জাঁকজমক, সুখসুবিধা—"

পাঁচু বলিল, "আজকাল গরুর গাড়ীর যুগ নেই। সকলেই উন্নতি চায়।"

সুরেন বলিল, "চাইবে না কেন? এই ট্যাক্স দিতেই দশবার ঘটিবাটি নিলাম হয়, আরও উপসর্গ বাড়লে তো কথাই নেই। তবে বলতে পার, আমার পয়সা আছে, আমি কেন ওদের সঙ্গে অসুবিধা ভোগ করব? এত কাল কেরোসিনের আলোয় রাস্তা চলতে তোমার ভুল হ'ল না, আজ চাইছ বিজলী বাতি; এত কাল কুয়ো থেকে দড়া দিয়ে জল টেনে তুলেছ হাসি-মুখে, আজ বলছ, হাত ব্যথা করে; যে-পথ অনায়াসে পায়ের সাহায্যে শেষ করেছ, আজ গাড়ী না হ'লে চারদিক অন্ধকার দেখছ। দোষটা তোমার নয় পাঁচু, তোমার সুখসুবিধাবাদী মনের। শহরের কাজল প'রে চোখের দৃষ্টি তোমার আর এক দিকে অনুভূতি-প্রখর হয়েছে—আরামের দিকে।

পাঁচু বলিল, "তোমার জড়বাদী মনের দোষ দিই নে, সুরেন, এই গাঁয়ে অনেক বুড়ো আছেন যাঁরা কিছু পরিবর্ত্তন দেখলেই ক্ষেপে ওঠেন। নূতনের সব মন্দ, আর পুরাতনের সমস্ত ভাল—এই তাঁদের অভিমত। তাঁদের মতটাই তুমি প্রকাশ করছ!"

সুরেন বলিল, "আর আমি যদি বলি, প্রগতিবাদীদের মতে পুরাতনের সব কিছু মন্দ আর নূতনের সব কিছু ভাল, তাহলে তুমি কি উত্তর দেবে? পুরাতনকে ঘৃণাভরে উড়িয়ে দেওয়া বা নূতনকে 'কিছু না' ব'লে পাশ কাটান, দুটোর মধ্যেই যুক্তির জোর যত না থাকুক, বুদ্ধির অহঙ্কার

প্রবল। যে বুদ্ধিতে কল্যাণের অংশ কম, তা সব দিক্ দিয়ে সুফল প্রসব করে না।”

অবনী বলিল, “বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, থাক্ তোমাদের তর্ক। এখন মুখ খুললেই ধুলো খেতে হবে।”

গোপালপুরের মধ্যে সারি সারি কুমোরের বাস। কলসী, নাদা, জালা, ইত্যাদি স্তূপীকৃত উঠানে সাজান রহিয়াছে। পোয়ানের চালাঘরের পাশে রাশীকৃত অড়হর, আস্‌শেওড়ার পালা, কুমোর কাঁচা হাঁড়ি সাজাইয়া পোয়ান ভর্ত্তি করিতেছে। এখানে কোঠা-ঘর কম, থাকিলেও সে ঘরে আড়ম্বর নাই। বড় রাস্তার উপর মাটির দাওয়াযুক্ত চালাঘর—কোনটি সংস্কার অভাবে শ্রীহীন, কোনটির বহু বৎসরের পুরাতন কালো খড় চাপ বাঁধিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, আকাশ হইতে সূর্য্যদেব সেই ছিদ্রপথে গোলাকার রৌদ্ররেখা দিয়া মাটির দাওয়ায় আলিপনা আঁকিয়াছেন। অবস্থা যাহাদের অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহারা নূতন ছাওয়া শ্রী-যুক্ত চালাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাকু টানিতেছে। পঞ্চম দোলের দিন এই পাড়ায় যে অতিকায় গোপালমূর্ত্তির পূজা হয়, দোল আসিবার মাত্র কুড়ি দিন আছে, এখনও সেই অবিসর্জ্জিত সত্যযুগের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। মূর্ত্তির মুখ নাই, হাত-পাও কিছু নাই—শুধু অড়হরের পালা দিয়া বাঁধা কাঠামোটি ও বুকের নীচে খানিকটা মাটি এখনও পথিকের বিস্ময়কে জাগাইয়া রাখিয়াছে! এই মূর্ত্তির পাশ দিয়াই নূতন পুকুরের মধ্যে যাইবার পথ, এবং সেই পথটিই সংক্ষিপ্ত বলিয়া অমিয়রা ব্যবহার করে। আম ও নারিকেল বাগানের মাঝখানে নাতিবৃহৎ একটি পুকুর—কোন্ যুগে প্রথম কাটা হইয়া “নূতন” আখ্যা লাভ করিয়াছিল—আজিও ভাঙা ঘাটের চাতালে শ্যাওলা জমিয়া ও আবাঁধা পাড়ের মাটি ধ্বসিয়া সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ‘নূতন’ নামটি তাহার অক্ষুণ্ণ আছে। পুকুরের সঙ্গে যে

আমগাছ জন্মলাভ করিয়াছিল, যে নারিকেলকুঞ্জ চিক্কণ পত্রে আতপ-তাপে ক্লান্ত পথিকের মনে একই সঙ্গে শ্রান্তি দূর করিত ও সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া দিত—আজ তাহারা কালের স্রোতে বিরল-পত্র ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের বৃক্ষদেহেও জরা পরিস্ফুট! পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘন বেণুকুঞ্জের ছায়াভরা কোলে ভগ্ন ভ্রষ্ট ইষ্টকস্তূপে বিশৃঙ্খল সমাধি-গুলিও পুঞ্জীভূত বালুস্তরের অন্ধকারে দ্রুত ঢাকিয়া যাইতেছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ওটি কি ? বাঁশবনের কট্‌কট্‌ ধ্বনি ও বায়ুর সন্‌সনানির সঙ্গে এ যুগের মানুষ উত্তর দিবে—'জানি না'।

যে-যুগের সমাধি—ঐ সব অতিপুরাতন পাতলা ইষ্টকখণ্ডে খেলাঘরের মত করিয়া সেকালের মানুষ গড়িয়াছিল—সেকালের শোকব্যথাতুর চিত্তে যাহাদের প্রিয়স্মৃতি পলাতক প্রেমে ও ক্ষণস্থায়ী স্নেহে এই বিলাপ-মুখরিত বেণুকুঞ্জের মতই নিয়ত মুখরিত হইয়া উঠিত—যাহারা দীপ জ্বালিয়া, মালা দোলাইয়া, অশ্রু বর্ষণ করিয়া, নীরবে এই নগণ্য সমাধিকে আপন জনের মত ভালবাসিত, ইহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিত, আপনাদের অন্তরস্থিত প্রেম ও স্নেহে সিক্ত করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিত—তাহাদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অনামী সমাধিও মহিমা হারাইয়াছে।

বেণুবনে অহরহ হা-হা স্বরে একই প্রশ্ন বহিয়া যাইতেছে, কে ছিল ইহারা ? কে ছিল ইহারা ?

প্রত্যুত্তরে চিরমৌন কালের ইঙ্গিত উপরে নক্ষত্রপুঞ্জের পানে একবার, নিম্নে স্তূপীভূত বালুরাশির উপর আরবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। সমাধির অগণিত বালু, আকাশের সংখ্যাহীন নক্ষত্র এবং পৃথিবীর অযুত কোটি মানুষকে চিহ্নিত করিয়া রাখা কি এতই সহজ ?

সমাধি ও বাঁশবন পিছনে ফেলিলেই লোকালয়। প্রকৃতি এখানে মানুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বন কাটিয়া যাহারা নানা ভাবে ইষ্টকস্তূপ সাজাইয়াছে, তাহারা নিজের খেয়াল ও নিজের রুচিকেই মাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের বিভিন্নতর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের (?) মধ্যেই সামঞ্জস্যের অভাব। এমন নীচু ছোট ঘর, পর্দ্দা রক্ষার অছিলায় জানালার কার্পণ্য, নেড়া ছাদ এবং বাড়ীর উঠান ঢাকিয়া অতি অখ্যাত আম, কাঁঠাল বা সজিনা গাছ আর কোথাও দেখা যায় না। যাহারা নূতন বড়লোক হইয়াছে—তাহাদের লাল রঙের দ্বিতল দরিদ্র প্রতিবেশীর ইঁট-বার-করা অর্দ্ধভগ্ন বাসগৃহের পাশ দিয়া সোজা উপরে উঠিয়াছে। মোড়ের মাথায় ছোট একটি মুদীখানা; কয়েকটি কাঠের খুপরিতে চাল ডাল ইত্যাদি সাজান; খরিদ্দারের প্রত্যাশায় মুদী নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া আছে। প্রশস্ত রোয়াকে জনকয়েক যুবক ও বৃদ্ধ মিলিয়া দশ-পচিশ খেলিতেছে; নারিকেল-মালার মধ্যে কড়ি পুরিয়া দেওয়াল ঠাসান পিঁড়িটার উপর সবেগে আছড়াইয়া দান ফেলিতেছে এবং ঘুঁটি মার পড়িলে হৈ হৈ শব্দে পাড়া মাতাইয়া তুলিতেছে। মুদী ক্রেতার অভাবে খেলাতেই মনঃসংযোগ করিয়াছে।

রাস্তায় হাঁটু-ভর ধুলা, পথহাঁটার ক্লান্তিও স্বেদসিক্ত ললাটে ফুটিয়াছে; এক পাশে মণ্ডলদের মজা পুকুর ও অন্য পাশে বর্দ্ধিতায়ন মসজিদের সুরম্য চত্বর পিছনে ফেলিয়া তাহারা দ্রুত নূতন হাটের মধ্যে আসিল। কাল রবিবার, হাট বসিবে। আজ শূন্য চালা ক-খানি খাঁ খাঁ করিতেছে। কাল এ-পাশের রাস্তা অসংখ্য বিচালীর গাড়ীতে ভর্ত্তি হইয়া যাইবে, ও-পাশের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ছাগল, মোরগ ও গুড় ইত্যাদিতে ভরিয়া উঠিবে,

মাঝখানে শাকসজী ও মাছের বাজার। জনতা ঠেলিয়া বাজার করাই মুস্কিল ব্যাপার। এত বড় হাট—এই গ্রামে কেন, শহরেও কম আছে। গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু প্রকারের জিনিষ এই হাটে আমদানি হয়। হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল চাষী ছাড়া অসংখ্য গরিব অনাথা শাকসজী বহিয়া আনে। কেহ ঘরের কানাচে যে ওল হইয়াছে তাহার গোটাকতক তুলিয়া, সজিনার ডাঁটা দু-এক বোঝা লইয়া, পথে আসিতে আমবাগান হইতে কিছু আম, কোন গৃহস্থ-বাড়ী হইতে দু-চারটি লেবু—কিছু পেপে, চালের ক্ষুদ, পুকুরের কলমী শাক, ইত্যাদি পাঁচ রকমে ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া বাজারে বেসাতি করিতে আসিবে। দরদস্তুর করিতে ইহারা পরিপক্ক নহে, আর পাঁচ জনের দেখিয়া জিনিষ বেচে এবং একসঙ্গে বেশী জিনিষ বেচিয়া কম পয়সা লইয়া হিসাব ভুল করে।

কোন ভদ্রলোককে দেখিলে সবিনয়ে বলিবে, "হ্যাঁগো ছেলে, এ আনিটা চলবে তো? এক পয়সায় দুটো পেপে হ'লে বারটা পেঁপের দাম কি চার পয়সা হয়? হয় না? ওমা, ঐ মিন্‌সেটা আমায় ঠকিয়েছে তাহলে।"

যাহারা হাট জমা লইয়াছে তাহারা জুলুম করিয়া ইহাদের নিকট হইতে বেশী জিনিষ এবং ভাল জিনিষ আদায় করে। দানদার আসিলেই ইহারা ময়লা, ছেঁড়া আঁচল ঝুড়ির উপর ঢাকিয়া দু-হাত এবং বুক তাহার উপর রাখিয়া মিনতি করে, "ওগো, আজ জিনিষ কম আছে, কম ক'রে নাও।" দানওয়ালা তাহার আঁচল ও হাত সজোরে সরাইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলে, "সর্, মাগী সর্। গেল হাটে বড় ফাঁকি দিয়েছিলি যে! হাটে বস্‌লে দান দিতে হয়, জানিস্ না?"

বিক্রেত্রী ক্রন্দনের স্বরে বলে, "এই তো দু-মুঠো কলমী, তোমার দান দিলে আমার পেট চলবে কিসে?"

কিন্তু সেই দু-মুঠা কলমী শাকের এক-চতুর্থাংশ যখন দানওয়ালা উঠাইয়া লয় তখন ক্রন্দনপরায়ণা গালি দিয়া সান্ত্বনা লাভ করে,—"মর্ হতভাগা মিন্‌সে, যম তোমায় নেয় না !"

হাট পার হইবার সময় সামান্য ও সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র পাঁচ বন্ধুরই মনে জাগিয়া উঠিল। কাল হাট করিতে আসিয়া আরও কত জিনিষের আস্বাদ লাভ করিতে হইবে।

স্কুল ছাড়াইলেই গড়ের বাজার ; এইখানটায় পল্লীর প্রাণস্পন্দন কিছু অনুভূত হয়। অন্ধকার রাত্রিতে পথ এখানে অদৃশ্য হয় না, গভীর রাত্রিতেও কোলাহল এখানে স্তব্ধ হইয়া যায় না। মুদী-দোকানের দরজা বন্ধ হইলেও ময়রা-দোকানের ঝাঁপ খোলা থাকে ; বৃহৎ কড়ায় তাড়ু দিয়া ময়রা রস তৈয়ারী করে ; কখনও বা সন্দেশ-রসগোল্লার খোলা নামায়। পান সিগারেট বিড়ির দোকানে সন্ধ্যাবেলাতেই ভিড় জমে বেশী, দরজীর দোকান অল্প রাত্রিতেই বন্ধ হইয়া যায়। চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দলে দলে গোয়ালা আসে ছানা বিক্রয় করিতে। সন্ধ্যামুখে ছানা বেচা শেষ করিয়া, মুদীখানায় জিনিষ কিনিয়া, ময়রা-দোকানে কিছু জলযোগ করিয়া কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আট-দশ জনে গল্প করিতে করিতে চার-পাঁচ ক্রোশের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

সন্ধ্যা এখনও হয় নাই, ময়রা ও গোয়ালার দাম ও ওজন লইয়া বচসাও বাধে নাই, বিড়ির দোকানে অস্ফুট গানের কলি এবং দরজির দোকানে মেশিনের খটাখট্ শব্দ শুধু বাজারের সম্মান বজায় রাখিতেছে।

বাজারের মোড়ে আসিয়া পাঁচ বন্ধু বিভিন্ন রাস্তা ধরিল। কেহ গেল বিশ্বাসপাড়ার রাস্তায়, কেহ তামলীপাড়ায়, কেহ মুনসীপাড়ায়, কেহ বা ছুতারপাড়ায়। ছুতারপাড়া ছাড়াইয়া অমিয় যাইবে দক্ষিণপাড়ায়—পল্লীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে। কিন্তু পরিচয় আরম্ভ হইল

গড়ের বাজারের মোড় হইতে। বিড়ি-দোকানের সম্মুখে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া রোহিণী দাস কেরোসিন তৈল ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিক্রয় করিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভাল তো? অনেক দিন পরে—"

অমিয় হাসিমুখে বলিল, "ভাল। তোমার খবর সব ভাল তো, দাদা!"

জিজ্ঞাসার সঙ্গে অমিয় অনেকখানি পথ অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং রোহিণী দাস সে-কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া কেরোসিন তৈল বিক্রয়ের পরমুহূর্তেই ছোট্ট জলের ঘটিটি কাং করিয়া একটু হাত ভিজাইয়া লইয়াই হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্র স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ষোল বার দাস্ত হয়েছে? গা বমি-বমি আছে? আচ্ছা, পয়সা একটা আর শিশি।"

ছুতারপাড়ায় দেখা কুঞ্জ দাসের সঙ্গে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়া সে তখন গরুর গাড়ীর চাকা তৈয়ারী করিতেছে। হাতের বাটালি ও মুগুর মাটিতে রাখিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া সে বলিল, "ভাল তো ঠাকুর? প্রণাম।"

অমিয় দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "ভাল, তুমি ভাল তো?"

কুঞ্জ বলিল, "আর ভাল, জ্বর, রক্ত-আমাশা—"

অমিয় ততক্ষণে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, কুঞ্জ বাটালি তুলিয়া মুগুরের ঘা লাগাইতে লাগাইতে আপন মনেই বলিল, "ঠাকুরের চাকরি হয়েছে বোধ হয়।"

বাড়ীর কাছে আসিয়া মন বড় চঞ্চল হইতেছে অমিয়র। কতক্ষণে মোড় ফিরিতেই উঠানের আমগাছটি তাহার নজরে পড়িবে, বৈশাখে যে গাছের আম পাকে, এখন নিশ্চয়ই বড় বড় গুটি হইয়াছে। মা হয়তো

দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর এক জন ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া পথের পানে চোখ-কান পাতিয়া রাখিয়াছে। রবি গরুটা এখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। বর্ষাকালে যে বেলফুলের চারাগুলি সে পুঁতিয়াছিল সেগুলিতে কি কুঁড়ি ধরিয়াছে? রোয়াকের ধারে হাস্নুহানার গাছটি যদি আজ রাত্রিতে ফোটা ফুলের গন্ধে ঘর মাতাইয়া দেয়। এক-পাটি টগরের সাদা মালা গাঁথিয়া কেহ কি চৌকির উপর রাখিতে ভুল করিবে?

দরজার গোড়ায় মা দাঁড়াইয়া ছিলেন।

অমিয় তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা নামাইল। ষ্টেশন হইতে বাড়ী সার্দ্ধ দু-মাইল পথ; দুধারে তার যত কিছু সৌন্দর্য্য, যত কিছু প্রশ্ন, যত কিছু আশা ও আনন্দ—সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়া প্রণামে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নির্ব্বাক্ আনন্দে মা কোন প্রশ্ন করিলেন না ছেলেকে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, ছেলেও অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া মায়ের মহিমা হ্রাস করিল না।

অমিয়দের বাড়ী খুব প্রকাণ্ড নহে, বনিয়াদীও বলা চলে না; যদিও খুব পুরাতন সেকালের পাতলা ইঁট-কাদার গাঁথুনিতে তোলা নাতি উচ্চ তিন খানি ঘর, পিছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটিও জানালা নাই, দক্ষিণমুখী বলিয়া ঘরে আলো হাওয়ার অপ্রতুলতা হয় না। ঘরের সামনে হাত দুই চওড়া রোয়াক আছে; বারান্দা নাই। রোয়াক এবং ঘরের মেঝেতে খোয়া উঠিয়াছে। সুরকির মেঝে—শত বর্ষের উপর হইল কত মানুষের পদাঘাত ও পীড়ন সহিয়া শ্রী হারাইয়াছে। জানালায় কাঠের চৌকা গরাদে, কপাটগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে, শীতের দিনে চটের পর্দ্দা না টাঙাইয়া দিলে হিম নিবারণ হয় না। দু-বার কপাট বদলান হইয়াছে বলিয়া দুয়ারের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল; কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও বালির জমাট নাই।

আলকাতরামাখান আড়া-বরগাগুলি উইয়ে খাইয়া ফেলিয়াছে, কোথাও ন্যাকড়া গুঁজিয়া, কোথাও বা নূতন বরগা ঠেকা দিয়া ঘরের ছাদটিকে অনিবার্য্য পতন হইতে রক্ষা করা হইতেছে। ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য পেরেক পোঁতা; কোথাও পুরাতন ক্যালেণ্ডারের বিবর্ণ ছবি, কোথাও চন্দনযাত্রা, দশহরা, প্রভৃতির মেলায় কেনা রামরাজা, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালীর পোকায়-কাটা ছবি টাঙান আছে। কড়ি হইতে নারিকেল-কাতার দড়ি দিয়া বাধা বাঁশের আলনা ঝুলিতেছে। বিছানা এবং কাপড়ে সেটি কড়ি স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে। তাছাড়া ঘরে পুরাতন তক্তাপোষখানি পাতা আছে, ডবল টিনের ট্রাঙ্ক, কাঠের সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতিও বর্ত্তমান। তক্তাপোষের তলায় কিছু আলু কেনা রহিয়াছে; তাহার পাশে কয়েকটি গঙ্গাজল পরিপূর্ণ ঘড়া, এবং ঠাকুর-পূজায় ব্যবহৃত পিতলের থালা বাসন ছোট একখানি জলচৌকির উপর সাজান রহিয়াছে। দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট হইলেও এটি যে ভক্তিমান বাঙালীর সংসার তাহার পরিচয় সর্ব্বত্র লেখা রহিয়াছে।

মা ভাঁড়ার-ঘরে ছেলের জন্য জলখাবার সাজাইতে গেলেন। ছেলে বিশ্রাম না করিয়া রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"হ্যাঁ মা, এবার গাছে আম হয় নি তো? কুয়ো হয়ে সব বোল পুড়ে গেছে বুঝি? পাতিলেবু গাছটায় ফুল ধরেছে? সত্যি?" বলিয়া এক লাফে রোয়াক হইতে নামিয়া কুয়োতলায় গিয়া দাঁড়াইল। মা জলখাবার গুছান শেষ করিয়া অমিয়র পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অমিয় ফুল গুনিতে লাগিল, "একটা, দুটো, তিনটে,...কুড়ি পঁচিশটার বেশী লেবু এবার হবে না। কিন্তু একটা ভুল হয়েছে, মা। গাছটা আর একটু সরিয়ে পুঁতলে কুয়োটা অন্ধকার হ'ত না।"

মা বলিলেন, "বাঁশ দিয়ে বেঁধে দিলেই হবে। দেখেছিস এবার কাঁঠালের ফলন ?"

অমিয় খুশীভরা কণ্ঠে কহিল, "বাঃ রে, মাটি ফুঁড়ে এঁচড় বেরিয়েছে যে! গাছের আর কোথাও বাকী নেই, কতগুলো হবে ?"

মা খুশীভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আমি গুনলাম দেড়শ, বৌমা বলে—একশ ষাট।"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা, আমি গুনছি—"

মা বাধা দিয়া বলিলেন, "তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে নে, অমু।"

অমিয় অবাধ্য ছেলের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আগে কাঁঠাল গুনি—এক, দুই, তিন,…"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলামি দেখ!"

অমিয় হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে গণনা-কার্য্য শেষ করিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই হেরে গেছ মা, এক-শ পঞ্চান্নটা হ'ল।"

মা বলিলেন, "আয়, খাবি আয়।"

অমিয় সজিনা গাছের পানে চাহিয়া বলিল, "এবার ডাঁটা হবে মন্দ নয়। কতকাল যে খাই নি ডাঁটা-চচ্চড়ি, কাল রাঁধবে তো মা ?"

"রাঁধব। পেড়ে দেবার লোক অভাবে আজ রাঁধতে পারি নি।"

"পেড়ে দেবার লোক নেই ? বাঃ রে, দাও তো দাখানা। চট ক'রে দুটো ডাল কেটে দি।"

"কি পাগল, দেখ। ভরসন্ধ্যেবেলায় উঠবেন গাছে! কাল সকালে হবে। আয় খাবি আয়।"

অমিয় বলিল, "গাছে ডুমুর হয়েছে তো ? কাল ডুমুরের ডালনা রেঁধ, মা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই আয়।"

"রবি বুঝি এখনও মাঠ থেকে ফেরে নি?"

"সন্ধ্যে উৎরে গেলে ফিরবে। এবার তার কি বাছুর হয়েছে বল দেখি?"

"নিশ্চয়ই নই বাছুর।"

মা হাসিলেন।

"ক-সের ক'রে দুধ দিচ্ছে?"

"দুধ এক টানে দু-সের দেয়।"

"ঘি করেছ ঘরে? কাল তাহলে এক গ্লাস ঘোল খাব কিন্তু।"

"তা খাস্। এখন কিছু জল খাবি আয়।"

মা জলখাবার সাজাইয়া সম্মুখে বসিলেন। অমিয় খাইতে খাইতে গল্প জুড়িয়া দিল।

"বেল কোথায় পেলে মা? পেঁপে, গাছের বুঝি? এই যে দুধের ক্ষীরও করেছ? আচ্ছা মা, তুমি কি ক'রে জানলে আজ আমি বাড়ী আসব—তাই এত সব জোগাড় করেছ।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "ক'শনিবার থেকেই মনে হচ্ছে তুই আসবি। আজ হাত থেকে জলের ঘটি পড়ে গেল, চাকা পাখীও ডেকে গেল। আমি বৌমাকে বললাম, 'আজ অমু নিশ্চয়ই বাড়ী আসবে।' তো ও হেসেই খুন। বলে, 'মা আপনি ক'টা শনিবারই, আসবেন-আসবেন করছেন, উনি কিন্তু আসছেন না।' গেল বারে হাত থেকে ঘটি পড়েছিল কিন্তু পাখী ডাকেনি। এতখানি ক্ষীর তৈরি করে শেষে মনো ঠাকুরকে দিয়ে আসি!"

"তোমরা খেয়ে ফেললে না কেন?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মুখের আশার জিনিষ খাব আমরা! শোন অনাছিষ্টি কথা। বামুনকে দিয়ে দিলাম—তবু সার্থক হ'ল।"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা মা, ছেলের মুখের জিনিষ বামুনকে দিয়ে খুব তৃপ্তি পেলে ?"

মা বলিলেন, "দেবতা-বামুনকে দেওয়ায় পুণ্যি হয়, একথা মানিস তো ?"

অমিয় বলিল, "তাই বল ! যেমন আশায় বঞ্চিত হলে অমনি পুণ্য-সঞ্চয়ের নেশা চাপল ! কোন্‌টা বেশী মা ? স্নেহটা, না পুণ্যটা ?"

মা কৃত্রিম রোষে মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "জানি না।"

"আহা, রসগোল্লাটা খেয়ে নে, ও-বাড়ীর সরসী তুই খাবি ব'লে দিয়ে গেছে।"

"সরসীদিরও কি পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা চেপেছে মা ?"

"পাড়াপড়শীরা এমন দেয়। তোদের কালে কি হবে জানিনে, আমাদের সময়ে যখন নূতন বউ হয়ে এই ভিটেয় এলাম, তখন পনর দিন ধরে বাড়ীতে পাত পাতি নি, জানিস ?"

"বল কি মা, পনর দিন ধরে তুমি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়িয়েছিলে ? তোমাদের কাল নিশ্চয়ই সত্যযুগের কাছাকাছি ছিল ?"

"রসগোল্লাটা খেলি যদি, নারকোল-নাড়ুটা রাখলি কেন ? ওটা—"

"বুঝেছি, বুঝেছি, ওটা আর এক জন পুণ্যপ্রয়াসী মহিলার দান।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোদের শহরে বুঝি সাধু ভাষায় সব কথা কয় ?"

অমিয় বলিল, "কেন, মিষ্টি নয় এ ভাষা ? না, বুঝতে পার না ?"

মা নিরুত্তরে অমিয়কে আর এক গ্লাস জল ঢালিয়া দিয়া উদ্দেশে বলিলেন, "শাঁখটা বাজিয়ে সন্ধ্যেটা দেখাও, বৌমা। তার আগে দুয়োরে গঙ্গাজল দিও।"

মুখ-হাত ধুইয়া অমিয় তক্তাপোষের উপর বসিতেই মা আসিয়া

হাসিমুখে বলিলেন, "দে দেখি গোটা চারেক টাকা—ঠাকুর-দেবতার নামে মানত করেছি। আসছে মঙ্গলবার বাক্‌দেবী তলায় যাব, ষোল আনা পূজো মানত করেছি।"

অমিয় বলিল, "বাক্‌দেবী তলায় পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবে তো?"

মা বলিলেন, "না, মায়ের পূজোয় বলিদান আমি ভালবাসি না।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি মা—আমরা তো বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক নই।"

"যে-মন্ত্রেরই উপাসক হই না কেন—ছাগল-বলির মানত আমি কোন দিন করি নি।"

অমিয় বলিল, "শুধুই বাক্‌দেবীর পূজো দেবে?"

মা বলিলেন, "তা কেন। গড়ের বাজারের সিদ্ধেশ্বরী আছেন, তাঁর কাছে একদিন পালুনি করব, সত্যনারায়ণের পুরো সিন্নি দেব—"

অমিয় বলিল, "পালুনি কি মা?"

মা বলিলেন, "সমস্ত দিন উপোস করে ঠাকুরের পূজো দিয়ে তাঁর মন্দিরে বসে চালভাজার ফলার খাব।"

অমিয় বলিল, "আর দশ-বার দিন পরে বাক্‌দেবীতলায় যেও, এখন আমার হাতে টাকা তো নেই।"

মা বলিলেন, "তখন অন্ধকার পড়বে; শুক্লপক্ষ না হ'লে যাওয়া হবে না। কিন্তু টাকা নেই কেন?"

অমিয় বলিল, "এই তো সবে পাঁচ-ছ দিন হল আপিসে ঢুকেছি, মাইনে পেতে দেরী আছে।"

"তাই বল,—আমি এটা ওটা কত কি কিনব মনে করে রেখেছি যে।"

অমিয় বলিল, "আমার যদি চাকরি না হ'ত, তা হলে এটা ওটা কিনতে কি দিয়ে ?"

মা বলিলেন, "না হওয়ার কথা পরে—হ'লেই লোকে আশা করে। এই যে সেদিন ভোঁদার মা এসে বললে, 'ঠাকুরঝি, তোমার অমিয়র চাকরি হ'লে বৌয়ের হাতে দু-গাছা রুলি গড়িয়ে দিও—অমন গোলগাল হাত খালি খালি কেমন দেখায়।"

অমিয় বলিল, "এই ভাঙা ঘরে রুলি হাতে দিয়ে ঘোরাফেরা করলে কেমন দেখাবে মা ?"

মা কৃত্রিম কোপকটাক্ষে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাঙা ঘর কি কারও চিরকাল থাকে। ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন তখন সবই হবে।"

অমিয় অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি নিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মা তাহার পরিবর্ত্তিত মুখভাব দেখিতে পাইলেন না।

সহসা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাই, রান্না চড়াবার উদ্যোগ করিগে। ভাত খাবি না, রুটি ?"

অমিয় বলিল, "রুটি আমি কোন কালে খাই ?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "না, তাই জিজ্ঞেস করছি। কলকাতায় এক বেলা রুটি খাওয়া নাকি রেওয়াজ। ভোদার মা বলে—ভোঁদা বাড়ী এলে ভাত দেখলে জ্বলে যায়।"

অমিয় বলিল, "ভোঁদা নিশ্চয়ই বেরিবেরিতে ভুগছে।"

মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "বেরিবেরি কি ?"

অমিয় বলিল, "সে তুমি বুঝবে না, রাজসিক নূতন রোগ একটা। ভেতো বাঙালীর বদনামটা ওই রোগের দ্বারাই কাটবে।"

অমিয় চটি পায়ে দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দুয়ারের কাছে অবগুণ্ঠিতার মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, "এখনি বেরুচ্ছ ? দাঁড়াও।" বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে অমিয়র পায়ের তলায় নতজানু হইল।

অমিয় হাসিয়া চটিজুতা খুলিয়া তক্তাপোষের উপর গিয়া বসিল, এবং বলিল, "অনেক দিন পরে বড্ড নতুন হয়ে এসেছি, নয় ?"

"নূতনই তো", বলিয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অমিয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আশার পানে চাহিল। সঙ্কোচে ও লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গে তাহার নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। কাপড়খানি সে ফর্সাই পরিয়াছে, পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়াছে ও কপালে খয়েরের টিপ দিয়াছে। চুল বাঁধার ফ্যাশানটি নবতর না হইলেও সুষ্ঠু রীতি লক্ষ্য করা যায়। পরিপূর্ণ আলোকে এই শ্যামলা মেয়েটিকে হয়তো সুশ্রী বলিতেও বাধিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে, ম্লান প্রদীপশিখার নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র এই ভগ্ন গৃহের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্যের একটি প্রফুল্ল প্রকাশ, চক্ষু এবং মনকে একই সঙ্গে অভিভূত করে বইকি! সূর্য্যকরোজ্জ্বলদীপ্ত আকাশের সৌন্দর্য্য ও মেঘলা দিনের মাধুর্য্য দুই-ই মন ভোলানর খেলা জানে।

অমিয়কে নিরুত্তরে চাহিতে দেখিয়া আশা মৃদুস্বরে বলিল, "কি দেখছ অবাক হয়ে ?"

অমিয় বলিল, "দেখছি তোমায়।"

আশার কর্ণমূলে এক ঝলক রক্ত জমিল, মুখ নামাইয়া সে বলিল, "যাও, দুষ্টুমি করবার আর জায়গা পেলে না!"

অমিয় চৌকি হইতে উঠিয়া আশার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "সত্যি,

জায়গা কোথাও পাই নি।” বলিয়া আশার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া লইল। আশা নিরাপত্তিতে হাতখানি অমিয়র হাতে তুলিয়া দিল।

অমিয়র তরুণ চিত্তে অলক্ষ্যে ঈষৎ অতৃপ্তির ছায়াপাত হইল। আশার মধ্যে চাঞ্চল্য কই? সে হাত ধরিবার কালে দূরে সরিয়া গেল না কেন? এতদিন পরে দেখা—লীলাকৌতুকে যে-দেখার তৃষ্ণা স্পর্শের বারিবিন্দু না পাওয়া পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেই সে দেখার সৌন্দর্য্যকে আশা রূপ দিতে কার্পণ্য করিল কেন? অত্যন্ত সহজ হইয়া অত্যন্ত সুকোমল বৃত্তিকে আশা অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দিল।

চুপ করিয়া থাকা অশোভন বলিয়া অমিয় তক্তাপোষের উপর বসিয়া আশার হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, “সত্যি, সোনা না হ’লে এ-হাত মানায় না।”

আশা কৌতুকভরা কটাক্ষে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল “এবার চাকরি হয়েছে, এ-হাতে সোনা না ওঠার দুঃখু আর থাকবে না।”

আবার আশার অজ্ঞাতে অমিয় বুকের মধ্যে নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

চাকরি যেন সুন্দর একটি চাঁদিনী রাত্রি; যে-রাত্রিতে কঠিন বাস্তব নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া সুন্দর স্বপ্নের জাল বোনা চলিতেছে! অমিয়কে মা এবং আশা এই স্বপ্নময় রাত্রির কথাই বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কলিকাতার কথা এখন থাকুক, নূতন আনন্দের বন্যায় বিষাদের বালুস্তূপ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে—বন্যার জলে গা ভাসাইয়া দেওয়া মন্দ কি!

অমিয় বলিল, “নিশ্চয়ই দুঃখমোচন হবে বইকি। তবে কিছু বিলম্বে।” বলিয়া আশাকে আকর্ষণ করিয়া বক্ষোলগ্ন করিল।

আশা অতি আনন্দে চক্ষু মুদিয়া বলিল, “কত মাইনে হ’ল?”

অমিয় বলিল, "শুনলে তুমি সোনার স্বপ্ন হয়তো দেখবে না।"

বক্ষোলগ্ন মুখ উত্তোলন করিয়া আশা চক্ষু চাহিয়া বলিল, "সোনার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর আমার কাজ নেই বুঝি ?"

অমিয় বলিল, "কাজ আবার নেই ! ঘর ঝাঁট, বাসন মাজা, গোয়াল পরিষ্কার—"

আশা অমিয়র হাত ছাড়াইবার প্রয়াসে কহিল, "ছাড়, ছাড়, আর ঠাট্টায় কাজ নেই।"

অমিয় এতক্ষণে যেন হারানো সৌন্দর্য্যকে ফিরিয়া পাইল। আশার ছুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাহার মুখের অতি সন্নিকটে মুখ নামাইয়া আনিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে তুমি জোরে পার ?"

আশা উত্তর না দিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিল। এই মুহূর্ত্তকে প্রাণবান করিয়া তুলিতে একমাত্র নীরব থাকা ছাড়া অভিধানের কোন প্রিয় সম্বোধন বা বচন-বিন্যাসের কোন সুষ্ঠু রীতি আশার জানা নাই।

৮

পুরাতন অমিয় নূতন হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীর কৌতূহলের অন্ত নাই। শিক্ষিতের মর্য্যাদা উপার্জ্জনের সঙ্গে শতগুণ বৃদ্ধি পায়। অমিয় সম্বন্ধে ইহাদের কৌতূহল যে এতদিন পরে সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একমাত্র হেতু কমলার আশীর্ব্বাদ সে লাভ করিয়াছে। গরিবের ঘরে শুধু শিক্ষার জন্য কে কবে উচ্চ ডিগ্রি আহরণের চেষ্টায় প্রাণপণ করিয়াছে ! ডিগ্রীর আঁকশি দিয়া চাকুরী-রূপ

চাঁদকে যদি আয়ত্ত করা না গেল তো কিসের গৌরব এত শিক্ষার? অমিয়র শিক্ষালাভ আজ সার্থক!

জ্ঞানবাবুর পিসী বলিলেন, "খাসা ছেলে অমিয়; দিব্যি একটি চাকরি পেলে। আমাদের হরিটা দেখ না, খদ্দর পরে হৈহৈ করে বেড়াচ্ছে।"

বোসেদের সুলোচনা বলিলেন, "আজকাল যে জেলখাটার হুজুক হয়েছে কিনা, ওরা স্বদেশী করছে।"

পিসী বলিলেন, "পোড়া কপাল! পেটে জোটে না ভাত, স্বদেশ? অত বড় ধাড়ী ছেলে বাপ-মার দুঃখু একটু বোঝে না গা?"

সুলোচনা বলিলেন, "তা অমিয়কে ব'লে একটা হিল্লে লাগিয়ে দাও। পাস তো দিয়েছে একটা।"

অমিয় হাসিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। নদীতে ভাসিতে ভাসিতে কূলের কাছাকাছি আসিয়াছে সে। জানে না কূলে উঠিতে পারিবে কি না? কিনারায় চোরাবালিও থাকিতে পারে, কর্দ্দম থাকাও বিচিত্র নহে। উঠিবার কালে উঁচু পাড় যদি ধ্বসিয়া পড়ে?

তাই আশাকে ডাকিয়া শুইবার সময় সে বলিল, "আমার চাকরি হওয়াতে তোমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, নয়?"

আশা বলিল, "আনন্দ হওয়াটা কি খুবই আশ্চর্য্য ভাব?"

অমিয় বলিল, "চাকরি না থাকার এক চিন্তা, আর থাকার কত রকম চিন্তা জান?"

আশা বলিল, "চাকরি করি নি তো, জানব কোত্থেকে।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের ঠাকুরদেবতা, তোমাদের বাড়ীঘর, তোমাদের আসবাবপত্র, সোনারূপোর চাহিদা যদি না মেটাতে পারলাম তো কিসের চাকরি!"

আশা উত্তর দিল না।

অমিয় বলিতে লাগিল, "চাকরি মানেই জীবনের যত রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে সবগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা। শুধু জল খেলে যার তৃষ্ণা মেটে, চাকরি হ'লে তার বাড়ীতে চলবে চা। আলুভাতে হ'লে যার তৃপ্তি হয়, চাকরির কল্যাণে তার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খেয়েও মুখের অরুচি সারে না। তোমার প্লেন লাল পাড় শাড়ী কি—আয় বাড়লে—ব্লাউজ না হ'লে মানাবে? নেমন্তন্ন-বাড়ীতে গিয়ে তুমি খুঁটিয়ে গহনার আলোচনা করবে যদি গহনা গড়াবার ক্ষমতা তোমার থাকে; না হ'লে, হাতের শাঁখা মাথায় ঠেকিয়ে পরম পতিব্রতার অভিনয় তোমায় করতে হবে। আরে ও কি, চোখে জল কেন?"

আশা বালিশে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমিয় তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "দেখ একবার কাণ্ড। আমি সাধারণ নিয়মের কথা বলছি, তুমি কাঁদ কেন?"

আশা জোর করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, অমিয় চেষ্টা করিয়াও সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিতে পারিল না।

অতঃপর সে আশার পিঠের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, "পাগল দেখ, ভাল কথাই বললাম দেখ তো। কোথায় নূতন চাকরি হয়েছে, তোমার জন্য আনব উপহার, তার বদলে কথার আঘাত দিয়ে বার করলাম তোমার চোখের জল।"

আশা মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "চোখের জল বার করতে ভালবাস ব'লেই হয়তো তা বার করেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কবে, হাতের শাঁখা মাথায় ঠেকিয়ে তোমাদের কাছে পতিব্রতার অভিনয় করেছি?"

অমিয় বলিল, "তুমি কর নি বটে।"

"তবে বললে কেন ও-কথা ? আমরা হয়তো অসার, খেলো, ছেলেমানুষিও আমাদের অনেক দিক দিয়ে দেখতে পাও, কিন্তু আঁতের জিনিষ নিয়ে ঠাট্টা করা আমরা সইতে পারি না।"

অমিয় বলিল, "তুমি এতটা ব্যথা পাবে জানলে বলতাম না।"

আশা বলিল, "কিসে আমাদের ব্যথা তোমরা যে বুঝতে চাও না। তোমরা ভাব স্বামীকে সব মেয়েই উপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ মনে করে ? ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ও তো বাইরের বিলাস, ওর সঙ্গে মনের সম্পর্ক কতটুকু।" একটু থামিয়া বলিল, "এতদিন যে তোমার উপার্জ্জন ছিল না, কোন দিন নিজের কোন অভাবকে বড় ক'রে দেখেছি, না তোমায় জানিয়েছি কোন কথা ? তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখকে কেউ তো আলাদা ক'রে ভাবতে শেখায় নি কোনদিন ?"

অমিয় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তবু লোকে বলে বিবাহ করা পাপ ? নাই থাকল উপার্জ্জন, বিনা চেষ্টায় এমন ধারা স্বর্গ লাভ করতে পায় যারা তাদের সঙ্গে কোন্ জাতের তুলনা ! আশা, শোন তবে একটা সত্য কথা, এতক্ষণ যা চেপে রেখেছি—মার আনন্দ দেখে, তোমার আনন্দ দেখে, পাড়াপড়শীর আনন্দ দেখে এতক্ষণে যা মুখ ফুটে বলতে সাহস করি নি, এই চাকরি, এর গুরুভার যদি চিরকাল বইতে না পারি ?"

আশা বিস্মিত নয়নে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "ও-কথা বলছ কেন ?"

"কেন বলছি, চাকরির ক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ ব'লে আমার মনে হচ্ছে। বদ্ধ ঘরের মধ্যে পাখী কতক্ষণ উড়তে পারে, সামনে যদি তার জানালা দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায় ? যদিও সে জানে, আকাশের কাঠফাটা রোদ আছে, ঝড়জলের দুর্য্যোগ আছে, মানুষের গুলিও তার মৃত্যু ঘটাতে

পারে, তবু শুধু নির্ব্বিঘ্নে বেঁচে থাকবার জন্যই কি সে ঘরের বাইরে পাখা মেলবে না ?”

আশা এত কথা বুঝিল না। শুধু বুঝিল, অমিয় যে কোন কারণে হউক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। আপিসের ব্যবহার কিংবা অন্য কোন ঘটনার মূলে তার এই উত্তেজনা। চাকরি পাইবার জন্য যে শত প্রকারের অসুবিধা ও অপমান ভোগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, কঠিন প্রতিযোগিতায় চাকরি পাইয়াই তাহার এ অনুশোচনা কেন ?

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, “তুমিই তো বলতে, যে উপায় করতে পারে না, তার বেঁচে থাকা মিথ্যে।”

“এখনও বলি সে-কথা। কিন্তু সে কি এই রকম দাস্যবৃত্তি ক’রে বেঁচে থাকা ?”

“চাকরি মানেই তো দাস্যবৃত্তি। সংসারে বিনা দাস্যবৃত্তিতে কার দিন চলে ?”

“দাস্যবৃত্তির চরম শাস্তি কোথায় জান ? যেখানে নিজের বিদ্যাকে, বুদ্ধিকে, বিবেককে বলিদান দিতে হয়।”

আশা হাসিয়া বলিল, “এই কথা ! তুমিই না একদিন বলতে চাকরি না পেলে কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন নেব না। দরিদ্র যারা, তাদের মস্তবড় একটা দোষ এই যে মান-অপমানের মানদণ্ড তাদের বড় বেশী তুলতে থাকে। কেউ ঠাট্টা করে দু-কথা বললে মনে হবে—ঘেন্না করে বলছে। কানাকে কানা বললে কানার যেমন রাগ হয়। চাকরি নিয়ে তোমার বুদ্ধি-বিবেককে এতটা সজাগ নাই বা করলে ?”

অমিয় চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলিল, “তবে কি করব ?”

আশা হাসিয়া বলিল, "যেন আমি অনেক কাল ধরে আপিসে চাকরি করেছি তাই তোমায় উপদেশ দেব।"

অমিয় বলিল, "আপিসের কথা নয়, সাধারণ কথায় বল। তুমি হ'লে কি করতে?"

আশা বলিল, "আমাদের আপিস এই সংসার। এর কথাই বলি। যে-কথা আমার সম্পর্কে নয় তা নিয়ে মাথা ঘামান আমার সয় না। যে-কথায় আমায় খোঁচা দেওয়া হয়, তার সম্বন্ধেও বেশী আলোচনা আমার মন করে না। কথার শক্তি কতটুকু? যদি গা পেতে নেওয়া যায় মনকে তা সর্ব্বক্ষণই পুড়িয়ে মারে। যদি গ্রাহ্য না কর—"

অমিয় বলিল, "তাহ'লে তা হবে বালির গাদায় বোমা ফেলার মত। ঠিক বলেছ আশা। কিন্তু পাঁচ জনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখকে যদি না জড়াতে পারলাম—"

আশা হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "পাঁচ দিন কাজ ক'রে তুমি পাঁচ জনের সুখ-দুঃখকে নিজের ক'রে নিয়েছ—এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"তবে আমার নিজের জন্যই কি এ দুঃখবোধ?"

"হ'তে পারে তুমি চাকরির ক্ষেত্রে যা চেয়েছিলে তা হয়তো পাও নি, তাই দুঃখ হয়েছে।"

এই কথায় অমিয় আর একবার ভাবিতে বসিল।

আশা বলিল, "যা আমরা আশা করি, তা পাই নে ব'লেই তো যত দুঃখ কপালে জোটে। আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনি, রাঙা বর হবে, রাজার রাণী হব, গাড়ী-পাল্কী চড়ব—এমনি কত কি আজগুবি কথা।"

অমিয় বলিল, "অথচ তা আমাদের ভাগ্যে হয় না, কেন বল তো?"

আশা বলিল, "বাবার কথাতেই বলি। মাকে প্রায়ই বলতেন, 'ইস্কুল-মাষ্টারের মেয়েকে তুমি রাজরাণী হবার লোভ দেখাও কেন? সত্যই কি ও তাই হবে?' মা রাগ ক'রে বলতেন, 'ওর কপালে থাকলে নিশ্চয়ই ও রাজরাণী হবে। তোমার মত ছেলেবেলা থেকে "হা-ভাতের" মন্ত্র শেখাতে আমার লজ্জা করে।' বাবা হেসে বলতেন, 'লজ্জা তোমার করে না, সত্য কথা শোনবার সাহস তোমার নেই। আসলে তোমার মন যা চায়, যা পায় নি, তারই বিষ তুমি মেয়ের কানে ঢালছ।' মা রাগ ক'রে কথা বন্ধ করতেন। বাবা আমার পানে চেয়ে ম্লান হেসে বলতেন, 'সত্যিকার অবস্থা জেনে রাখা ভাল, খুকী। তুই রাঙা বর হয়তো পেতে পারিস, কিন্তু রাজ্যপাট, গাড়ীঘোড়া, এসব তোর জন্য নয়। যারা রূপোর চামচে মুখে করে জন্মেছে তাদের মা-বাপ তাদের মেয়ে-ছেলেকে ও রকম অসম্ভব কথা বলে না। তারা নিশ্চয় ক'রে জানে যে তারা তা পাবেই, সুতরাং তাদের সে প্রলোভন দেখাতে হয় না। তোদের মাষ্টার বাপ বড় জোর কেরানী বর দিতে পারে, রাজ্যপাটের আশা ভুলে যা।"

অমিয় বলিল, "তোমার বাবার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি। কেরানী বরই তোমার ভাগ্যে জুটেছে, কিন্তু রাঙা বর জোটে নি।"

আশা হাসিয়া বলিল, "যদি বলি আমার মনের রঙে তাকে রাঙিয়ে নিয়েছি।"

অমিয় তাহার গালে একটি টোকা মারিয়া বলিল, "সে তো তোমার মনের কথা, চোখের কথা নয়।"

আশা বলিল, "আবার তোমার ভুল হ'ল। মন যা দেখায় চোখ তো তাই দেখে। না হ'লে আমার মত কুৎসিতের সঙ্গে কথা বলতেও তোমার বাধত।"

অমিয় বলিল, "তুমি যে এত কথা জান তা তো চাকরি হবার আগে বুঝতে পারি নি!"

"জান না, আমি মাষ্টারের মেয়ে। কথার চোটে তোমায় এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারি।"

অমিয় বলিল, "আমাদের কেনাবেচা অনেক দিন সাঙ্গ হয়েছে, এবং আমার মনে হয় তাতে ঠকি নি।"

অমিয়র বুকে মুখ লুকাইয়া আশা শুধু বলিল, "আবার।"

ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রি। রোয়াকের ধারে হাস্নুহানার ঝাড়টি ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে—ভাঙা ঘর সে গন্ধে উতলা। স্বর্গ যদি আজ পৃথিবীর কোথাও নামিয়া থাকে তো এই ঘরে, এবং দীর্ঘদিন প্রবাসী প্রিয়তমের বুকের সন্নিকটে মুখ লুকাইয়া সেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারে শুধু তার প্রিয়া। উতলা ফাল্গুন রাত্রিতে আম্রশাখায় কোকিল ডাকুক, আর 'চোখ গেল' বলিয়া পাপিয়া-বধূ চীৎকারই জানাক, সে-সুর বুক দিয়া গ্রহণ করিবার সাহস কাহার আছে? ফাল্গুনের হিমকে যাহারা ভয় করে তাহারা জরাগ্রস্ত দেহ-মন লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া এমন পৃথিবী-ভাসানো জ্যোৎস্নাকে নির্ব্বাসন দিয়াছে, যাহারা ভয় করে না,—তাহাদের কবির চোখ নাই, নিত্যনিয়মিত নিদ্রার অঙ্কে মাথা রাখিয়া জানালা খুলিয়াই এমন স্বর্গকে ভুলিয়া গেল! নিত্য মিলন-রজনী যাপন যাহাদের তরুণ মনে পরম সম্পদের কথাই জাগাইয়া দেয় তাহারাও কি এই বিশেষ একটি রজনীকে, এই জ্যোৎস্নার বিগলিত ধারা ও হাস্নুহানার গন্ধকে স্বর্গ বলিয়া দুটি চোখের পাতা এক করিবে না?

অবশেষে জাগিয়াই সে-রজনী শেষ হইয়া গেল।

কেরানী কবি নহে, কেরানী-বধূও নহে, কিন্তু বিরহের নিকষ-পাথরে উহাদের কবিত্বের খাঁটি সোনার দাগ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াই লাগিয়াছে।

ফাল্গুনের রাত্রি—আকাশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যোৎস্নাকে এই মিলন-সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কোকিল-পাপিয়াকে সুর-সাধনায় ব্রতী করিয়া হাস্নুহানার ঝাড়ে হাজার হাজার কুঁড়িকে একই সঙ্গে মুক্তি দিয়াছে, দক্ষিণা বাতাস সেই গন্ধ বহিবার ভার পাইয়া ঘরের মধ্যে যেমন উঁকি মারিয়াছে—অমনই বাহির হইবার কথা তাহার মনে নাই। অবশেষে বায়ুর সঙ্গে কোকিল-পাপিয়ার সুর, জ্যোৎস্নার টুকরা আর রাত্রির মাধুর্য্য ঘরের মধ্যে ভিড় জমাইয়া দুটি হৃদয়ের মিলন-বীণার তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল। কেরানী তো মানুষ, কাজেই এমন অমৃত-পরিবেশের মধ্যে কবি হইয়া স্বর্গ রচনা করিতে তাহার বাধিল না। সুতরাং ঘুমাইবার আয়োজন না করিতেই প্রভাত হইয়া গেল।

৯

প্রভাতে পৃথিবীর আর এক রূপ। গ্রামের প্রান্ত-সীমায় অমিয়দের বাড়ী। উঁচু ষ্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ষ্ট্রাণ্ড রোডের নীচে দোতলা-সমান নীচু খালের শুষ্ক গর্ভ, বর্ষার শেষার্দ্ধে মাত্র পূর্ণযৌবনা গঙ্গার কৃপায় নদী নাম ধারণ করে, মাস তিনেকের মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত নদী-জীবনের শেষ হইয়া যায়। অতঃপর গরু চরিবার প্রশস্ত মাঠে রূপান্তরিত হইয়া বাবলা-বনের সীমানায় মাথা রাখিয়া ঘুমায়। বহুদূর বিস্তৃত সে বাবলা-বন। গঙ্গার চরভূমি হইতে খালের গর্ভসীমা পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৃক্ষশীর্ষ হলদে রঙের ফুলে সাজিয়া বৎসরে তিন-চারটি মাসে মাত্র সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া দেয়। আর কয়েকটি মাস ধূসর রঙের থলো থলো ফলে ভরিয়া, গৃহস্থের গৃহপালিত পশু গরুর খাদ্য জোগায়; বাকী মাসগুলি সুতীক্ষ্ণ কণ্টকফলক মেলিয়া পথিককে বিভীষিকা দেখায়। বাবলাকুঞ্জ ভেদ করিয়া অতিকায় অশ্বত্থ কোথাও

দেখা যায়, কোথাও শিমুল শোভন পত্রে মাথা তুলিয়াছে। বাঁধের ঠিক নীচে একদা বাঁধ কাটা জলের আবর্ত্তে দহ সৃষ্টি হইয়াছিল, সারা বৎসরের পরম সম্পদ সেই জলটুকুতে এ-পাড়ার অধিবাসীদের স্নান, পান ইত্যাদি বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সারা হইয়া থাকে। কোথাও মাঠ দেখা যায়, বাবলা-বনের অন্তরালে কোথাও তা ঢাকা পড়িয়াছে। প্রত্যূষে ষ্ট্র্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া সদ্যপ্রকাশিত কোমল সূর্য্যবর্ত্তিকায় বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিকে পাঠাইতে পারা যায়; মাইল-দুই দূরের গঙ্গার তটভূমি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কালনা হইতে বয়রা পর্য্যন্ত সমগ্র তটভূমি ও-পারের সুউচ্চ পাড়ের ধূমবর্ণের বৃক্ষসারির দ্বারা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে; এ-পারের স্পষ্টতর বৃক্ষশ্রেণীর এবং ও-পারের ধূমরেখার মধ্যে যতটুকু ফাঁকা মাঠ বর্ত্তমান উহারই মধ্যে গঙ্গা তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছেন। একমাত্র বর্ষাকালে শুভ্র পাল তুলিয়া সারি সারি নৌকা যখন ছায়াছবির মত তরতর করিয়া বহিয়া যায়, তখন বিচিত্র বাবলা-বনের অন্তরালবর্ত্তিনী গঙ্গা স্পষ্টতর হইয়া উঠেন। অন্য সময়ে পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। যাহা হউক, একসঙ্গে দশ-বারো মাইল প্রান্তর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিলে আত্মহারা হইতে মানুষের বিলম্ব হয় না। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, বিরাট প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া শুধু সে অনুভব করিতে পারে। রুক্ষ, বন্ধ্যা মাঠের বিস্তৃতি কয়েক ক্রোশ ধরিয়া দৃষ্টিকে ব্যাহত না করিলে, অথবা আকাশের সীমানা যেখানে তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রকে স্পর্শ করিয়াছে, জলময় সমুদ্র কিংবা বালুময় মরুভূমি, ইহাদের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় লাভ করিতে কাহার কতটুকু বিলম্ব হয়? প্রকৃতি যেখানে বিরাট, মানুষ সেখানে মুগ্ধবিস্ময়ে আপনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে; হয়তো আত্মদর্শনের প্রথম অধ্যায়টি এরূপ বিরাট প্রাকৃতিক পরিবেশ না হইলে চোখেই পড়ে না।

"কি রে অমিয়, একমনে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? কাল বাড়ী এসেছিস বুঝি?"

বৃদ্ধ রাঙা-ঠাকুর্দ্দা লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে অমিয়র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমিয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে লইতে বলিল, "কাল সন্ধ্যেবেলা।"

রাঙা-ঠাকুর্দ্দা প্রসন্নমুখে বলিলেন, "বেশ, বেশ, শুনলাম একটি চাকরি বাগিয়েছিস? ভাল, ভাল। এই বাজারে চাকরি না হ'লে ভদ্রস্থতা থাকে?"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, আপনাদের আমলে চাকরি না বাগালে ভদ্রস্থতা থাকত কি ক'রে?"

রাঙা-ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "আমরা হলাম চাষা, আমাদের কথা ছেড়ে দে। হাতে-কলমে করি নি এমন কাজ তো দেখি নে। আমাদের আদর্শ কি ছিল জানিস্, অঋণী, অপ্রবাসী। হয়তো আমরা কুয়োর ব্যাঙ ছিলাম, কিন্তু কুয়োর মধ্যেও সুখ ছিল রে ভাই, সুখ ছিল।"

রাঙা-ঠাকুর্দ্দার দোষ, এক বার সেকালের গল্প পাড়িলে আর থামিতে চান না। একালের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সব কিছুকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না। একালের ছেলে নাকি গুরুজন দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া কথা কহিতে জানে না। বুড়াদের ভুল দেখাইয়া মুখের উপর তর্ক জুড়িয়া দেয়, মাঠ দেখিয়া মুখ সিঁটকায় এবং কাদা গায়ে লাগিলে পাড়াগাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়।

পাছে তিনি সেকালের গল্পে মাতিয়া উঠেন তাই তাড়াতাড়ি অমিয় বলিল, "আপনার বয়স কত হ'ল, ঠাকুর্দ্দা?"

"কত মনে হয় বল দেখি?"

"সত্তর-একাত্তর হবে।"

হা হা করিয়া হাসিয়া রাঙা-ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "আশির এক ঘণ্টা কম নয়। এখনও জানিস, চালভাজা চিবিয়ে খাই, দশ মাইল রাস্তা হেঁটে মারি। দেখ দেখি চুল,—নাতিনাতনিরা দশটা করে পাকা চুল তুলতে পারলে একটা পয়সা পাবে বলা আছে, তা সে বেচারীরা একটি পয়সাও রোজগার করতে পারে না। হা হা।" বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন।

অমিয় সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, "আপনাদের সময়ে খাওয়ার ভোগ ছিল।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "গরিবের ঘরে লুচি-পোলাও কোথা পাব ভাই, যা করেন ভাত-ডাল-তরকারি। ঘরে গরু ছিল, দুধ কিছু খেতাম বটে; কিন্তু পাঁচ জনকে দিয়ে সে আর কতটুকু?"

"তবে আশি বছর হলেও চুল পাকল না কেন, দশ মাইল হাঁটলেও আপনার পা ব্যথা করে না কেন?"

বৃদ্ধ কৌতুকে চক্ষু নাচাইয়া বলিলেন, "শক্তিরক্ষার মন্ত্র আমাদের জানা ছিল, তাই। আমরা ভূতের মত খাটতাম আর রাক্ষসের মত খেতাম। দেশের জল, দেশের হাওয়ায় অম্বল, ডিস্‌পেপসিয়ার গন্ধও পাই নি কোনদিন। তোর ঠাকুরমা কি বলেন জানিস, 'হ্যাঁগা, অম্বল কি গা? আমরা তো এক অম্বল রাঁধি।' বলিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন।

অমিয় বলিল, "আপনাদের কাল যদি এতই ভাল ছিল তো আমাদের সেই কালের মধ্যে রাখলেন না কেন? 'হা অন্ন,' 'হা অন্ন' ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার এ দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হয় কেন?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "আমরাই কি তোদের ঘরছাড়া করেছি, নাতি? তোদের নূতন শিক্ষায় নূতন মন গড়ে উঠেছে—সে-মন এই পুরোনো

জমিতে তাই আর বসে না। আমরা যে-মাঠ তৈরি করেছিলাম তোরা তাতে ফসল ফলাতে পারলি নে, তোরা মিহি ধুতির কোঁচান কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে জুতো পায়ে পাড়ি দিলি শহরের দিকে। তোরা পিছন ফিরলি ব'লেই মাঠ আজ শুকিয়ে গেছে, আকাশে জলের অভাব। মুখ্যু চাষা—বাপ-পিতাম'র কালের মর্চ্চে-ধরা লাঙল আর অস্থিচর্ম্মসার বলদ নিয়ে কত ফসল ফলাবে বল। রোগে তারা শক্তিহীন। অভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েছে, তারা আর কত দিন!"

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রাঙা-ঠাকুর্দ্দা অগ্রসর হইলেন

অমিয় বলিল, "জমিতে আজকাল কিছুই নেই ঠাকুর্দ্দা। ফসল হয়, খাজনা দিয়ে দু-মুঠো ঘরে তোলা যায়, না হ'লে ধারকর্জ্জ।"

রাঙা-ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "কেন এমন অবস্থা হ'ল ভেবেছিস কি? আগের দিনেও জমিদারের খাজনা দিতে হ'ত, জল না হ'লে অজন্মা হ'ত, দুর্ভিক্ষও দেখা দিত। কিন্তু অনেক দুঃখ সয়েও তখনকার লোক জমি চাষ ছাড়ত না। জমি ঠিক ছেলের মত, তাকে স্নেহের চোখে না দেখেছ কি বেয়াড়াপনা করবেই। ভাল ছেলের বায়না রাখতে যেমন ভাল জামা-কাপড়, ভাল খাবার মাঝে মাঝে দিতে হয়, জমির বেলাও তাই।"

অমিয় বলিল, "যদি লাভ বুঝি তবেই তো জমির পিছনে খাটবার উৎসাহ আসে।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "লাভ মানে রাতারাতি বড়লোক হওয়া নয়। জানিস তো 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।' ব্যবসার অর্দ্ধেক চাষে, এ-কথাটি তোরা যে ভুলে যাস।"

অমিয় বলিল, "যেবার ফসল না হ'ত সেবার কি করতেন ঠাকুর্দ্দা?"

রাঙা-ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "শুধু ধান চাষ করলে চাষার অনন্ত দুর্গতি। জমি নিয়ে ম্যাজিক খেলা চাই। ধান, খন্দকুটো, তরিতরকারি—যখন

যেটা পারবে। একটি না হ'লে আর একটি তোমার পরিশ্রম পুষিয়ে দেবে। আমরা ছুটি কি জানতাম না, এক অসুখ হ'লেই শুয়ে থাকতাম।"

অমিয় বলিল, "আমাদের জমি কোথায় যে চাষ করব?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "যখন স্কুল-কলেজে পড়েছিলি তখন কি নিশ্চয় মনে করেছিলি চাকরি পাবি? চেষ্টা ক'রে তবে চাকরি জুটিয়েছিস তো? চাকরির চেয়ে অনেক কম চেষ্টা করলে জমি মেলে। সখের জমি চাষ নয়—সমস্ত জীবন তাতে ডুবিয়ে দিতে হবে। তোদের টকি দেখা, সৌখিন রাজনীতির চর্চ্চা করা, শহরের শত রকমের সুখ-সুবিধার উপর লক্ষ্য রাখা—এসব হয়তো চলবে না।"

অমিয় বলিল, "কালের স্রোতকে হাত দিয়ে ঠেকাতে আমরা পারি না ঠাকুর্দ্দা, আপনিও পারেন না।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "যাদের শক্তি আছে তারা স্রোতকে আটকে না রেখে অন্য দিক দিয়ে চালিয়ে দিতে পারে। স্রোতে বাধা দিতে গেলেই অনর্থপাত হয়। তোরাই তো বলিস, রুশিয়া ব'লে এক দেশ আছে, যারা আধুনিক সভ্যতার মাঝখানে ব'সেও জমিজমা নিয়ে দিব্যি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। তাদের দেশে বেকার-সমস্যা নেই।"

অমিয় বলিল, "সে স্বাধীন দেশের কথা ছেড়ে দিন, রাষ্ট্র সহায় হ'লে অনেক কিছু করা সম্ভব।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "পাঁচজনে একত্র হয়ে কাজ করলে রাষ্ট্রের সাহায্য কি দরকার! সে সাহায্য পাওয়া যায় আরও ভাল, না পাওয়া গেলেই বা ক্ষতি কিসের? আসল কথা কি জানিস—তোরা দুর্ব্বল। স্রোতে ভেসে যাওয়াটাই সুখের মনে করিস, স্রোতের গতি ফেরাবার জন্য চেষ্টা তোদের নেই। আমাদের ফসল আজকাল হয় বন্যায়

ভেসে যায়, নয় জলাভাবে শুকিয়ে যায়, অথচ বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই। অনাবৃষ্টির দিনে চেষ্টা করলে আমরা অনায়াসে নদী থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি। এক জনের চেষ্টায় এ কাজ হয় না। আবার বন্যার জল যাতে না ঢোকে তার ব্যবস্থাও আমাদের হাতে। যারা আজকাল চাষা তারা শুধু জমিই চাষ করে, ধারে-কর্জ্জে, রোগে-শোকে তারা শক্তিহীন, ভাল ক'রে চাষও করতে পারে না। তোরা বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে যদি এদের সাহায্য করিস, তবে আবার জমিতে সোনা ফলতে পারে। নইলে কাগজে লিখে, আইন ক'রে এদের দুঃখ দূর করতে পারবি নে।"

অমিয় দেখিল ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন, পায়ের গতি তাঁহার দ্রুত হইয়াছে, লাঠির ঠকঠকানিও বাড়িয়াছে। বুড়ার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে মৃদু দৌড়ানর অভ্যাস করিতে হয়।

সে বলিল, "আর কতটা বেড়াবেন ?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন. "আরও এক মাইল। তোর কি পা ব্যথা করছে, নাতি ?"

অপ্রতিভ হইয়া অমিয় বলিল, "না। বাড়ীতে অনেক কাজ আছে।"

বৃদ্ধ হাসিলেন, "ওহো, সপ্তাহের একটি দিন মাত্র তোদের, যা, যা, বাড়ী যা, নাতবৌ আবার কি মনে করবেন ?"

অমিয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে ভয় আমি করি না।"

"তা বটে, তোরা একালের বীর, অনেক কৌশল তোদের জানা আছে। এমন সকালবেলাটা বুড়োর সঙ্গে বেড়িয়ে মাটি করলি, নাতি।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া গেলেন।

অমিয় আর একবার দিগন্তবিস্তৃত মাঠের পানে চাহিল। কোমল কিরণে মাঠের শোভা বাড়িয়াছে, কিন্তু শহরের বিলাসী মনের এ সৌন্দর্য্য-

সাগরে ডুব দিবার যোগ্যতা কোথায়? যাহারা নিজের হাতে লাঙল ধরে, মাটি কোপায়, কাদা মাখে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দুষ্কর তপস্যা করে---ভূমি-লক্ষ্মীর প্রসাদ পাইবার অধিকার মাত্র তাহাদেরই আছে। তাহাদের ধ্যাননিমীলিত নেত্রের সম্মুখে স্নেহবিগলিত মাতৃমূর্ত্তিতে জমি দেখা দেন। শহরের সন্তান সে—কয়েকটি কোমল মুহূর্ত্ত লইয়া কবিত্ব তাহার শোভা পায় না।

সেকালের পুরাতন কথাতেও মন খারাপ হইয়া যায়। বুড়াদের অটুট স্বাস্থ্য, প্রাণখোলা হাসি-আলাপ, উন্নততর জগৎ-ব্যাপারে ঈষৎ অজ্ঞতা-প্রকাশ প্রগতিশীল তরুণ মনকেও বিস্বাদ করিয়া দেয়।

বাড়ী ঢুকিবার মুখেই এক দল তরুণ অমিয়কে ঘিরিয়া ফেলিল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, অমিয়-দা।"

"কেন?"

অখিল তরুণদলের অধিপতি, যা-কিছু বলিবার দলের মুখপাত্র-স্বরূপ সে-ই বলিয়া থাকে। চোখে তাহার চশমা, হাতে রিষ্টওয়াচ ও খাতা-পেন্‌সিল। খাতাটি অমিয়র সামনে খুলিয়া ধরিয়া কহিল, "আপনাকে চাঁদা দিতে হবে আমাদের ক্লাবে; আপনার নাম সভ্যতালিকাভুক্ত ক'রে নিয়েছি।"

অমিয় বলিল, "আমি তো মাত্র ছ-মাস দেশছাড়া, এরই মধ্যে কিসের ক্লাব তৈরি করেছ?"

অখিল বলিল, "এই খাতায় আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য লেখা আছে। দেখুন না?"

অমিয় বলিল, "পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে, মুখে বল।"

অখিল বলিল, "আমাদের গ্রামের যাতে উন্নতি হয়, তারই চেষ্টা

আমাদের করতে হবে। ক্লাব করা মানে পাঁচ জনকে এক ক'রে একটি বৃহৎ সংসার সৃষ্টি করা।"

অমিয় বলিল, "ভাল কথা।"

অখিল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কারও বাড়ীতে অসুখ হ'লে রাত জাগবার একটি লোক পাওয়া যায় না। মড়া পোড়াবার জন্য চার জন লোক মেলে না, কোন বাড়ীতে চুরি হলে 'হায়' 'হায়' করা ছাড়া পথ নেই, এই সবের জন্য আমরা সেবক-সমিতি গড়েছি। কাল রাত্রিতে শোনেন নি হুইসিলের শব্দ?"

"হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।"

"আমরা জেলার এস্-ডি-ওকে লিখে ব্যাজ আনিয়েছি—প্রত্যেক রাত্রিতে দশ জন ক'রে ছেলে পোষাক পরে লাঠি হাতে হুইস্‌ল্ নিয়ে গাঁ টহল দেয়।"

"গাঁয়ে কি আজকাল চুরি হচ্ছে নাকি?"

আর একটি ছেলে উত্তর দিল, "না হয় নি। যদি হয়, প্রিকশন্ নেওয়া মন্দ কি।"

অমিয় একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি উদ্দেশ্য তোমাদের ক্লাবের?"

অখিল বলিল, "আমাদের খেলাধুলার একটি বিভাগ আছে, সাহিত্যের বিভাগ, নাট্য বিভাগ, ব্যায়াম বিভাগ, সমবায়-সমিতি বিভাগ, পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ, জনসেবা—সবই আমরা রেখেছি।"

অমিয় বলিল, "ভাল কথা। এক সঙ্গে অনেকগুলি বিভাগ খুলেছ তোমরা, সবগুলি এক সঙ্গে সুশৃঙ্খলে চালাতে পারবে তো?"

অখিল বলিল, "কেন পারব না? আপনাদের সাহায্য পেলে—"

অমিয় বলিল, "ধর, আমাদের সাহায্য পেলে—"

অখিল, "অমিয়কে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, "দেখুন না, আমাদের ছ-মাসের রিপোর্ট।" বলিয়া খাতা খুলিয়া সোৎসাহে আরম্ভ করিল, "পূজার সময় নাট্য বিভাগ ছু-খানি নাটকের অভিনয় ক'রে দেশের লোককে আনন্দ দিয়েছে। এবার শান্তিপুর ব্রিজ-কম্পিটিশনে আমরা 'সুধাময় কাপ' পেয়েছি। সরস্বতী পূজোতেও ছোটখাট একটা প্রীতিসম্মেলন হয়ে গেছে।"

অমিয় বলিল, "জনসেবার বিভাগে কি কাজ হয়েছে ?"

অখিল বলিল, "ওখানে কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। কোথাও জলপ্লাবন বা ভূমিকম্প হ'লে আমরা ভিক্ষেয় বেরোব।"

অমিয় বলিল, "যদি জলপ্লাবন বা ভূমিকম্প না হয় ?"

একটি ছেলে টপ করিয়া উত্তর দিল, "কেন, আমাদের দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। গরিব-ছুঃখী যে আসে একটি পয়সা নিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়।"

অমিয় বলিল, "ওষুধ দেন কে ?"

"কেন, পরেশ ডাক্তার। আমাদের ক্লাবের মেম্বার যে।"

অখিল বলিল, "তা ছাড়া গেল পূর্ণিমাতে আমরা সাহিত্য শাখার একটি অধিবেশন করেছিলাম; প্রবন্ধ-কবিতা তাতে অনেকগুলি পাঠ হয়েছিল।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু শৃঙ্খলার কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় ধরেছ—শেষ পর্য্যন্ত খেলা বা থিয়েটারের ক্লাব না হয়।"

অখিল বলিল, "তাই তো আপনাদের মেম্বার করে নিচ্ছি। আপনারা যোগ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলুন।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের থেকে আমার বয়সও খুব বেশী নয়—দু-চার বছরের তফাৎ। যখন দেশে ছিলাম, এমনি অনেক হুজুগে মেতেছি। সাহিত্যসভা করেছি, অথচ সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নি, ফলে ছ-মাসের মধ্যে সেই অল্পায়ু সভা দেহরক্ষা করলেন। পরোপকার করতে গিয়ে দেখি—ছেলেমানুষ ব'লে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে; মনে মনে খুব রাগ করেছি তাঁদের উপর, প্রতিজ্ঞা করেছি, যে ক'রে হোক তাঁদের জানিয়ে দেব ছেলেমানুষ হ'লেও মতি আমাদের স্থির আছে এবং পরের উপকার ভাল রকমেই করতে পারি। হয়তো আরম্ভটি ভালই হয়েছিল—কিন্তু আজ দেখছ তো, তেমন সমিতি এই গ্রামের কোথায় বেঁচে আছে! অনেক কষ্টে যে লাইব্রেরি খুললাম—বৎসরের মধ্যে তার বইগুলি পাঠকেরা লোপাট ক'রে দিলেন, তাই লাইব্রেরি গড়ে উঠল না।"

অখিল বলিল, "আপনি আমাদের নিরুৎসাহ করবেন না, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি—"

অমিয় বলিল, "তোমাদের প্রতিজ্ঞার মূল্য আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যে স্রোতের মুখে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ তাই যে তোমাদের দূরে সরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা কেউ লক্ষপতির ছেলে নও, স্কুল-কলেজের পড়া শেষ হলে কর্ম্মক্ষেত্র তোমাদের কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই।"

অখিল বলিল, "আপনি বড় পেসিমিষ্ট। যে চেষ্টায় আপনারা সফল হন নি, আমরা তাতে সফল হ'তে পারি।"

অমিয় বলিল, "চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু মনের মধ্যে বিলাসের মত ক'রে যদি দেশসেবার আয়োজন ক'রে থাক তো এখনও ফিরে দাঁড়াও। তোমরা ভূমিকম্পের অপেক্ষায় জনসেবাকে মুলতবি করে রেখেছ, কিন্তু নিজের দেশের মাঠগুলি যখন জলে ডুবে ফসল নষ্ট ক'রে

দেয় তখন কি উপায় কর শুনি ? "একটি পয়সা না নিয়েও তো দুঃখীর দুঃখ মোচন করা যায় ।"

অখিল বলিল, "আমাদের ফাণ্ডের অভাব, পয়সা না নিলে ওষুধ দেব কোত্থেকে ।"

অমিয় বলিল, "বিকেলে এস, আরও কথা ও-সম্বন্ধে বলব ।"

অখিল বলিল, "লক্ষ্য আমাদের উচ্চ আছে দাদা ।"

অমিয় হাসিমুখে বলিল, "তাই তোমাদের প্রশংসা করি। তোমরা যে বাজারের মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ব'সে পরচর্চ্চার মজলিশ জমাও না, এইটুকুর জন্য তোমাদের সাধুবাদ করি। হয়তো তোমরা কিছুই মহৎ কাজ করতে পারবে না, তথাপি তোমাদের দেখে আরও পাঁচ জন যদি এ-পথে আসে সে-গৌরব তোমাদেরই ।"

অমিয় বলিল, "আপনাকে আমাদের সেক্রেটারী হতে হবে। আমরা কোন্ পথে চলব, কেমন ক'রে চলব, সে নির্দ্দেশ দেবেন আপনি ।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "এক অন্ধ আর এক অন্ধকে দেখাবে পথ ? মন্দ নয় !"

ছেলেদের বিদায় দিয়া অমিয় বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

বাড়ীর টুকিটাকি কাজ ও বাজার সারিয়া আহারে বসিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। মা বহুক্ষণ হইল রান্না সারিয়া স্নানের তাগাদা দিতেছেন। তেল মাখিতে মাখিতে অমিয়র গল্প আর শেষ হয় না। পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘড়া জল তুলিয়া লেবুর চারায় ঢালিয়াছে, জুঁই-গোলাপের গাছে দিয়াছে, মায়ের হাতে-বোনা লাল নটেশাকের জমিখানি ভিজাইয়াছে।

মা অধীর হইয়া তাড়া দিতেছেন, "কি রে, তোর হ'ল? ছুপুরবেলা গাছে জল ঢালার সৃষ্টি দেখ! ভাত যে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেল।"

"এই যাই।" বলিয়া অমিয় মাথায় জল ঢালিল। কলিকাতার কলের জলে স্নান সারিয়া আরাম পাওয়া যায় না। শীতকালে গায়ে জল ঢালিতে অস্বস্তি বোধ হয়, গ্রীষ্মকালে জল ঢালিতেছি বলিয়া বোধই হয় না। আর কুয়ার জল ঋতু অনুসারে তৃপ্তি দান করে। শীতে ঈষদুষ্ণ, গ্রীষ্মে বরফবিগলিত—একমাত্র কষ্ট কুড়ি-বাইশ হাত দড়ার সাহায্যে টানিয়া তুলিতে হয়।

আহারে বসিয়া তো অমিয়র চক্ষুস্থির। সবিস্ময়ে বলিল, "ভাত আর না দিলেই পারতে মা, এত তরকারি রেঁধেছ, কোন্‌টা আগে মুখে দেব!"

"ভারি তো তরকারি। গাছের ডুমুর ছিল ঝাল করেছি, ডাঁটা ছিল চচ্চড়ি রেঁধেছি, থোড় ছিল ছেঁচকি করেছি—আর নটেশাক তুলে তেলশাক করেছি। তুই তো চিংড়ি মাছ নিয়ে এলি বাজার থেকে, তাই পুঁইশাক দিয়ে রাঁধলাম। ক'খানাই বা বড়ি ভাজা, কতটুকুই বা সোনা-মুগের ডাল? আর আমার নিরামিষ দিকে একটু মটর ডাল ভাতে দিয়েছি—তুই গাওয়া ঘি দিয়ে খেতে ভালবাসিস বলে। গল্‌দা চিংড়ি দিয়ে এঁচড়ের ডালনা বৌমা রেঁধেছেন ও-বেলার জন্য; এ-বেলা সামান্য একটু দিয়েছে বুঝি? আর ঐ তো মাছভাজা, ঝাল আর অম্বল। দেখ আমার পোড়া মনের দশা, ঝিঙে-পোস্ত দিতে ভুলে গেছি!"

অমিয় বলিল, "আমি যেগুলি খেতে ভালবাসি সবই রেঁধেছ—কেবল মোচার ঘণ্টটা বাদ গেছে।"

মা বলিলেন, "মোচা আগের দিনে আনিয়ে কুটে না রাখলে রান্নার সুবিধে হয় না। আসছে শনিবারে বাড়ী এলে রাঁধব। ওমা, ও কি,

খাওয়া! ভাল করে ডাল মাখ ভাতে। না খেয়ে খেয়ে নাড়ী শুকিয়ে গেছে।"

অমিয় বলিল, "নাড়ী শুকোয় নি, মা। তবে তোমার মত মা তো সেখানে ব'সে নেই, আমি কি ভালবাসি না-বাসি তারা সে-সব ধার ধারে না। ঠাণ্ডা ভাত, আলুনি শুকনো তরকারি, জলমেশানো ডাল, আর লঙ্কা-বাটা দেওয়া মাছের ঝোল—এই সব রাজভোগ নিত্য গিলতে হয়। রুচির আর অপরাধ কি বল।"

"হাঁ রে, এই খাওয়া খেয়ে সবাই থাকে কি ক'রে?"

অমিয় বলিল, "সবাই কি আর এই খাওয়া খায়। যে-বাড়ীতে আমি আছি সেখানকার কথা বলছি। মেলাই লোক সেখানে খায়, প্রত্যেকের রুচি-অনুযায়ী রান্না হতে পারে না।"

মা অলক্ষ্যে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ছাই শহর!"

অমিয় বলিল, "তোমার ছেলেটির কপালে ভাল খাবার মেলে না ব'লে শহরটাই ছাই হয়ে গেল!"

"না তো কি! হ্যাঁ রে, সেখানে মোচা-ডুমুর, এসব পাওয়া যায়?"

"সব, সব। ফাল্গুন মাসে পটলের ছড়াছড়ি, আমের ছড়াছড়ি, জষ্ঠি মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি—পয়সা দিলে এমন জিনিষ নেই যা বছরের যে-কোন সময়ে মেলে না।"

"তবে!" বলিয়া অল্প একটু থামিয়া মা অন্য কথা পাড়িলেন, "এবার যখন আসবি পটল নিয়ে আসিস।"

মাছ খাওয়া শেষ হইবামাত্র মা জামবাটি ভরিয়া দুধ আনিলেন। অমিয় লাফাইয়া উঠিল, "দোহাই মা, এ-বেলা আর নয়। সেলাই খুলে পেটের ভেতর দুধ চালান দেবার উপায় নেই—ও বেলা দিও।"

"ও-বেলার দুধ আলাদা আছে।"

"তা হ'লে বিকেল বেলা।" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। মা দুঃখিত মনে দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া রাখিলেন।

অমিয় যখন বাড়ী ছিল, তখন দু-বেলা দুধ জোগাইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। এক বেলায় যেটুকু পাতে দিতেন পরিমাণে তাহা অল্পই। নিজের দুধ হইতে কিছু ঢালিয়া না দিলে ততটুকু দুধ কোন মা-ই কোন ছেলের পাতে দিয়া পরিতৃপ্তি বোধ করেন না।

অমিয় বুঝিয়া প্রতিবাদ করিত, "আমার পাতে যদি সবটুকু দুধ দিলে তো তুমি খাবে কি!"

তাকের উপর একটি বাটি দেখাইয়া মা বলিতেন, "ঐ তো আমার দুধ রয়েছে।"

অমিয় বলিত, "পাড় তো দুধের বাটি, কতখানি আছে দেখি।"

মাও পাড়িবেন না, অমিয়ও ছাড়িবে না। অবশেষে অমিয়র জিদে বাটি তাঁহাকে পাড়িতে হইত।

অমিয় বলিত, "এই তোমার দুধ রাখা!"

মা বলিতেন, "জ্বাল দিয়ে ঘন করে রেখেছি ব'লে কম দেখাচ্ছে, পাতলা দুধ আমি খেতে পারি নে।"

অমিয় মায়ের প্রবঞ্চনা বুঝিত, বুঝিয়াও আর কিছু বলিত না।

আহার শেষ হইলেও বিশ্রাম অমিয়র অদৃষ্টে জুটিল না। বাহিরে কে এক জন ডাকিতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিল, ও-পাড়ার মুরারি সরকার।

অমিয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার একটি উপকার করতে হবে ভায়া। কাল কলকাতায় যাচ্ছ তো? আচ্ছা। শুনলাম তুমি বেলগেছের দিকে থাক, ঐ কাছাকাছি সর্ব্বখাঁয়ের রোড আছে, সেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকে। তাদের খোঁজটা একবার নিয়ে আসবে,

ভায়া? ছ-মাস হ'ল মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হবামাত্রই জামাই কর্ম্মস্থলে তাকে নিয়ে গেলেন—তারপর চিঠি লিখলেও জবাব দেন না।"

প্রৌঢ় সরকার মহাশয়ের মুখে ব্যথার ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। একটু কাশিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন, "তুমি আপন লোক, বিশেষ সেখানে গেলে যখন সবই জানতে পারবে, তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই। অবস্থা তো আমাদের জানই, কোন রকমে মেয়েটিকে পার করেছি। তেমন দিতে থুতে পারি নি—যা দেবার কথা ছিল তাও—", একটু থামিয়া আর একবার তিনি কাশিলেন।

অমিয় তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে-প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য বলিল, "দেবেন চিঠি, উত্তর এনে দেব।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "দশ ভরি সোনা দেবার কথা ছিল, আট ভরি মাত্র দিতে পেরেছি। বিয়ের রাত্রিতে খরচ বেশী হয়ে গেল কিনা, জামাইয়ের হাতঘড়িটিতে কিছু বেশী লাগল, কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। তাতেই ওঁদের রাগ। সেই জন্যই মেয়ে পাঠান না, বা উত্তর দেন না।"

অমিয় বলিল, "বাংলা দেশের এ একটা মস্ত বড় কুপ্রথা, সরকার মশাই। যাঁরা বিয়ে করেন তাঁরা হয় তো ভাল করেই জানেন যে, জীবনে একটি ভাল ঘড়ি কিনতে পারবেন না, বা বৌকে ভাল গহনা গড়িয়ে দিতে পারবেন না, তাই শ্বশুরের উপরেই জুলুম। জামাইটি আপনার কি করে?"

"ট্রাম ডিপোয় কি কাজ করে। মাইনে তো তেমন নয়—"

"বুঝেছি, সে যে কালে শ্বশুর হবে এ-কথা সে ভাবে না, এমনি আমাদের বাংলা দেশ! যারাই পীড়ন সয়, তারাই পীড়ন করে। নিজের দুঃখ দিয়ে পরের দুঃখ বুঝতে চায় না। যে নদী মজে

যায়, তার বালির চড়াই শুধু তার প্রত্যক্ষ কারণ নয়; সেখানে শেওলা জমে, পাঁক জমে, যত কিছু আবর্জ্জনা সবই জমে !"

মুরারি সরকার বলিলেন, "তোমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বোঝ সব কথা। সবাই তো সব কথা বোঝে না। তা ভায়া, ও দু-ভরি সোনা আমি দিয়ে দেব, ধারে কর্জ্জে আমার ভয় নেই। এই নাও চিরকুট, এতে ঠিকানা লেখা আছে। আর—"

"বলুন না, আপনি কিন্তু করছেন কেন ?"

"আমার লজ্জা করে, ভায়া। বাড়ীতে একটা মানকচু হয়েছিল, আর কিছু সজনের ডাঁটা ঐ সঙ্গে দিতাম, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে।"

"না, না, কষ্ট কিসের—আপনি দেবেন।"

"আমি ষ্টেশনে পৌঁছে দেব, সেখানে কেবল তোমাকে কষ্ট ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি আবার কষ্ট ক'রে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাবেন কেন, আমাকেই দেবেন।"

সরকার মহাশয় বিনীত হাস্যে বলিলেন, "এই যেটুকু অনুগ্রহ দেখিয়েছ ভায়া, তাই যথেষ্ট। যাকে বলেছি—কেউ গ্রাহ্য করে নি। বলেছে, বেলগাছি বহুদূর। এক জনকে ট্রামভাড়া দিতে গিয়েছিলাম, তিনি রাগ ক'রে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। গরিব আমি, কিসে কার মান-অপমান বুঝি, কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে আমরা চোখ থাকতেও কানা! মন যে বোঝে না ভায়া।" মলিন কোঁচার খুঁট চোখের কোণে ঘষিতে ঘষিতে মুরারি সরকার চলিয়া গেলেন।

অমিয় ব্যথিত অন্তরে ভাবিল, পৃথিবীতে অনেক রকমের দুঃখ আছে, কিন্তু বাঙালী-সংসারের দুঃখগুলি যেমন তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তীব্র হইয়া উঠে, এমনটি আর কোথাও নাই।

আর একটি রাত্রি।

এ-রাত্রিতেও চাঁদ উঠিয়াছে, হাস্নুহানা ফুটিয়াছে, কোকিল-পাপিয়া ডাকিতেছে, এবং প্রিয়া আসিয়া পাশে বসিয়াছে। আজও এখানে ইচ্ছা করিলে স্বর্গ রচনা করা যায়,—কিন্তু নিতান্ত মর্ত্ত্যবাসীর মত অমিয় আশার এক খানি হাত ধরিয়া কহিল, "আমাদের যদি ছেলে হয় তা হলে এখন থেকে একটি প্রতিজ্ঞা চুপি চুপি করে রাখি, আশা। মন না মতি বলা যায় না, আমি যদি বা ভুলি, তুমি মনে করিয়ে দেবে।"

আশা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "রাম না হ'তে রামায়ণ ?"

অমিয় বলিল, "ছেলের বিয়ের এক পয়সা পণ আমরা নেব না। যদি নিই—"

আশা বলিল, "দিব্যি গালবার দরকার নেই, মনে থাকবে।"

অমিয় বলিল, "এবং মেয়ে হ'লে তার বিয়েয় এক পয়সা পণ আমরা দেব না।"

আশা বলিল, "তা কি ক'রে হবে, তুমি-আমি নিয়ে তো সমাজ নয়।"

অমিয় দৃঢ়স্বরে বলিল, "সমাজ আমরাই গড়ব। হয়তো মেয়ের বিয়ে আমাদের হবে না, হয়তো অনেক কিছু অপমান-দুর্ভোগ আমাদের সইতে হবে। পারবে না ?"

আশা বলিল, "তোমার যে পথ, আমারও সেই গতি।"

আশার হাতে দৃঢ় মুষ্টির চাপ দিয়া অমিয় বলিল, "না, তোমার মত বল। আমার মতে শুধু কাজ হবে না!"

"উঃ, লাগে যে"—বলিয়া আশা হাসিল।

উত্তেজিত অমিয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বল তোমার মত।"

আশা হাত ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা আমি ক'রে রাখছি, কিন্তু মেয়ের বিয়ের কথা এখন থেকে কেমন ক'রে

বলব। বিশেষ মেয়ের মতি-গতি শিক্ষা-রুচির উপর আমাদের প্রতিজ্ঞা নির্ভর করছে যখন।''

অমিয় বলিল, "আমাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, রুচি গড়ব আমরাই, সে-দায়িত্ব আমাদের।"

আশা বলিল, "মানুষ তো অনেক আশাই করে, অনেক চেষ্টাই করে,—সব কি সফল হয় ?''

অমিয় বলিল, "চেষ্টার মত চেষ্টা করলে কেন হবে না ? আমরা আশা করি অসম্ভবের, চেষ্টা করি না সেই আশাকে সফল করবার। আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু যে পথে চলি তা পরীক্ষামূলক। হয়তো বুঝলে না। আমি যদি বলি, ঐ উঁচু ডালের বেলটিকে পাড়বই, তা হলে কাঁটার ভয় ত্যাগ ক'রে আমায় গাছে উঠতেই হবে। কিন্তু নীচে থেকে ঢিল মেরে বা আঁকশি দিয়ে খানিক চেষ্টা ক'রে যদি না পাড়তে পারি তো উঁচু ডালের দোষ দিই, নিজের অক্ষমতার কথা ভুলে যাই।''

আশা মৃদু হাসিয়া বলিল, "বুঝলাম। কাল ভোর বেলায় উঠতে হবে, এখন ঘুমোও।"

অমিয় বলিল, "এত শীঘ্র ঘুম আসছে না। আশ্চর্য্য দেখ, আপিসে দিন আর কাটতে চাইত না, অথচ বাড়ীতে সারা রবিবারটা যেন একটা নিশ্বাসের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল !''

আশা বলিল, "অনেক দিন পরে কি না, তাই নূতন লাগছে। অথচ যখন বাড়ী ব'সে ছিলে তখন তো বলতে একঘেয়ে দিন আর কাটতে চায় না।"

অমিয় বলিল, "কবি সত্য কথাই বলেছেন,—

বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

"আচ্ছা, এবার মাইনে পেলে তোমার জন্য কি আনব ?"

আশা হাসিয়া বলিল, "আমায় ভোলান হচ্ছে ?"

অমিয় বলিল, "সত্যি না। আমার ইচ্ছে হয়েছে—"

আশা বলিল, "এখন শুনব না, ঘুমোও। আগে মাইনে পাও, তার পর ভেবেচিন্তে বলব।"

অমিয় বলিল. "ভেবেচিন্তে হয়তো এমন কিছু বলবে যা আমার মাইনেয় কুলোবে না।"

আশা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছ—যা চাইব দেবে।"

অমিয় বলিল, "অবশ্য যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়।"

আশা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ঘুমোও।"

আলোর দম কমাইয়া দিয়া আশা পাশ ফিরিল।

১০

রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে অমিয় ট্রেনে আসিয়া উঠিল।

দিনের আলোয় অতি-পরিচিত প্রিয় পথ অতিক্রম করিতে হয়তো কিছু কষ্ট বোধ হইত; বারবার পিছন ফিরিয়া, পরিচিত গাছের পানে চাহিয়া, যাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রাতঃস্নানে চলিয়াছে তাহাদের পরমসুখী ভাবিয়া—পা তাহার আর চলিতে চাহিত না। এ ভালই হইল। মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া ও আশাকে আগামী শনিবারে আসিবার কথা দিয়া বিদায় লইবার সময় মন যা খারাপ হইয়াছিল, অন্ধকার পথে পা দিয়াও সে-ব্যথা যেন লূতাতন্তুজাল বিস্তার করিতে লাগিল। অবশেষে মোড়ের মাথায় অবনী ও সুরেনকে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল, "পাঁচু এখনও আসে নি ?"

অবনী ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "দেশলাইটা জ্বাল ত, ব্যস, আর তিন মিনিট বড়জোর আমরা অপেক্ষা করতে পারি। না হ'লে বুঝব সে এল না।"

সুরেন বলিল, "তাদের আপিস ভাল, সোমবারে প্রায়ই সে ডুব দেয়।"

অবনী বলিল, "এই ভোরে বিছানা ছেড়ে আসা কম কষ্টকর নয়। নেহাৎ আপিস, তাই আসতে হয়।"

তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়াও পাঁচু আসিল না, অগত্যা গল্প করিতে করিতে তিন জনে অগ্রসর হইল।

আকাশে ঠাসাঠাসি নক্ষত্র, চাঁদ নাই। উষার পিঙ্গল আলোক এখনও ফুটে নাই, কিন্তু বাতাসে স্নিগ্ধতা অনুভূত হইতেছে। গাছপালা বাড়ীঘর অস্পষ্ট চোখে পড়ে; কোথাও সাড়াশব্দ নাই।

অবনী বলিল, "শনিবার বিকেলে আসবার সময় অমিয় আমাদের কথা কইতে বারণ করেছিল, মনে আছে সুরেন?"

সুরেন বলিল, "ও যে এক কালে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। তা এখনও চুপ করে পথ চলি না কেন। এমন থমথমে রাত, অন্ধকার, কবিতার খাদ্য কিছু পেলেও তো পেতে পারে।"

অমিয় বলিল, "না হে না, কথা বলতে বলতেই চল। কবিতা লেখা আমি অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের জীবনে অনেকগুলি দশা পর পর আসে, আবার একে একে সেগুলি চলে যায়।"

অবনী বলিল, "এখন কোন্ দশায় পৌঁছেছ, অমিয়?"

অমিয় বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, চাকরিতে ভাল ক'রে আগে মন বসুক।"

সুরেন বলিল, "যাই বল এ-দশা বৃহস্পতির।"

তিন জনের হাসিতে পথের অন্ধকার যেন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। মনের মধ্যে অল্প একটু ব্যথা—গ্রাম ও প্রিয়পরিজন ছাড়িবার হেতুতে খচ্‌খচ্‌ করিতেছিল, হাসির শব্দে সেটুকুও কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পথের একটা মায়া আছে, সঙ্গীর মায়াও আছে, সর্ব্বোপরি এই রাত্রির মায়া। মানুষের মন পদ্মপাতার মত না হইলে দুঃখের একটি মাত্র ঢেউয়ে কোন্‌ অতলে তলাইয়া যাইত।

ট্রেনে বসিয়াও তিন বন্ধুতে গল্প করিতে লাগিল। মানুষ অবস্থাবিশেষে কি হইতে পারে ও কোন্‌ অসাধ্য সাধনই না করিতে পারে গল্প সে-সম্বন্ধে নহে; মানুষ একটু সুযোগ পাইলে যে ভাবে আশার মেঘে তুলি বুলাইয়া চলে—তাহারই পুরাতন ইতিহাস। আকাশের মেঘ পাইলে মানুষ চিত্রকর হইয়া উঠিবে—এ আর নূতন কি! প্রবল বাতাসে মেঘ উড়িয়া যায়—সে-কথা জানিয়াও—রঙে ও তুলিতে তন্ময় হইয়া ছবি আঁকে; প্রবল বৃষ্টিতে ছবি মুছিয়া যায়, তথাপি চিত্রকর-মন তাহার কল্পনাকে আঁকড়াইয়া ধরে। বাস্তবকে আমরা ভালবাসি এ-কথা সত্য, কিন্তু কল্পনা নহিলে শুধু বাস্তব কি আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিত?

ট্রেন ছাড়িয়া দিল, পূর্ব্ব দিগন্তে অন্ধকারও গলিয়া পড়িল। খটাখট শব্দ করিয়া ও ধোঁয়া ছাড়িয়া ট্রেন চলিতে লাগিল। নূতন সূর্য্যোদয় দেখিবার মোহ কোথায়? নূতন প্রভাতের আলোককে দিবসের আশীর্ব্বাদী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রসন্নতাই বা কোথায়? যন্ত্র-দৈত্যের একটি হুঙ্কারে মনের কোমল ভাবগুলি শিথিলবৃন্ত কামিনী ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। পথের দ্রুত ধাবমান গুল্ম বৃক্ষের প্রতি, খর্জ্জুর, জাম ও আম্র বৃক্ষের প্রতি এবং বিস্তীর্ণ মাঠের শস্যাঙ্কুরের প্রতি তেমন প্রাণ-ঢালা প্রীতির উৎস তো কই উৎসারিত হইয়া উঠিল না!

তিন বন্ধুর গল্পের স্রোত খানিকটা চলিয়া মন্দীভূত হইল। বিড়ি-

সিগারেট ফুঁকিয়া, পুরাতন খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়া, অবশেষে কোণ ঠেসান দিয়া জানালার কাছে মাথা রাখিয়া তাহারা চক্ষু মুদিল। ট্রেন শব্দ করিয়া ও দোলা দিয়া চলিতে লাগিল। ভিতরের মানবশিশু-গুলি আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; নিদ্রার অঞ্জন দু-চোখে মাখিয়া তাহারা মনের মধ্যে কোন্ নূতন স্বপ্ন-জাল বুনিতে লাগিল কে জানে? বহিঃপ্রকৃতি আজ তাহাদের কাছে মূল্যহীন।

রাণাঘাট এদিকের বড় জংশন, কোলাহলও ষ্টেশনে বেশী।

অমিয় চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল, বীরেন দাঁড়াইয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছে। অমিয় বীরেনকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

বীরেন বলিল, "গাড়ীসুদ্ধ লোক ঘুমের নেশায় মশ্‌গুল। বাঃ রে সংসারী!"

অমিয় দেখিল, সুরেন লম্বা হইয়া শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, অবনী ঈষৎ হাঁ করিয়া বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতেছে; ট্রেনসুদ্ধ লোকগুলি সত্যই যেন মাতাল হইয়াছে। বীরেনের মন্তব্যটা সঠিক।

অমিয় বলিল, "বীরেনদা, যত দোষ বুঝি সংসারের?"

বীরেন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা বলি নি আমি। মানে, যাবার দিন দেখলাম তোরা দিব্যি মানুষ—হাসিতে, গল্পে, তাসখেলায়, খবরের কাগজ পড়ায় আর রাজনীতি নিয়ে তর্কে—আজ দেখছি, স্রেফ ঘুম। এত ঘুমও মানুষ ঘুমোতে পারে!"

অমিয় বলিল, "যাই বল বীরেনদা, সংসারের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না এসে তোমার মনটাও কঠিন হয়ে উঠেছে।"

"উঠেছে নাকি!" বলিয়া বীরেন হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

অমিয় বলিল, "তোমার তো কোন বন্ধন নেই, অথচ চাকরি কর কেন?"

বীরেন বলিল, "সাপের বিষ নেই বললেই কি থাকে না, অমিয় ? আমরা বাঙালী যে, দাস যে, বন্ধন আমাদের কোথায় কেউ বলতে পারে না। আর চাকরি করব না তো করব কি ?"

অমিয় বলিল, "কেন সাধ ক'রে এ-বন্ধন গলায় পরেছ ?"

বীরেন বলিল, "চাকরি না করলে হয় নিষ্কর্ম্মা আড্ডাবাজ হ'তে হ'ত, না হয় রাজনীতি। যেহেতু আমাদের তৃতীয় পন্থা নেই, তাই চাকরিটি ভাল মনে হ'ল।"

অমিয় বলিল, "আর চাকরি যদি নিলেই—"

বীরেন বলিল, "তো সংসার পাতলাম না কেন ? সে উত্তর শনিবার দিন দিয়ে রেখেছি। যে-দারিদ্র্যকে আমি পাশ কাটাতে চাই তাকে সখ ক'রে ডেকে আনবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আর যে-চাকরি ইচ্ছে হ'লে আজ ছেড়ে দিতে পারি, সংসার কাঁধে নিলে সে-ক্ষমতা তো থাকবে না।"

অমিয় বলিল, "আমি জানি কেন তুমি চাকরি করছ।"

"কেন ?"

"তোমার ছোট ভাইটিকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে সংসারী করবে বলে।"

"তাতে আমার লাভ ?"

"লাভালাভ তুমিই জান।"

বীরেনের দুই চক্ষুতে আবার অগ্নিশিখা দেখা দিল। ঈষৎ বেগের সহিত সে বলিল, "আজ বাবা থাকলে এ বিড়ম্বনা হয়তো ভোগ করতাম না। ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে জগৎ চিনিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে ব'লেই তা করেছি, এ আমার ত্যাগ নয়। তুমি মনে ক'রো না ওকে সংসারী করবার জন্যই আমি সংসার পাতলাম না। উপযুক্ত আয় না-হ'লে ও যদি সংসার পাতে তো আমি ওকে গুলি ক'রে মারব অমিয়।"

অমিয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল., "বল কি !"

বীরেন বলিল, "যা আমি চারি দিকে দেখছি, যার জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি—তা কি খেয়াল-খেলা অমিয় ? সুখের অর্থ আমিও বুঝি, কিন্তু যখন দেখি ছন্নছাড়া যুবক সর্ব্বস্ব খুইয়ে বাজনা বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে পথ দিয়ে বউ নিয়ে যায়—তখনই রক্ত আমার টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে ! সর্ব্বনাশকে মানুষ এমন ধর্ম্মের মোড়কে মুড়ে, এমন বাজি-রোশনাই ক'রে বরণ ক'রে নেয় কেন ? এ শুধু এই দেশেই হয়, এই দেশেই। এখানে কঙ্কালসার নরনারী পথের কুকুরের মত না খেতে পেয়ে পথের ধুলায় মিশে যায় ; এদের জন্য দুর্ভিক্ষের দিনে চাঁদা তোলা, জলপ্লাবনের দিনে গান ক'রে ভিক্ষায় বেরনো, লাট-বেলাটের কাছে দরবার করা, কি না করি আমরা। অথচ এদের বাঁচান আর ঐ নিম গাছে জল ঢালা সমানই পণ্ডশ্রম, অমিয়।"

অমিয় বলিল, "এরা যদি মলো, দেশে থাকবে কে !"

বীরেন বলিল, "কেউ না। থাকবে গাছপালা, কুকুর-শেয়াল, বাঘ-ভালুক। মন্দ কি ! এরা যে আছে তার প্রমাণ তো শুধু দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের করুণ আবেদনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি আর কিছুতে তো এদের পরিচয় নেই।" একটু হাসিয়া বলিল, "তবে যদি বল, মানুষের করুণতম বৃত্তিকে সজাগ ক'রে রাখতে হ'লে এদেরও চাই, বা এই বিরাট জনসমুদ্রের ঢেউ দেখিয়ে বিশ্বের জাতিসভায় একটু আসন আমরা দখল করতে চাই, তা হ'লে অন্য কথা। এদের মাথায় চড়ে আমরা কেউ কেউ জ্যোতিষ্ক ব'লে পরিচিত হয়ে থাকি, অর্থ এবং ক্ষমতা, দুই-ই পেয়ে থাকি—সেদিক থেকেও এদের বাঁচবার সার্থকতা থাকতে পারে।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "তুমি চিরকালের, অদ্ভুত।"

বীরেন বলিল, “তুমি একটি দিন বাড়ীতে কাটিয়ে কি লাভ ক’রে এলে অমিয়? এই ঘুম, এই শ্রান্তি ছাড়া! সেখানে তুমি যে-স্বর্গ রচনা করেছিলে, এই ট্রেনে চাপবার সঙ্গে সঙ্গেই সে-আকাশ তোমার আকাশ-কুসুম হ’ল কেন?”

অমিয় বলিল, “মানুষের খণ্ড ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিতে স্বর্গের সুখ থাকে, সেগুলি তার মনের অপূর্ব্ব সঞ্চয়।”

বীরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, “মিথ্যা কথা। একটু আগের মুহূর্ত্ত যদি কথা কইত সে এই দণ্ডে বলত’ অন্য কথা। যখনই তুমি সুখ পেয়েছ—তখনই কি মনে হয়েছে, এই শেষ, এই পরিপূর্ণ? যদি তা কখনও মনে হয়ে থাকে তো সে তোমার দুর্ব্বল মনের ছলনা।”

“দুর্ব্বল মনের ছলনা!”

“তা ছাড়া কি। রোগ হবার আগে কেউ কি বিছানায় শুয়ে একটি শীতল স্পর্শের মনোরম কল্পনা ক’রে আনন্দে কণ্টকিত হয়? যখন যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য মানুষকে পেয়ে বসে তখনই সামান্য একটু সহানুভূতিতে হাত বাড়িয়ে সে স্বর্গ পায়। ভাল খাওয়া, ভাল ভাবে পাস করা, মাইনে বেড়ে উপরের গ্রেডে ওঠা, অনেক দিন পরে চিঠিতে প্রিয়-পরিজনের কুশল-সংবাদ পাওয়া ইত্যাদি সব অতিতুচ্ছ ঘটনা থেকেও স্বর্গ পাওয়া যায়, এবং সে-স্বর্গ কয়েকটি মুহূর্ত্তের। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তে সে স্বর্গ থাকে কোথায়? সংসারে ছোটখাট ঘটনায় তুমি আনন্দ পেতে পার, আমি হয়তো বেদনা পাই। তাহ’লে তুমি এ-কথা জোর গলায় বলতে পার না যে তোমার সুখটিই শাস্ত্রসম্মত বা ব্যাকরণসম্মত।”

“তা হয়তো বলতে পারি না। মানুষের মন তো কাদার তাল নয় যে যেমন ছাঁচে ফেলবে তেমনই মূর্ত্তি নিয়ে বেরুবে। সব মানুষের জন্য একটি মাত্র ছাঁচও তৈরি হয় না।”

বীরেন বলিল, "খুব সত্য কথা। সমাজ-শৃঙ্খলার মধ্যে দলবদ্ধ ও নিয়মানুগ হয়ে বাস করাতে কারও শান্তি, কেউ শৃঙ্খলার বাইরে এসে তৃপ্তি পান। সবই মানি। তবু, একটি জিনিষ আমি সহ্য করতে পারি নে, অমিয়! যারা দরিদ্র, তারা বিবাহ করে কেন? যারা নিজে অভাবের জ্বালায় জ্বলে তারা সংসার পেতে সে অভাবের আগুনকে দেশময় ছড়িয়ে দেয় কেন? এদের শাস্তি দিতে আইন কোথায়? আমরা যেমন কচুরি পানা ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করি, তেমনই বজ্রনাদে কেন দারিদ্র্য ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করি না?" বীরেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বাহিরের পানে চাহিল।

অমিয় ইচ্ছা করিয়াই কথা কহিল না। একটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা যে পরিচালিত হইতেছে তাহাকে তর্ক দ্বারা আয়ত্ত করা অসম্ভব।

বীরেন দরিদ্র জীবনের বাহিরের খোলসখানি মাত্র দেখিয়াছে, মণিকোঠার সন্ধান সে পায় নাই। অথবা সুকুমার মনোবৃত্তি তার কাছে পীড়াদায়ক। কথাতে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সে-স্ফুলিঙ্গের সম্মুখে পড়িলে নিজেকে অসুখী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। হয়তো বীরেন নীতিবাদ মানে না, তাই সুন্দর সামাজিক প্রথাটিকে সে ঘৃণা করে।

বীরেন সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমার এই মতবাদের জন্য ঘরে বাইরে আমার লাঞ্ছনা। কেউ কেউ নাকি বলেন আমি কম্যুনিষ্ট, সমাজবিধান ভাঙতে চাই।"

অমিয় বলিল, "তোমার মতবাদের মূলে যে কম্যুনিজ্‌ম, এ সন্দেহ আমারও—"

বীরেন বলিল, "তোমারও হয়েছে? কিন্তু এক বিয়ে না-করা ছাড়া প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে নেই। আমি ক্লাবে মিশি না, বেকার নই, বন্ধুর সংখ্যা আমার অল্প, কাউকে চিঠি লিখতে আমার আলস্য বেশী—এক মুখের কথা ছাড়া কোন মতবাদই পোষণ করি না।

শুধু কথার দ্বারা যদি সঙ্ঘ তৈরি করা যেত তা হ'লে আমার মত কর্ম্মী বাংলায় খুঁজে পাবে না। কিন্তু বাংলা দেশে আমরই অর্থাৎ বক্তারাই তো আসর জমিয়ে রাখি।"

অমিয় বলিল, "নৈহাটী আসছে, পান কিনবে না?"

বীরেন বলিল, "না, মনটা ভাল নেই।"

অমিয় বলিল, "এতগুলি সংসারী দেখে নাকি?"

বীরেন বলিল, "যদি বলি তাই। যারা দুঃখ দুঃখ ক'রে চেঁচায়, চোখের জল ফেলে তারাই তো সৃষ্টি করে দুঃখকে। একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা না-থাকলে মানুষ বাঁচে না, যার আকাঙ্ক্ষা নেই—সে নেশা করে। পান-সিগারেটের নেশাই বল, আফিং গাঁজা গুলি মদের নেশাই বল, আর সংসারী হওয়ার নেশাই বল—দুর্ব্বল মানুষের একটা-না-একটা চাই।"

অমিয় বলিল, "আর সবল মানুষের কি অবলম্বন?"

"অমিয়, ঠাট্টা ক'রো না। সংসার যে নিছক সুখের আগার নয়, বুঝবে দু-দিন পরে!"

অমিয়র প্রফুল্ল মুখে অকস্মাৎ ছায়া পড়িল। সে-কথা সে কি বুঝে নাই? গাড়ী যতই কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই স্বপ্নের কুয়াশা বাস্তব সূর্য্যকিরণে মিলাইয়া যাইতেছে। শনিবারের দিন যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, আজ বর্দ্ধিত তরুশাখায় তাহারই বিষফল অমিয়র প্রতীক্ষায় ঝুলিতেছে।

গাড়ীতে কিন্তু ঘুমের ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। নৈহাটীর পর হইতেই প্রাত্যহিক যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে। হাতে কাগজ, টিফিন-বাক্স, গীতা, নভেল অথবা আপিসের ফাইল লইয়া স-কলরবে দলবদ্ধভাবে ইঁহারা উঠিতেছেন,—সকলে বসিবার জায়গা না-পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন। \সপ্তাহান্তিক যাত্রীদের নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত

হইয়াছে। বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শয়নের সুবিধাটুকু হারাইয়াছেন, বিপরীত দিকের বেঞ্চের উপর হইতে পা-দুখানি তুলিয়া লইতে হইয়াছে, স্থানাভাবে নিজেকে কিছু সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এত কষ্টেও নিদ্রার আমেজটুকু তাঁহাদের নয়ন হইতে লুপ্ত হয় নাই। বীরেন আর মুখ খুলে নাই, এক দৃষ্টে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। সিগারেট সে ইচ্ছা করিয়াই কেনে নাই, পানে রুচি নাই, মনটা তাহার সত্যই খারাপ হইল নাকি? অমিয় তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টায় বলিল, "এক দিন রাণাঘাটে নেমে তোমার বাড়ী যাব, বীরেন-দা।"

বীরেন অর্থশূন্য দৃষ্টিতে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "তার মানে?"

অমিয় বলিল, "মানে নয়, এমনি।"

বীরেন বলিল, "সখ বল।"

"কি খাওয়াবে আমায়?"

বীরেন বলিল, "আমরা যা খাই তাই খাওয়াব, নূতন কিছু আয়োজন তোমার জন্য হবে না।"

অমিয় বলিল, "তা কি কেউ পারে? যে গরিব সেও অতিথি এলে ভাল খাবার আয়োজন করে।"

বীরেন বলিল, "গরিবের ঐ তো মস্ত দোষ। নিজের ক্ষমতা ছাড়া আয়োজন ক'রে নিজের মর্য্যাদাকে নষ্ট করে। তুমি কি দেখ নি অমিয়, গরিবের বাড়ী খেতে ব'সে যখন পাঁচ তরকারি সাজিয়ে ভাতের থালাটি তোমার সামনে তাঁরা ধরে দেন, তখন সযত্নে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন! পাছে ওদের লোভের দৃষ্টি লেগে খাওয়ায় তোমার বিঘ্ন হয়!" একটু থামিয়া বলিল, "তাই আমি গরিবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ নিই নে। এক বার এক বন্ধু আমায় তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাত্রি ব'লে তিনি আমার জন্য করেছিলেন লুচির

ব্যবস্থা। এক খানি আসন পাতা হ'তেই আমি প্রবল আপত্তি করলাম—একসঙ্গে না হ'লে খাব না। বন্ধু প্রথমটা বিব্রত হয়ে বললেন, অত সকালে তিনি খান না। আমি বললাম, বেশ তো, আমিও একটু পরে খাব। অগত্যা আমার ভাল আসনের পাশে তাঁর কাঠের পিঁড়িখানা পাতা হ'ল। আমার জন্য এল লুচির থালা, তাঁর জন্য ভাত। সব বুঝেও বললাম, দু-রকম ব্যবস্থা কেন? বন্ধু মুখ নামিয়ে উত্তর দিলেন, রাত্রে ময়দা আমার সহ্য হয় না, ভাতটাই ভালবাসি। আচ্ছা অমিয়, খুব বোকা লোকেও ঐ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হ'তে পারে কি? বার মাস যে ভাত খায় তার মুখে এক দিনও লুচি ভাল লাগে না? তার উপর ওঘরে ছেলেমেয়েদের চীৎকার; তারা আমার লুচি খাওয়া দেখবার জন্যই হয়তো বায়না ধরেছে। এ-সব ভাবলে লুচির গ্রাস তুমি মুখে তুলতে পারতে?"

অমিয় অবাক হইয়া বীরেনের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমায় ভুল বুঝেছি, বীরেন-দা। তোমাকে কঠিন বলেছি।"

বীরেন বলিল, "ভুল বোঝ নি। ওরাই তো আমাকে কঠিন ক'রে তুলেছে অমিয়। কেউ সাহায্য চাইলে এক পয়সা আমি ভিক্ষা দিই না।" একটু থামিয়া বলিল, "এই গাড়ীতেই দেখ না—অন্ধ উঠেছে, খঞ্জ উঠেছে, ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে ছোট ছেলে উঠেছে, বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ উঠেছে। গান গেয়ে এরা প্রত্যেকের কাছে হাত পাতছে।" একটু হাসিয়া বলিল, "যাঁরা এদের ভিক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা যে ঠিক দয়ার বশে দিচ্ছেন না, তা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

"তবে তাঁরা দিচ্ছেন কেন?"

"হয়তো তাঁদের খেয়াল। এমন পেশাদারী ভিক্ষায় খেয়াল ছাড়া কেউ কিছু দিতে পারেন না।"

"আর যাঁরা দেন না?"

বীরেন হাসিয়া বলিল, "তাঁরা অত্যন্ত হিসাবী।"

"তুমি দাও না কেন বীরেন-দা ?"

বীরেন সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এদের তবু সহ্য করতে পারি, কারণ জানি, এদের ভিক্ষাবৃত্তির মূলে ব্যবসাবৃত্তি রয়েছে। দয়ার সুযোগ নিয়ে এরা রোজগার করতে চায়।"

এমন সময় ইছাপুরে গাড়ী থামিল।

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আবার শনিবারে দেখা হবে। কিন্তু তোরা সংসারী মানুষ, আমার মতামতগুলো তোদের মনের উপর খুব ভাল ক্রিয়া করবে না। পারিস তো আমায় এড়িয়ে চলিস অমিয়।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে অমিয় ?"

অমিয় বলিল, "ও বীরেন। আমরা কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এক সঙ্গে পাস করি।"

অবনী বলিল, "ভদ্রলোক বড় পেসিমিষ্ট। সংসারকে উনি রীতিমত ঘৃণা করেন।"

অমিয় বলিল, "ওর মতামতগুলো আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে ; তবু মনে হয় সেই মতের মধ্যে কোথায় যেন শক্তি আছে।"

গাড়ী শিয়ালদহে না-আসা পর্য্যন্ত অবনী বা অমিয় আর কোন কথা কহিল না।

পিছনে পড়িয়া রহিল সুবিস্তীর্ণ মাঠের উপর প্রসারিত গাঢ় নীল আকাশ, ধুলিধূমলেশহীন অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ—সশব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া ট্রেন আসিয়া টিনের শেডের মধ্যে দাঁড়াইল। ট্রেন দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে হুড়হুড় করিয়া যাত্রীদল তাহার জঠর হইতে বাহির হইতে লাগিল। পল্লী হইতে বহিয়া আনিয়া এইগুলিকে শহরের জঠরে ছাড়িয়া দেওয়া

হইল পরিপাক করিবার জন্য। দিবসের শেষে এই শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রীদলকে দেখিলেই শহরের পরিপাকক্রিয়ার শক্তি কত বেশী তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আজ যদিও পথের মায়া ছিল না, তথাপি নূতন এমন এক আবেষ্টনে ইহারা পৌঁছিল, যেখানে সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষ হইয়া যায়। যাত্রীর কোলাহল, ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর শব্দ, রিক্‌শার ঠুন ঠুন ঘণ্টাধ্বনি, হিন্দু মুটিয়া ও মুসলমান গাড়োয়ানের কর্কশ কণ্ঠস্বর, বিবর্ণ আকাশ ও বৃক্ষবিরল অট্টালিকা অটবীর মাঝখানে পৌঁছিয়াই মন ক্রমশঃ নির্লিপ্ত হইয়া উঠিতে থাকে। চোখের সম্মুখে দ্রুত কত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতেছে না, ফুটপাথে লাঠি ধরিয়া খোঁড়া ভিক্ষুক হাত পাতিতেছে, হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি বিকশিত হইতেছে কই? হয়তো এক নিমেষে পরিচিত জনের সঙ্গে বহু দিন পরে সাক্ষাৎ হইয়া গেল—চোখের ইঙ্গিত ছাড়া মুখে কুশল-জিজ্ঞাসার অবসর মিলিল না। রাজপথ দিয়া কোন সম্মানিত জননায়ক ট্রাম-বাসের গতি রুদ্ধ করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছেন—তাঁহাকে দেখিবার তেমন দুর্নিবার আগ্রহই বা মনের মধ্যে কোথায়! একটি মাত্র তীব্র অনুভূতির দ্বারা আর সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আপিস লেট হইলে সেখানকার কড়া আইন অতঃপর কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে—সেইটির পরিবর্দ্ধমান তীব্র আলোক-রশ্মিতে আর সমস্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

জগৎ কত বৃহৎ, আপিসের ঘরগুলি কত ক্ষুদ্র! সেই মেঝে, সেই সিলিং, সেই বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে, আলো জ্বলিতেছে, সেই চেয়ার-টেবিল সাজান রহিয়াছে। ধুলামাখা লেজার বুকে বহিয়া সেই অতিকায় র‍্যাকগুলি পিঠ চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ছোট ছোট হোয়াট-নটগুলিতে ফাইলের স্তূপ। সেই চিরপরিচিত দোয়াতকলম,

পেপার-ওয়েট, টিন বা বেতের ট্রে ও কালীমূর্ত্তিতে টেবিল সাজান। একটি দিন বন্ধ থাকার জন্য ঘরের মধ্য হইতে একটা কাগজ-ভাপসান গন্ধ বাহির হইতেছে।

টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া খগেনবাবু তাঁহার চিররুক্ষ চেহারা লইয়া ডান হাতে লাল কালির কলমটিকে নাচাইতেছেন। অমিয় খাতায় নাম সহি করিতেই তিনি কলম নাচানো বন্ধ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ডাঁটা-মানকচুর ভেট আবার কার জন্যে মশাই? দু-দিন চাকরিতে ঢুকতে না-ঢুকতেই যে পূজোআচ্ছার মন্তর জেনে গিয়েছেন দেখছি!"

অমিয়র মুখে খানিক রক্ত আসিয়া জমিল, সে মুখ নামাইয়া সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "এক আত্মীয়কে দিতে হবে।"

খগেনবাবু বলিলেন, "এখানকার জন্য নয়?" তাঁহার মুখের কঠিন রেখাগুলি নিমেষে মিলাইয়া গেল। প্রসন্নমুখে বলিলেন, "আমার দরখাস্তখানা—মনে আছে তো?"

অমিয় পাংশুমুখে বলিল, "আপনি শোনেন নি কিছু?"

খগেনবাবু বলিলেন, "কিছু কিছু কানে এসেছে বইকি, শম্ভু ওটা তোমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল, বড়বাবু সব জেনেছে—এই তো? তা দেখুন, আমরা তো চুরি-জুয়োচুরি করি নি—দু-দিন পরে জানতেন, না-হয় দু-দিন আগে জানলেন—তাতে ক'রে আপিসের নিয়মকানুনের কোন ক্ষতি হবে না।"

অমিয় বলিল, "আপনার বিরুদ্ধে উনি সায়েবের কাছে নালিশ করবেন।"

"করবেন নাকি! ভয় দেখিয়েছেন—?" বলিয়া খগেনবাবু কর্কশ হাস্যে ঘর ফাটাইয়া ফেলিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন, "আপনারা

নূতন লোক, জানেন না, এই নিয়ে ক-বার আমার বিরুদ্ধে নালিশ হবে বড়বাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন। সাক্ষী দেবার লোকের অভাবও হয় না, মিথ্যা কথা বলতেও ওদের বাধে না—তবু মাথার এক গাছি চুলও তো আমার ছিঁড়তে পারেন নি! নালিশ! অমন নালিশ আপিসে ঢুকে অবধি দেখছি। সায়েবরা ঘাস খায় না, বোঝে কিছু কিছু।”

অমিয়র মন হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। যাক্, তাহা হইলে অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি আর হইবে না।

খগেনবাবু বলিলেন, “আমার দরখাস্তখানার কি হ’ল?”

অমিয় বলিল, “সেটি শম্ভুবাবু নিয়ে বড়বাবুর কাছে দিয়েছেন।”

এমন সময় অমলবাবু ওরফে দাদা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র খগেনবাবু টেবিল চাপড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “এই যে এসেছেন। ওঁর জন্যে আমরা মরছি ভেবে, আর উনি দিব্যি ডুব মেরে ব’সে আছেন? ডুব মেরেছিলে কেন চাঁদ, তোমার গরুর বিয়ে—না বেড়ালের সাধ ছিল?”

দাদা হাসিয়া বলিলেন, “বেশী ছুটি নিই ব’লে সায়েব পর্যন্ত আমার ওই বদনাম রটিয়েছেন। জানই তো তোমার বৌদিদি চিররুগ্ন—”

খগেনবাবু বলিলেন, “একটি বউ ছিল তার দোহাই দিয়ে বছরে ন-মাস তো আপিসকে কলা দেখাচ্ছ! বলি নিজের ভালমন্দ-জ্ঞান কিছু আছে?”

দাদা কপালে হাত দিয়া পুনরায় মৃদু হাস্য করিলেন।

খগেনবাবু বলিলেন, “তোমার রোগ বুঝেছি। ‘চাল নেই চুলো, ঢেঁকি নেই কুলো,’ দুটো কাচ্চাবাচ্চা হয় নি—কাজেই ভাবছ, চাকরি ছাড়লেও কষ্ট হবে না। কিন্তু ন্যায্য দাবি ছাড়লে কপালে অশেষ দুর্গতি। এস এ-ঘরে—অনেক কথা আছে।”

দাদাকে টানিয়া লইয়া খগেনবাবু কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

অমিয় টেবিলের তলায় ডাঁটা ও মানকচু রাখিবামাত্র শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "গাছের ডাঁটা বুঝি ? বেশ সুন্দর জিনিষ—চেহারাই আলাদা ! আর আমরা কলকাতায় চিবিয়ে মরি সাত-বাসি শুকনো খাড়া ।"

অমিয় কোন উত্তর না দিয়া ড্রয়ার খুলিয়া কলম বাহির করিল ।

শম্ভুচন্দ্র একটু থামিয়া বলিলেন, "রাগ করেছেন আমার উপর—সেদিন দরখাস্তখানা পকেট থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলাম ব'লে ? তা বলুন, নিজের জীবন-মরণের সমস্যা যেখানে, সেখানে কেউ কি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে ?"

তথাপি অমিয় মুখ খুলিল না ।

শম্ভুচন্দ্র পকেট হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নিন্ আপনার দরখাস্ত । বড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সায়েবের কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট করেন, খগেনকে চিরজীবনের জন্য কন্‌ডেম্ ক'রে রাখেন । আমি তাঁর হাতে ধরে বারণ করেছি, বললুম, করুক না ওরা দরখাস্ত—আমার ন্যায্য পাওনা হ'লে আমি পাবই । ভগবান যদি সত্যি থাকেন—"

অমিয় ঈষৎ উষ্ণ-কণ্ঠে বলিল, "ভগবান বেচারাকে আর এর মধ্যে টেনে আনছেন কেন, মানুষের কথাই বলুন ।"

শম্ভুচন্দ্র ঈষৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "আমরা দুর্ব্বল মানুষ ব'লেই ভগবানকে মানি । ভাল লেখাপড়া জানি না—তাই ওঁকে বিশ্বাস করি । একটি কথা জেনে রাখবেন অমিয় বাবু, বড়দের বিরুদ্ধে মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে মনের শান্তি নষ্ট করা উচিত নয় । যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের ন্যায্য পাওনা আপনাকে দিতেই হবে ।"

অমিয় বলিল, "বড়দের সম্মান দেওয়া যেমন উচিত, খোসামোদ করাও তেমনই অন্যায় ।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কে বললে আপনাকে এ-কথা ? বড়বাবু যদি

বলেন, অমিয়বাবু, আপনি আজ মেসিন-রুমে কাজ করুন—সে হুকুম মানা মানে কি খোসামোদ? যদি বলেন, ঐ লেজারখানা আনুন তো, সেটা এনে দিলেই কি আপনি খোসামুদে হয়ে গেলেন? ঐ ডাঁটা দু-গাছি যদি বড়বাবুকে দেন—সে ভক্তির দেওয়াকে আপনি খোসামোদ বলতে পারেন না।"

"কি ভক্তিতত্ত্বের কথা হচ্ছে শম্ভু ভাই?" বলিতে বলিতে দাদা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন।

শম্ভুচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বেশ আছেন আপনি, এক দিন আপিস, তিন দিন কামাই!"

দাদা বলিলেন, "আর ভাই, যে ক'টা দিন আছি এমনি সুখেদুঃখে কেটে গেলেই ভাল। কি অমিয় ভাই, ভাল তো?"

দাদা আসন গ্রহণ করিয়া ঝাড়নের মোড়ক খুলিয়া পানের ডিবাগুলি বাহির করিলেন এবং শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাই, পান খাও।"

শম্ভুচন্দ্র পান মুখে দিয়া বলিলেন, "একটা গ্রেড্ খালি হচ্ছে—শুনলুম আপনি দরখাস্ত করেছেন?"

দাদা বলিলেন, "গেল সপ্তাহে বলতে গেলে আমি আপিসেই আসি নি—অথচ তুমি শুনলে?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আপনার বন্ধুরা আছেন তো। তা আপনার পক্ষে সেই পোষ্টে কাজ করা কতটা সম্ভব হবে জানি না। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডেস্প্যাচ করতে হবে, হাড়ভাঙা গাধার খাটুনি।"

দাদা পরম বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বল কি শম্ভু ভাই, গাধার খাটুনি! তা আমি পারব কেন—আমি মানুষ তো!"

শম্ভুচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলুম। যে সুখী মানুষ

দাদা, ও খাটুনি কি সহ্য হবে? কিন্তু সিনিয়র আপনি—আপনাকেই গ্রেড নিতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি যদি সিনিয়রিটির ক্লেম ত্যাগ করি, ভায়া?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "শুধু মুখে ত্যাগ করলে হবে না তো, লিখে দিতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "তাই দেব। যদি ঐ ডেস্‌প্যাচের থ্রু দিয়ে না গেলে গ্রেড না পাওয়া যায়—ক্লেম আমি ত্যাগই করব। বুড়ো হয়েছি, অত খাটতে পারব না।"

আনন্দে শম্ভুচন্দ্রের দুটি চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "আর একটা পান দিন তো, একটু দোক্তা খাবার ইচ্ছে হ'ল।"

পান-দোক্তা মুখে দিয়া আর একবার দাদাকে পরিশ্রমজনক উচ্চ পদটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শম্ভুচন্দ্র চেয়ার গ্রহণ করিলেন।

দাদা 'তারা তারা' বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিন কয়েক পরে অমলবাবু ওরফে দাদা আপিসে আসিতেই খগেনবাবু কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওয়ার্থলেস কোথাকার। নিজের ক্লেম লিখে পড়ে ছেড়ে দিলে? ওয়ার্থলেস।"

দাদা মুখ নামাইয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ গাধার খাটুনি খাটতে পারব না ভাই।"

খগেনবাবু মুখ ভেঙচাইয়া বলিলেন, "আহা—মরে যাই! আপিসে ওঁকে কুলোয় শুইয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়াবে! গ্রেডটা পেলেই কি তোমাকে ডেস্‌প্যাচ টেবিলে জবাই করা হ'ত?"

দাদা বলিলেন, "তাই তো শুনলাম। ডেস্‌প্যাচার না হ'লে ও পোষ্ট পাব না।"

খগেনবাবু বলিলেন, "না, পাবে না ? বড়বাবুর মাইনে বেড়েছিল কি ডেস্‌প্যাচার হয়ে ? ও একটা কৌশল—তোমাকে কন্‌ডেম্ করার একটা কৌশল। ভাল কথা, মুখে বলেছিলে বলেছিলে, সাত-তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে দেবার দরকার কি ছিল ?"

দাদা বলিলেন, "আর ভাই, যে ক'টা দিন আছি, শান্তিতে থাকতে চাই।"

খগেনবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাদার উপর যে-সব তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিলে অতি শীতল রক্তপ্রবাহও উষ্ণ হইয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। দাদার হাসিমুখের মধ্যে কিন্তু উষ্ণতার ছায়ামাত্র দেখা গেল না। পঁচিশ বৎসর কলম চালাইয়া ও চেয়ারে বসিয়া হয়তো তিনি গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মটিকে উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন ; তাই, সুখে দুঃখে সমান ঔদাসীন্য তাঁহার ! তিনি খগেনবাবুর তীব্র মন্তব্যে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাঁহাকে পান-জরদা পাঠাইয়া দিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া পান দিলেন এবং খাতা খুলিয়া কাজে মনোনিবেশ করিলেন। জীবন-ধারণের সমস্যা তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে নাই বলিয়াই বুঝি এতবড় ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলেন না।

অতঃপর নিত্যহরি দেখা দিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথায় টাক, চক্ষে নিকেল ফ্রেমের কমদামী চশমা, সার্টের কাঁধ ছেঁড়া এবং পায়ের জুতায় কয়েকটি তালি। ছাপোষা মানুষ—যে মাহিনা তিনি পান তাহাতে সংসার চলে না—আপিসের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, কোঅপারেটিভ ইত্যাদির ঋণ শোধ দিয়া মাহিনার অর্দ্ধেক হাতে পান। খগেনবাবুকে মাসিক কিছু দেনা দিতে হয়—বড় মেয়ের বিবাহের সময় এক খানি হ্যাণ্ডনোট কাটিয়াছিলেন—আর খুচরা দেনার কথা না বলাই ভাল। আকাশের তারা ও সমুদ্রতীরের বালু যদি কেহ বা গণিবার চেষ্টা করেন, তিনিও সভয়ে নিত্যহরির দেনার তালিকাটি পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন।

নিত্যহরি নিজেই জানেন না কতগুলি মহাজন লইয়া তাঁহার কারবার। মাসকাবারে এই সব ক্রমবর্দ্ধমান মহাজনদের আবির্ভাবের আশঙ্কায় কয়েকদিন তিনি আপিস কামাই করিতে বাধ্য হন।

নিত্যহরি দাদার টেবিলের উপর ডিবা হইতে পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিলেন, জরদা খান না বলিয়া ছোট কৌটাটির দিকে হাত বাড়াইলেন না। পানটিকে ঈষৎ আয়ত্ত করিয়া বলিলেন, "ভেবে আর কি হবে, অদৃষ্ট ছাড়া তো পথ নেই। কিনুন এক খানা রেঞ্জার্সের টিকেট—লাগে তো লাল হয়ে যাবেন।"

দাদা আগ্রহভরা কণ্ঠে বলিলেন, "নিতে হবে বৈকি। ওরা খুব বিশ্বাসী, কিন্তু আমাদের পাথর-চাপা কপালে কিছু হয় না, ভাই।"

নিত্যহরি কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া বলিলেন, "হেড আপিসের মাখন চাপরাসীর গেল বার কি হ'ল? শুনলাম বেটা পনের বছর যাবৎ টিকেট কিনে আসছিল—লেগে গেল তো।"

দাদা বলিলেন, "আমাদেরও বড় কম দিন হ'ল না, হিসেব করে দেখ তো নিত্যভায়া, বছরে আট-টাকা হ'লে কুড়ি বছরে কত হয়?"

নিত্যহরি হাসিয়া বলিলেন, "অত যদি হিসেব-জ্ঞান থাকবে তো দেনার সমুদ্রে ভাসব কেন? ঐ খগেনটাকে মাসে মাসে কত সুদ দিই জান? পাঁচ টাকা। টাকায় এক আনা সুদের সে একটি পয়সা কম নেয় না—এটাও সুদের হিসেবে ধরে রাখি।"

দাদা বলিলেন, "চাকরি যত দিন আছে, 'চান্স' তত দিন দেখব বৈকি। আশায় মানুষ বাঁচে।"

নিত্যহরি বলিলেন, "অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে তোমার চেয়ে জুনিয়র ম্যান হয়ে শম্ভুচন্দ্র গ্রেডটি পেলেন, এও অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?"

পরম অদৃষ্টবাদী দাদার মুখ এ-কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না,—লটারির খাতাখানি টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘর পূরণ করিতে লাগিলেন।

নিত্যহরি বলিলেন, "হেড আপিসের পিওনটা টাকা পাওয়ার পর থেকে রেল আপিসে এর বিক্রী বেড়ে গেছে। আর এক খানা বই আনাতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "আনিও, মোদ্দা টাকা ঠিক আদায় হয় তো ?"

নিত্যহরি বলিলেন, "অন্য দেনা দিতে যার যত অনিচ্ছে থাকুক, এর বেলায় কেউ পাই পয়সাটি ফেলে রাখে না।"

দাদার টেবিল হইতে আরও দুই জন লটারির টিকেটের গ্রাহক হইবামাত্র খাতাখানি শেষ হইয়া গেল।

নিত্যহরি খাতাখানি পকেটে পুরিয়া বলিলেন, "ওহে ফণী, রমেন, মনে থাকে যেন মাসকাবারে টাকা চাই, না হ'লে টিকেট আসতে দেরি হবে।"

বিশ্বজিৎ অমিয়র টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি নিলেন না কেন এক খানা টিকেট ?"

অমিয় বলিল, "আপনি নিয়েছেন ?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "দেখেন নি খাতাখানি, প্রথম নাম পত্তন তো আমিই করেছি।"

অমিয় বলিল, "আপনি সেদিন তো বললেন, অদৃষ্টবাদকে ঘৃণা করেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ঘৃণা নয়, অস্বীকার করি। কিন্তু অস্বীকার করলেও, টিকেট কিনতে দোষ কি। যাঁরা হিন্দু হয়ে ঈশ্বর মানেন না, তাঁরাও তো রোগে বা সঙ্কটে পড়লে চুপি চুপি মানত ক'রে বসেন। অনেকে তো ভূত মানেন না, অথচ অন্ধকার পথে চলতে চলতে গলা ফাটিয়ে গান ধরেন কেন ?"

অমিয় বলিল, "যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, বা ভূত মানেন না, তাঁরা সত্যিকারের শক্তিমান হলে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "সত্যিকারের শক্তিটাই তো হচ্ছে আসল বস্তু—যেমন আগুন। তার ত্রিসীমানায় আবর্জ্জনার স্থান নেই। কিন্তু আমরা যে সত্যের উপাসনা করি তার মধ্যে খাদ মেশানো অনেকখানি। লটারির টিকেট প্রতি বছরই কিনি, বছরে চার বার কিনি, জানি কিছু আসবে না, জেনেও কিনি, অথচ ফাঁকি জেনেও ফাঁকিকে ঠেকিয়ে রাখতে তো পারি না। আসল কথা, আমরা যে পরিমাণে দরিদ্র সেই পরিমাণে লোভী, এবং সেই পরিমাণে হিংসুক। পাঁচ জনে টিকেট কিনে যদি হঠাৎ মোটা রকমের টাকাটা মেরে দেয় এই হিংসার বশবর্ত্তী হয়েই আমরা টিকেট কেনার প্রতিযোগিতায়, ভূয়ো জেনেও, পিছুতে চাই না!"

অমিয় বলিল, "আজ যদি দাদা হঠাৎ কিছু টাকা পান ?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমার মনে হবে ভগবানের অন্যায় বিচার। ওঁর ছেলেমেয়ে নেই, ওঁর পাওয়ার দরকার নেই, আমি ছাপোষা মানুষ, আমার পাওয়াটাই উচিত ছিল। এতো তুচ্ছ লটারির টিকেট, আর একটি প্রবল নেশায় আমরা অদৃষ্ট পরীক্ষা করি, দেখেন নি শনিবার দিন ?— না, আপনি থাকেন শ্যামবাজারে, রেস-কোর্সের খবর হয়তো রাখেন না।"

অমিয় বলিল, "ওঁদের এই তো সামান্য মাইনে, সংসার চালিয়ে রেস-কোর্সের নেশায় মাতেন কি ক'রে ?"

বিশ্বজিৎ হাসিল, "সংসারটা তো গৌণ, তাকে রসাতলে পাঠিয়ে যদি রেস-কোর্সের মধ্যে বসে স্বর্গ গড়ে তোলা যায়, মন্দ কি ? অমিয়বাবু, আশ্চর্য্য হবেন না, আমরা নেহাৎ মরা জাতের কেরানী নয়। উপরে শুকনো মুখ, ছেঁড়া জামা, তালিমারা জুতো দেখে ভুল বুঝবেন না। মনের মধ্যে সখের সমুদ্র আমাদের তোলপাড় করছে ; দুঃখ তীব্র হয়ে ওঠে,

নেশার তীব্রতা তাকে না ছাপিয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ যে দম ফেটে আমরা মরে যাব।”

অমিয় বলিল, “যাঁরা রেস খেলে সংসারে দুঃখ ডেকে আনেন—”

বিশ্বজিৎ বলিল, “দুঃখ আমাদের কাছে অনিমন্ত্রিত হয়েই আসে। এবং আমরা সব দুঃখজয়ীর দল যখন-তখন যে-কোন সময়ে তাকে দেখে খুশীমনে অভ্যর্থনা করি! সে যদি বা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা আদর ক'রে তার গলা জড়িয়ে ধরি।”

“আর বলবেন না।”

“না, আর বলব না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখাবার ইচ্ছা আছে। অমিয়-বাবু, এ বড় কঠিন ঠাঁই। এই চেয়ারে ব'সে দুঃখকে যদি সজাগ ক'রে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তো ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবেন। আমাদের জ্ঞান, বিবেক, মনুষ্যত্ব—এ-সব নিয়ে বিচার করবেন না। হয়তো আমরা সত্য কথা বলবার বড়াই করি, কিন্তু বলতে ভালবাসি মিথ্যা। আমরা পরম জ্ঞানীর মত, পরম বিদ্বানের মত কথা বলি, কিন্তু ব্যবহারে পাবেন পরম মূর্খের মত আচরণ। আমরা সগর্ব্বে বলি রাজমিস্ত্রি থেকে মুসোলিনি ইটালীর কর্ণধার হয়েছেন, ষ্ট্যালিনের বা হিটলারের বংশপরিচয় খুব গৌরবজনক নয়, অথচ অর্দ্ধপৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা তাঁরা; আমাদের দেশের সামান্য ফ্যাক্টরি, সামান্য ব্যবসায় সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে আজ পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছে; অনেক দরিদ্র আছেন, যাঁদের নাম দেবতার নামের মতই আমরা প্রতিদিন বহুসময় উচ্চারণ করে থাকি—অথচ মুখের ভক্তি ছাড়া তাঁদের আমরা আর কিছু দিতে পারি না।”

“কেন পারি না?”

“পারি না, কারণ গল্প ক'রে আমরা যত আনন্দ পাই, গল্প শুনতে আমরা যত ভালবাসি, সত্যিকার বাস্তবকে ঠিক ততখানিই ভয় করি।

আমি অনায়াসে বল্‌তে পারি তুমি অমুকের মত হও কিন্তু নিজে কি হয়েছি তার বিচার করতে পছন্দ করি না। যাই হোক, আজ ছুটির পর আমার সঙ্গে যাবেন, আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

১১

ছুটির পর আপিস হইতে বাহির হইবামাত্র মনে প্রফুল্লতা আসে, যদিও অবসাদে শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহে। তখন উপরের আকাশের পানে চাহিয়া কবিত্বই বল আর চলমান জনস্রোতের ঢেউ গণিয়া সমস্যাই বল—কোনটাই ভাল লাগে না। পা দুখানি আপন ইচ্ছায় চলিতে চায়, তাই চলিতে হয়, গন্তব্য স্থান একটা জানা আছে, তাই পথ ভুল হয় না, এবং জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তেও আমরা সচেতন বলিয়া গাড়ী-চাপা পড়িয়া বিপদ বাধাইয়া বসি না। আপিস যাইবার কালে ও আপিস হইতে ফিরিবার সময় পথের দু-ধারে দেখা সাধারণ ঘটনাগুলি মনের কোণে রেখাপাত করিতে পারে না; যন্ত্র-জীবন মানুষের সমস্ত অনুভূতিকে এমনই পঙ্গু করিয়া দেয়।

অমিয়র হাত ধরিয়া বিশ্বজিৎ সেই কথাই বলিতেছিল, "এক দিন আপিস আসবার মুখে দেখলাম, শেয়ালদার মোড়ে একটা লোক মোটর-চাপা পড়ল। চার দিকে হৈ হৈ বেধে গেল। আমিও দাঁড়ালাম, কিন্তু সে এক মিনিট। পাছে লেট হয়ে যায় সেই ভয়ে ভিড় ঠেলে লোকটাকে এক বার দেখে আসতেও পারলাম না—সে মরল কি বেঁচে রইল!" একটু থামিয়া বলিল, "এ বিষয়ে প্রত্যেক মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আছে। যেখানে সেল্‌ফ ইনটারেষ্ট নেই মনের সাড়া সেখানে মেলেই না। ধরুন,

আজ আপনার কোন প্রিয়তম আত্মীয়-বিয়োগ হয়েছে, আপনি হায় হায় করছেন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে মৃত আত্মীয়ের গুণ-কীর্ত্তন ক'রে দুঃখ প্রকাশ করছেন, কিন্তু বন্ধুরা কতক্ষণ সেই দুঃখপ্রকাশকে সহ্য করতে পারেন ?"

অমিয় বলিল, "নিজের সত্যকার যে দুঃখ অন্যের কাছে প্রকাশ করলে সত্যই তার মহিমা হানি হয়।"

"কিন্তু নিজের দুঃখটাকে খুব বড় করে দেখি আমরা, কাজেই তা দিয়ে অন্যকে অভিভূত করতে চাই। অন্যের বিরক্তি জেনেও নিজের কাঙালপনা আমরা নির্লজ্জ ভাবেই প্রকাশ করি। আমার মনে হয় অমিয়-বাবু, প্রত্যেক মানুষ আলাদা জগতে বাস করে ; নিজের সুখ-দুঃখ, রুচি-আনন্দ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে তৈরি করে নেয় সেই জগৎ—অন্যের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। অথচ অন্যকে নিয়ে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা তার রীতি। আর সব সময়ে অন্যকে দারুণ অবহেলা করলেও—নিজের প্রকাশকে যেখানে মূল্যবান ক'রে তুলতে হবে, সেখানে সে পরমুখাপেক্ষী। সে পরকে চায়।"

অমিয় বলিল, "ঠিক বুঝলাম না। পরকে যখন আপন ক'রে নিই—বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "পরকে আমরা কোন সময়েই আপন করতে পারি না। আমাদের কতকগুলি সুকোমল বৃত্তির বৃন্তে ওদের ফুটতে দিই মাত্র। আমাদের দাক্ষিণ্য বা দয়ায় ওঁরা নিকটবর্ত্তী হন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখি, তার গন্ধে তৃপ্তি পাই, তাকে নিয়ে বিলাস করি, কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য জীবন বিনিময় করি, অর্থাৎ ভালবাসি।"

অমিয় বলিল, "সে ভালবাসার জন্য প্রাণও দিতে পারি—পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "মানুষ যেমন র‍্যাশন্যাল তেমনি সেন্টিমেণ্টাল। আদিম বৃত্তিকে জয় করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলে। খবরের কাগজে সবিস্ময়ে আমরা সেই অকল্পিত ঘটনা পড়ে কোলাহল তুলি!" একটু থামিয়া বলিল, "আপনার নিজের মন দিয়েই দেখুন, বাড়ীতে আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, মা আছেন, তাঁদের জন্য একটি স্নেহমিশ্রিত উৎকণ্ঠা আপনি প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগ করছেন। করছেন তো? ভাল, আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখুন—সে উৎকণ্ঠা কি সত্যই তাঁদের জন্য না আপনার দৌর্ব্বল্যের একটা প্রকাশ? তাঁদের অকুশলে আপনি ব্যথা পাবেন, যাঁদের কেন্দ্র ক'রে সুখের একটা ছবি আপনার মনে আঁকা আছে, তাঁদেরকে আপনি কেন ভালবাসলেন? কারণ আপনার আঁকা ছবিটিকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন। আপনার শরীরের বৈকল্য যেমন আপনাকে পীড়া দেয়, মনের বৈকল্যও তেমনই।"

অমিয় বিশ্বজিতের হাতে টান দিয়া বলিল, "থামান আপনার মায়াবাদ, মনকে অত্যন্ত ফাঁকা ক'রে দেয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "মায়াবাদ না থাকলে আমরা যে এক দণ্ডও টি'কতাম না অমিয়বাবু।"

গলির পর গলি পার হইয়া অমিয়রা যেখানে থামিল সেখানে তেমন ভাবের বাড়ী যে থাকিতে পারে—কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে বাস করিয়া সে-চিন্তা করা যায় না। অথচ বিশ্বজিৎ এই বাড়ীতেই থাকে। মোগল বাদশাহের আমলের পাতলা ছোট ইঁট নোনা ধরিয়া ভিত্তিমূলে ভয়ের ভ্রূকুটি দেখাইতেছে; কাঠের চৌকা গরাদ দেওয়া ছোট জানালা ও লোহার পেরেক আঁটা দুয়ার দেখিলে বাড়ীটির আভিজাত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। বাড়ীর সম্মুখের গলিটিও কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি বর্জ্জিত, কাজেই প্রকৃতিমাতার কার্পণ্যও এখানে পরিস্ফুট। কড়া

নাড়িয়া বিশ্বজিৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কয়েকটি কেরানী-পরিবার বাড়ীটির সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন।

বাড়ীওয়ালার পয়সা আছে, তিনি বালিগঞ্জের দিকে নূতন প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া বাস করেন। আয়ের সম্পত্তি হইলেও এটি সংস্কার-সম্বন্ধে অবহেলিত হইয়া আসিতেছে।

দোতলার কোণের দিকের ঘরখানি বিশ্বজিতের। গোটা দুই জানালা ঘরে আছে, তারই প্রসাদে কিঞ্চিৎ আলো ও হাওয়া আসিয়া থাকে। দিনের বেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়া কথা কহিতে হয় না; বারান্দা দরমা দিয়া ঘিরিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন প্রচুর ধোঁয়া কয়লার তোলা উনুন হইতে উঠিতে থাকে, তখন ঘরের একমাত্র দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তথাপি ঘরের কড়িকাঠ হইতে চারিদিকের দেওয়াল পর্য্যন্ত ধূমচিহ্নে চিহ্নিত। দেওয়ালে কালী-দুর্গার ছবির পাশেই বিলাতি মদের বিজ্ঞাপনী ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে, রামকৃষ্ণদেবের ছবির নীচেই জাপানী সাকুরা বিয়ারের লাস্যময়ী তরুণী ফেনায়িত গ্লাস হস্তে বিলোল ভঙ্গিতে চাহিয়া আছে। নির্ব্বাচনে বিশ্বজিতের রুচি-দ্বিধা নাই। কিনিয়া-আনা ছবির পাশে চাহিয়া-আনা ক্যালেণ্ডারকে অনায়াসে সে বসাইয়া দিয়াছে। চুণবালিখসা দেওয়ালের কুশ্রীতা যে কোন ছবির দ্বারা যতটুকু ঢাকিয়া যায়, তাহাই হয়ত শোভন।

অমিয়কে লইয়া সে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকিল। দরিদ্রের বাড়ী, এত্তেলা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, সামান্য একটুখানি কাসিলেই অন্য পক্ষকে সচেতন হইবার যথেষ্ট অবসর দেওয়া হয়।

ঘরের মধ্যে তক্তাপোষ পাতা আছে, বিছানাটা আছে এক ধারে গুটানো। এক ছবিতে রুচিবিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ থাকিলেও বিশ্বজিতের ঘরের অন্যান্য জিনিষগুলি চোখকে নিদারুণ ভাবে খোঁচা মারে না।

কিংবা গরিবের ছেলে বলিয়াই হয়ত অমিয় সেখানে বিসদৃশ কিছু ধরিতে পারিল না। বিছানা-বালিশ পরিষ্কার, ঘরের মধ্যেই বলিতে গেলে সংসার, এবং সে-সংসারে বিশৃঙ্খলা নাই। জানালার পাশে জলের কুঁজা, পরিষ্কার পানের বাটা, কাঠের জলচৌকির উপর ঝকঝকে কাঁসার বাসনগুলি পরিপাটি করিয়া সাজান। টিপয়ের উপর গোটা দুই কাঁচের গ্লাস, টাইমপিস্ ঘড়ি একটা ছোট ব্রাকেটের উপর টিক্ টিক্ করিতেছে।

বিশ্বজিৎ বলিল, "এই আমার সাম্রাজ্য।"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি। আমরা প্রত্যেকেই যখন সম্রাট—তখন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করতে হয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "একটি বাধা, সম্রাট-পত্নীর সঙ্গে হয়ত আপনার সাক্ষাৎকার হবে না।"

"কেন, তিনি কি অনুপস্থিত?"

"না, একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন তিনি উপস্থিত; কিন্তু চোখে না দেখলেও গন্ধে যেমন ফুলের অনুমান, ছোটখাট কতকগুলি ঘটনার দ্বারা বুঝছি তিনি আজ প্রজা-সন্দর্শনে যাত্রা করবেন।"

অমিয় না বুঝিয়াই হাসিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "মানে আপনাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ঐ জানালার ধারে লক্ষ্য করে দেখুন দেখি—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

"আরসি, চিরুণী, তেল—"

"ব্যস, ব্যস। ক্রীমের কৌটাটাও খোলা রয়েছে, সুতরাং বুঝতেই পারছেন অসমাপ্ত প্রসাধন নিয়েই তিনি কক্ষান্তরিত হয়েছেন—আমার কাসির শব্দে। আর এই অসময়ে প্রসাধনের মানেই, বাইরে কোথাও যাবেন।"

অমিয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আজ তাহলে উঠি, আর এক দিন আসব।"

তাহার হাত ধরিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "না, না, আপনার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। এ রাজ্যে রাজা ও রাণীতে ভাবের বৈলক্ষণ্য নেই। তাঁর সিনেমা দেখার ক্ষতি হলেও আমার শান্তিভঙ্গ হবে না। চা খান তো? চা?"

"না, কিন্তু আমার দরকার ছিল—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "এই তো প্রতারণা সুরু করলেন! দরকার আপনার লজ্জা—আর ভদ্রমহিলার সখটিকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু তার স্বামী বেচারাটির দিক দিয়ে তো দেখছেন না। যে আগুন-আগুন ভাত খেয়ে সাড়ে নটায় উর্দ্ধশ্বাসে আপিসে ছুটেছে, আর সাড়ে পাঁচটায় একদম মিইয়ে সেখান থেকে এল—সে কি প্রত্যাশা করতে পারে না তার স্ত্রীর হাতের এক কাপ গরম চা, বা তার মুখের এক টুকরো হাসি বা তার একটু সলজ্জ সেবা? আপনার স্বার্থপরতাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, অমিয়বাবু।"

অমিয় বলিল, "আমার স্বার্থপরতা!"

"ওই হ'ল—আপনাকে সামনে রেখে আর কাকেও তা বলতে পারি।"

নেপথ্যে শাড়ীর খস্‌খসানি ও চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজটা হঠাৎ তীব্র হইয়া উঠিল। বিশ্বজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিলেও কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

বিশ্বজিতের হাসি থামিলে দেখা গেল, বছরখানেকের একটি খোকা হামা টানিয়া ঘরের মেঝের খানিকটা আসিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল এবং তারস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বজিৎ তক্তাপোষ হইতে উঠিয়া আসিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল ও ছেলে-ভোলানোর মত তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "চুপ, চুপ, কাঁদেনা—

খোকা আমাদের সোনা
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দোনা।"

অমিয় বলিল, "ছেলে-ভোলানো ছড়াও জানেন দেখছি?"

বিশ্বজিৎ বলিল. "জানি বৈকি, না জানলে চলে না। কিন্তু নেপথ্য-চারিণীর রাগটা অহেতুক, আমার উপর ছেলেটিকে লেলিয়ে দিয়ে মনে করলেন—মস্তবড় একটা সৎকার্য্য করলাম। আমি হয়ত খোকাকে থামাতে পারব না বা একটিও ছেলে-ভোলানো ছড়া মুখস্থ বলতে পারব না! আর একটা ছড়া শুনবি খোকা?" বলিয়া ছেলেকে দোলা দিতে দিতে বিশ্বজিৎ আরম্ভ করিল:

ওপারেতে জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে
গুয়ো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই-ঢাই গলা করে কাঠ
কতক্ষণে যাব রে ভাই দিগনগরের মাঠ।
দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে লেগেছে,
চিকন চিকন চুলগুলি তা'র ঝাড়তে লেগেছে,
হাতে তা'র দেব শাঁখা নেপ লেগেছে,
পরণে তা'র ডুরে সাড়ী উড়ে পড়েছে,
টিয়ের মার বিয়ে
লাল গামছা দিয়ে
ঢ্যামকুড়াকুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙায় ঘর।

নেপথ্য হইতে পুনরায় খিল খিল হাস্যধ্বনি উঠিল।

বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে বলিল, "ছড়া ভুল হোক আর বাদই পড়ুক খোকা কিন্তু ঘুমোল। এরা সত্যই দেবশিশু, ছন্দের অমিল বা কথার মানে অথবা উপমার অসামঞ্জস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, সুরটুকু কানে গেলেই যথেষ্ট।"

এক হাতে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বজিৎ অন্য হাতে ছোট দু-খানি কাঁথা ও ছোট একটি বালিশ পাতিয়া অতি সন্তর্পণে খোকাকে তাহার উপর শোয়াইল এবং মৃদু মৃদু চাপড় দিয়া ঘুমটিকে তাহার গাঢ় করিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া হাসিল।

অমিয় মুগ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বজিতের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে ছেলেটি যেন পরম ঐশ্বর্য্য! ওর তুলতুলে নরম গাল দুটিতে সারাক্ষণই চাপড় মারিতে ইচ্ছা হয়—পাতলা ঠোঁট দুখানি চুমায় ভরিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে মন উৎসুক হয়।

বিশ্বজিৎ বলিল, "ভাবছেন ছেলেটি তো বেশ!"

অমিয় বলিল, "ছেলে আপনার যে রকম রাগ ক'রে মাটিতে এসে শুয়েছিল তাতে মনে হয় দুষ্টু আর চালাক হবে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ওর দুষ্টুমি আর চালাকি শেষ পর্য্যন্ত একটা কেরানীগিরি পেলে হয়তো সার্থক হবে।"

"আপনার ছেলে যে কেরানীই হবে তার মানে কি?"

"বটগাছের বীজে যে বটগাছই হয় এ তো ধ্রুব সত্য। আমার কাছ থেকে ও কি শিক্ষা আশা করতে পারে? চাকরির পক্ষে যতটুকু দরকার—তাই দিতেই আমার প্রাণান্ত হবে হয়ত।"

"তা হলে ছেলের কথা ভেবে আপনি এখন থেকেই চিন্তিত হয়েছেন, বলুন?"

"তা হয়েছি বৈকি, নিজের দায়িত্বে ওকে সংসারে এনেছি, ওকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত আমার চিন্তার শেষ কোথায়?"

অমিয় বলিল, "তবু এ-চিন্তায় সুখ আছে।"

"তা আছে স্বীকার করি। দুঃখের অন্ধকারে এরা প্রদীপেব আলো—মানুষকে পথভ্রান্ত হ'তে দেয় না।"

এই মুহূর্ত্তে অমিয়র বীরেনের কথা মনে পড়িল। দরিদ্রের বিবাহকে সে রীতিমত মহাপাপ বলিয়া মনে করে। হয়ত তার মনের অদম্য তেজে শারীরধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিবার দুঃসাহস সে সঞ্চয় করিয়াছে। সম্মুখে কোন একটি ধ্রুব লক্ষ্যে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ। সংসার সম্বন্ধে যে মনগুলি অত্যন্ত মমতাবদ্ধ, জগতের সীমা রেখা টানিয়া যাহারা নীড়ের মধ্যে শান্তির লূতাতন্তু-জাল বুনিতে ভালবাসে তাহাদের পক্ষে বীরেনের মতানুবর্ত্তী হওয়ার চেয়ে আত্মঘাতী হওয়া সহজ। ইচ্ছা করিয়াই অমিয় বীরেনের প্রসঙ্গ তুলিল না। বিশ্বজিতের সবল মনের এই দুর্ব্বল মমতাটুকু তাহারই পরম ক্ষণের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতেছিল। তর্কের উত্তাল ঢেউয়ে এমন স্বপ্নমোহময় কিরণটুকু ভাঙিয়া দিয়া কি-ই বা লাভ!

অবশেষে বারান্দার ও-পাশে ষ্টোভের গর্জ্জন শোনা গেল, বিশ্বজিৎও কয়েকবার বাহিরে গিয়া কি সব তদারক করিল। ফলে মিনিট কয়েকের মধ্যে কিছু গরম শিঙাড়া ও জিলাপীর সঙ্গে পেয়ালা-দুই চা লইয়া বিশ্বজিতের স্ত্রী-ই ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছোট ট্রের উপর খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ নামাইয়া তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

অমিয় বলিল, "এত আয়োজন করলেন কেন?"

বিশ্বজিৎ একখানা শিঙাড়া হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি আয়োজন বেশী নয়, এবং আপনার অতিথি হ'লে আপনিও এটুকু করতেন। তর্ক করবেন না, জিনিষের সদ্ব্যবহার করুন।"

বলিয়া শিড়াড়ায় কামড় দিল। অগত্যা অমিয়কে বিশ্বজিতের পন্থা অনুসরণ করিতে হইল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রী আপনার সামনে বেরিয়ে কথা কইলেন না বা একটি মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে খাবার জন্য অনুরোধ করলেন না, এটি হয়ত আপনার চোখে কিছু বিসদৃশ ঠেকল।"

অমিয় বলিল, "সম্পূর্ণ অপরিচিতের সামনে এক মুহূর্ত্তে প্রগল্‌ভা হওয়া আমাদের বাড়ীতেও বিধান নেই। আমরা পাড়াগাঁয়ে বাস করি। সমাজ-ধর্ম্মের প্রবল শাসন গ্রাহ্য না করলেও শৃঙ্খলা কিছু কিছু মানি। লজ্জার বাহুল্য মনকে পীড়া দিলেও, শালীনতা প্রকাশে মন ক্ষুণ্ণ হয় না। ওঁদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিতে হয় না, নিজেদের সহজাত সংস্কার-বলে সকলের সঙ্গেই ওঁরা মানিয়ে চলতে পারেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমার সন্দেহ হয়, বি-এ পাস করলেও আপনি সত্যকারের প্রগতিমূলক শিক্ষা হয়ত লাভ করেন নি! আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেও অল্প মাইনের চাকর্যে, কোন প্রেসে কাজ করেন। অথচ দেখুন নিত্য সন্ধ্যা বেলায় কোন পার্কে হাওয়া না খেলে ওঁদের মন সুস্থ থাকে না।"

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "এ-বাড়ীতে ক-ঘর আপনার থাকেন?"

"আট ঘর। বাড়ীখানার সঙ্গে আমাদের মিলও চমৎকার। তাই নানান্ অসুবিধা সত্ত্বেও ছাড়তে পারি নি।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "স্বাস্থ্য আমাদের বিমাতা। যা মাইনে পাই তাতে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকা চলে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব আলোচনা পাগলামি। ও কি, উঠলেন যে!"

"শ্যামবাজার পাড়ি দিতে হবে—রাস্তা অনেকখানি।"

"বাসা বদলে নিকটে আস্থন না কেন?"

"মনে করেছি মাইনে পেলে একটা সস্তার মেস্-টেস্ দেখে নেব। হাঁটার জন্য নয়, অপরের গলগ্রহ হয়ে আর কত দিন থাকব বলুন?"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বারান্দায় আসিল।

অমিয় দেখিল, বারান্দার ও-পাশে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছে। মৃদু-পুষ্পসারসৌরভে বারান্দা আমোদিত। অমিয়র কাসির শব্দ পাইয়া মেয়েটি হিল-উঁচু জুতার খুট্ খুট্ শব্দ তুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং সেখান হইতে স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "ন-টার শো-টাও মিস্ করতে চাও? তা হবে না।"

বিশ্বজিৎ ও অমিয় সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "ওঁর স্বামীই প্রেসে কাজ করেন।"

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখানে?"

ফণীবাবু ম্লান হাস্যে বলিলেন, "আমি এই বাড়ীতেই থাকি। তা আপনি···ও, বিশ্বজিৎবাবুর কাছে এসেছিলেন।"

অমিয় বলিল, "আপনার আপিস থেকে ফিরতে এত দেরি হ'ল যে?"

মাথা নামাইয়া ফণীবাবু বলিলেন, "অন্য জায়গায় একটু কাজ সেরে আসতে দেরি হয়। আজ বোধ হয় একটু সকাল সকাল ফিরেছি।" বলিয়া ফণীবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অমিয় বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিল, "ওঁর সম্বন্ধে সেক্সানে যা শুনি—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "সবাই বলেন উনি বড়বাবুর গুপ্তচর? বড়বাবু সম্বন্ধে, আপিস সম্বন্ধে, সায়েব সম্বন্ধে বা কাজ সম্বন্ধে যা কিছু কেউ আলোচনা করেন উনি তা বড়বাবুর কানে তুলে দেন—এই তো?"

"হ্যাঁ, এ-সব বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না!"

"There are more things, অমিয়বাবু; বিশ্বাস করুন চাই না করুন কথাটা মিথ্যে নয়।"

"বলেন কি?"

"হ্যাঁ, একটা কথা জানবেন আমরা যা শিক্ষালাভ করি—তা আমাদের ছদ্মবেশকেই সাহায্য করে মাত্র, আমাদের জ্ঞানের পথকে প্রশস্ততর করে না। আর বড়বাবুর কানে সব কথা তুলে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়াটাকে খুব সুখের মনে করবেন না। আচ্ছা, নমস্কার।"

অমিয়কে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া বিশ্বজিৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অমিয় যে বিশ্বজিতের বাড়ী গিয়াছিল, সে-কথা পরদিনই আপিসময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।

শম্ভুচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুনলুম তুমি কবিত্ব আলোচনা করছ? কবির সঙ্গে বন্ধু পাতিয়েছ?"

অমিয় বিস্মিত স্বরে বলিল, "কবি কে?"

শম্ভুচন্দ্র চোখ নাচাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চেহারা দেখে অনুমান করে নাও, আমাদের মত কালো পাকাটে চেহারায় কি কবিত্বের ফুল ফোটে? ওই দেখ—লম্বা, কোঁকড়া চুল, গৌরবর্ণ ফুটফুটে যে মানুষটি—"

বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া অমিয় একটু হাসিল।

সুতরাং বড়বাবুও সে-কথা শুনিলেন।

অমিয়কে একান্তে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "শুন্‌লুম, আপনি কাজে আজকাল বড্ড ভুল করছেন। আপিসে কাজের চেয়ে গল্প করেন বেশী। সাবধান ক'রে দিচ্ছি—"

অমিয় ফিরিতেছিল—তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেক্‌সনে কে কেমন লোক, ছেলেমানুষ আপনি, এখনও চেনেন নি। যদি ঠিক মত অফিস ডিউটি করতে চান যার তার সঙ্গে মিশবেন না। ভাল কথা, খগেনবাবু দরখাস্তখানা পেয়ে কি বললেন?"

অমিয় এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিছুই বলেন নি।"

বড়বাবু বক্রদৃষ্টিতে অমিয়র মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? তবে তো দেখছি খগেনবাবু আজকাল বাক্‌সংযম আরম্ভ করেছেন! আচ্ছা যান।"

অমিয় চেয়ারে আসিয়া বসিল, কাজে তাহার মন লাগিতেছিল না। আপিসের হাওয়া মনে হইতেছে নিশ্বাস লইবার পক্ষে অত্যন্ত ভারি। ভিতরে ভিতরে কিসের যেন ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

টিফিনের সময় অমিয় মাঠের ধারে লৌহবৃতির উপর পা রাখিয়া মধ্যাহ্নের আকাশে চিলের চক্রভ্রমণ দেখিতেছিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে ফণীবাবু তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমার একটা কথা শুনবেন?"

অমিয় তাঁহার পানে চাহিল।

অমিয়র মুখের পানে না চাহিয়া ফণীবাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনি হয়ত ভাবছেন আমি আপিসময় ব'লে বেড়িয়েছি আপনি বিশ্বজিতের

অমিয় বলিল, “এ যেন সেই চোরকে প্রশ্ন করার মত কৈফিয়ৎ, ফণীবাবু।”

ফণীবাবু অন্য দিকে চাহিয়াই বলিলেন, “কতকগুলি লোককে বড়-বাবু চিরকাল সন্দেহ করে আস্‌ছেন, আপনি নতুন লোক হয়ত জানেন না—তাঁদের সঙ্গে না মেশাই ভাল।”

“তাই নাকি ? সে চিহ্নিত লোকগুলির নাম ?”

“আপনি ঠাট্টা মনে করছেন, কিন্তু চাকরি করতে এসে বড়দের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কত ক্ষণ চলা যায় বলুন ? ওঁরা যদি ইচ্ছা করেন, আপনার ভুল বেরুবে অসংখ্য এবং চাকরির দফাও দু-দিনে গয়া।”

অমিয় কোন কথা কহিল না।

ফণীবাবু বলিতে লাগিলেন, “ওই খগেনবাবু, বড়বাবুর সঙ্গে ছিলেন এক গ্রেডে, কাজ দেখিয়ে ইনি উঠলেন ওপরের গ্রেডে, ওঁর হ'ল হিংসে। চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি যে আলাদা, সে-কথা যাঁরা বোঝেন তাঁরাই উন্নতি লাভ করেন। সায়েবের বাড়ী ফুলের তোড়া পাঠানই বলুন, সেক্‌সন সম্বন্ধে কোন গুপ্তকথা উপর-ওয়ালার কানে তোলাই বলুন—দু-কলম লেখার চেয়ে ও কৃতিত্বগুলিও কম নয়।”

“তাই নাকি ? আপনি নিশ্চয়ই ও-গুলির অনুশীলন করেন ?”

“করি বৈকি অমিয়বাবু। লেখাপড়া শিখি নি—বামুনের ছেলে—এ-চাকরিটি খোয়ালে আর কোথাও পাঁচ টাকা মাইনের একটা জুটিয়ে নিতে পারব না, কাজে কাজেই সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। আর যিনি অন্নদাতা, তাঁর আপিসেরই খবর যদি তাঁকে জানাই, সেটা কি আমার পক্ষে এতই ঘৃণ্য কাজ ?”

অমিয় সবিস্ময়ে ফণীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাঁহার

দু-ফোঁটা জল। সত্যই কি অন্নদাতার প্রতি ফণীবাবুর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন ঐ দু-ফোঁটা জল, না ভাববিলাসিতার দুর্ব্বল প্রকাশ ?

সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ফণীবাবু, আপনি বুঝতে পারেন সবাই এ-কাজের জন্য আপনাকে ঘৃণা করেন ?"

ফণীবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঘৃণা করেন ? কেন ? তাঁরা যা করেন আমিও তো তাই করি।"

"সকলেই কি—"

"ওই খগেনবাবুর কথা ধরুন—আমাদের সামনে তো হেন করেগা তেন করেগা—যত লাফালাফি ; বড়বাবু কটমটিয়ে একবার চাইলে মাথা তুলতে পারেন ?···শুনেছেন একটা কথা।"

"কি ?"

"গেল বছর থেকে রেলের আয় কমে গেছে, শীঘ্রই রিট্রেঞ্চমেণ্ট সুরু হবে। হয় কেরানীদের কম মাইনে নিয়ে কাজ করতে হবে, নয় লোক-ছাঁটাই হবে।"

"কোন্‌টা সম্ভব মনে করেন ?"

"কি জানি অফিসারদের মর্জ্জি ? কমতে লোকই কমবে, মাইনে হয়ত কমবে না।"

"কেন ?"

"কেন আবার—বড় বড় সায়েবরা কি কম মাইনে নিয়ে কাজ করবেন ? তা আর করতে হয় না।"

"তবে কি রকম ছাঁটাই হবে ?"

"কাজের লোক দেখে।"

"কে কাজের লোক কে বা অকাজের ঠিক করবেন কে ?"

"যাঁরা চিরকাল ঠিক করেন, তাঁরাই করবেন। সেক্‌সানের যাঁরা ইন্‌-চার্জ্জ তাঁদের মতামত নিয়েই উপরওয়ালারা কাজ করেন চিরকাল। তাই বলছি, চাকরিটি বজায় রাখতে চান তো ওদের দলে ভিড়বেন না।"

"কিন্তু দলের কারও নাম তো আপনি করলেন না।"

"আপনি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই বুঝেছেন।—তবু শুনে রাখুন, ঐ খগেনবাবুর ত্রিসীমানায় যাবেন না, দাদার মুখখানি মিষ্টি কিন্তু অন্তরে জিলিপির প্যাঁচ। ওই শান্তি, রমেন—এমন কি বিশ্বজিতের সঙ্গে—"

অমিয় বলিল, "কিন্তু আপনি তো বিশ্বজিতের সঙ্গে এক বাসায় থাকেন, বড়বাবু কিছু বলেন না ?"

"বলেন না আবার, দু-বেলা ধমকান। কিন্তু উপায় কি বলুন, অত কম ভাড়ায় বাড়ী কোথায় পাই বলুন তো ? অবশ্য বড়বাবু মাঝে মাঝে বলেন যে তাঁর বাড়ী গিয়ে সস্ত্রীক থাকতে, কিন্তু কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।"

"বেশ তো, ভাড়া লাগবে না।"

"ভাড়ার কথা নয়, অমিয়বাবু।···আচ্ছা, আচ্ছা, এক দিন আপনাকে বলব সব কথা, তখন বুঝবেন সব।"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া টিফিনের ঘণ্টা পড়িল। অমিয়র পাশে চলিতে চলিতে ফণীবাবু চুপি চুপি মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে যে এত কথা বললাম, খবর্দ্দার, বড়বাবু যেন তার বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারেন।"

"কেন, আমি তো শত্রুদলের নই।" বলিয়া অমিয় হাসিল।

ফণীবাবু বলিলেন, "না, না, তা বলছি নে। তবে, তবে কি জানেন, বড়বাবু শিক্ষিত লোক মাত্রকেই বিশ্বাস করেন না—একটু ইয়ের চক্ষে দেখেন। তা আপনার সম্বন্ধে কোন ভয় নেই, একটু বড়বাবুকে ইয়ে

করে চলবেন ; এই যা বলবেন, শুনবেন, তর্ক করবেন না। ধরুন কোন ইংরেজি নোট যদি ভুল দেন তো করেক্ট ক'রে দেবেন, এই আর কি।"

টিফিনের ঘণ্টা পড়িলেও দাদার টেবিল ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক বসিয়াছিলেন এবং লোক-ছাঁটাইয়ের আলোচনা হইতেছিল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদে কেরানী-মহলে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

শান্তি বলিতেছিল, "ভারি তো চাকরি, তালপাতার ছাউনি! ঢুকে অবধি শুনছি, গেল, গেল। আজ পাঁচ বছর ধরে শুনছি মশাই।"

রাজেন উত্তর দিল, "যাই হোক, একে তো এতেই সংসার চলে না, কম মাইনেয়—"

খগেনবাবু বলিলেন,"যখন কম মাইনে পেতেন তখন চলত কি করে?"

রাজেন বলিল, "ধার, স্রেফ ধার।"

খগেনবাবু বলিলেন, "এখনও মাইনে বেড়ে ধার তো কমে নি। ও রেলওয়ে বোর্ডই করুন, আর এসোসিয়েশনের থ্রু দিয়ে ভাইস্‌রয় অবধি যান, ফল কিছুই হবে না। যাঁরা কাজ করব না বলে ভয় দেখাচ্ছেন তাঁরাই তখন সোনা হেন মুখ করে দশটা-পাঁচটা বজায় রাখবেন। এ. বি. রেলের ষ্ট্রাইকের কথা এত শীঘ্র ভুলে গেলেন?"

শান্তি বলিল, "আমরা যে হয়েছি হ্যাংলা, যেন চাকরি ছাড়া আর গতি নেই! এক জন কাজ ছেড়েছে কি হাজার জন হাঁ ক'রে কলম উঁচিয়ে ব'সে আছে।"

দাদা বলিলেন, "তাই তো চুপচাপ থাকি ভায়া। আজ যদি হঠাৎ আদ্দেক মাইনে করে দেয় তা হলেও মরতে মরতে এখানে হাজিরা দিতে হবে, কাজেও মনোযোগ কম করলে চলবে না।"

শান্তি একটু রুক্ষ-কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের মত বুড়োদেরই চাকরিতে অসীম মায়া। নিজের যোগ্যতায় আপনাদের আস্থা নেই।"

দাদা উত্তর না দিয়া হাসিলেন। খগেনবাবু কিন্তু পরুষ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মানে? আপনারা ছোকরারা চাকরির কেয়ার করেন না? দেখলুম অনেক মশায়, ইউনিভার্সিটির অনেক ডিগ্রিধারী এই ফ্যানের তলায় ব'সে মিইয়ে গেলেন।"

শান্তি বলিল, "অন্যের কথা জানি না। কিন্তু মাইনে কমালে বা চাকরি ছাড়িয়ে দিলে লড়ব শেষ অবধি! হয় এস্পার, না হয় ওস্পার।"

টেবিল চাপড়াইয়া খগেনবাবু বলিলেন, "দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় মরে।"

দাদা একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওঠ, ওঠ সব, অনেকক্ষণ ছুটো বেজে গেছে। ঐ দেখ ফাইল হাতে করে চাপরাশী ফিরে এল—বড়বাবুও ওর পেছনে পেছনে আসছেন হয়ত।"

বলা বাহুল্য মুহূর্ত্তে বৈঠক ভাঙিয়া গেল। শান্তির আস্ফালনবাক্যে মুখগুলি কাহারও প্রফুল্ল বোধ হইল না—ভাবী অমঙ্গলের গাঢ় কালিমাতে সেগুলি অন্ধকার হইয়াই রহিল।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই ফণীবাবু একখানা কেসবোর্ড হাতে করিয়া অমিয়র টেবিলের সম্মুখে দেখা দিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার মুখে আপনার সুখ্যাতি শুনে বড়বাবু বলিলেন, আচ্ছা, এই কেসটা ষ্টাডি ক'রে ওঁকে একটা নোট দিতে বল তো, দেখি তোমার কেমন গ্রাজুয়েট। বড়বাবুর নোটটাও ওর সঙ্গে আছে, ইচ্ছে করলে ওটাও দেখতে পারেন।"

ফাইল রাখিয়া ফণীবাবু চলিয়া গেলেন।

দাদা উঁকি মারিয়া বলিলেন, "কিসের ফাইল হে অমিয় ভায়া?"

অমিয় বলিল, "কি একটা ভুল—"

দাদা শশব্যস্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া অমিয়র পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন

—মুখে তাঁহার আতঙ্ক পরিস্ফুট। শুষ্ক-কণ্ঠে বলিলেন, "আমার ভুল নয় ত? একে তো দশটা ওয়ার্ণিং অফেন্স-বইয়ে নোট করা আছে, এইটে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।"

অমিয় খানিকটা পড়িয়া বলিল, "না, আপনার ভুল নয়, শান্তিবাবুর নাম দেখছি।"

দাদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "যাক, বাঁচা গেল।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "কিন্তু ওঁরও শাস্তি হ'তে পারে তো?"

দাদা হাসিমুখে বলিলেন, "শাস্তি তো হবেই, বেচারার ইন্‌ক্রিমেণ্ট হয়ত শেষ অবধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

"এই সামান্য ভুলে এত গুরু শাস্তি হতে পারে?"

দাদা গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "লঘু ভুলের নোট যদি গুরু ক'রে দেওয়া যায়, তবে সায়েবরা এর গুরুত্ব বুঝবেন না কেন, ভায়া? সবই নোট দেবার উপর নির্ভর করে।"

অমিয় বলিল, "আমাদের বড়বাবু কি সবই এই রকম নোট দেন?"

দাদা চারিদিকে আর এক বার সন্তর্পণে চাহিয়া তেমনই নীচু গলায় বলিলেন, "ব্যক্তিবিশেষে নোটের চেহারা বদলায়। তোমরা বুদ্ধিমান, বিদ্বান, এই দশ-বারো দিনেও এখানকার হালচাল বুঝতে পার নি, ভায়া?"

এমন সময় ফণী আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই দাদা হাস্যমুখে বলিলেন, "বড়বাবু তো আমাদের বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ করেন, কিন্তু সায়েব বড় সুবিধের নয়। এসো ফণীভায়া, পান খাবে এস।"

অমিয় ফাইল খুলিয়া ব্যাপারটি আগাগোড়া পড়িয়া লইল। সত্য কথা, আপিসের কেস প্রবেশিকার পরীক্ষা পত্র নহে, ব্যাকরণ বা বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিবার সতর্কতাও কেহ উপলব্ধি করেন না, কোন রকমে অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজি লেখার এ

দুর্দ্দশা অমিয়কে অত্যন্ত আঘাত করিল। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ত্তার সম্বন্ধ নাই, বানানে যথেচ্ছাচারিতা এবং ব্যাকরণকে একদম অস্বীকার করা হইয়াছে!

কলম ধরিয়া অমিয় বড়বাবুর নোটের সংস্কার সাধন করিতে লাগিল।

ফণীবাবু পান মুখে দিয়া পুনরায় অমিয়র পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"ওকি করছেন, অমিয়বাবু?"

"লেখাটা আগাগোড়া ভুল, তাই ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

ফণীবাবু দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বড়বাবুর লেখা ভুল! এ যে আগাগোড়াই ঢেলে সাজছেন? অমন কাজটি করবেন না।"

অমিয়ও সবিস্ময়ে বলিল, "তবে বললেন কেন করেক্ট ক'রে দিন?"

ফণীবাবু বলিলেন, "করেক্‌শান্ মানে তো আগাগোড়া বদল নয়।"

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া অমিয় নিজের লেখা নোটটি ছিঁড়িয়া ফেলিল ও ফাইলটি ফণীবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তা হলে আমাকে দেখাবার দরকার নেই। বলুন গে ঠিক আছে।"

ফণীবাবু আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তাহলে ঠিক আছে? পাস না করলে কি হয় মশায়, বড়বাবু আজ পর্য্যন্ত যে কলম ঢেলেছেন তা কোন সায়েব পর্য্যন্ত একটি লাইন কাটতে সাহস করেন নি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা আছে? দিন না, পরশু মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

অমিয়র কাছে গণ্ডা বারো পয়সা মাত্র ছিল; অবশ্য এই বার গণ্ডা পয়সা সে তিন দিনে খরচ করিত না, তথাপি বিদেশে এই সামান্য পুঁজি হাতছাড়া করিতে সে চিন্তিত হইয়া উঠিল। বলিল, "বার আনা পয়সা মাত্র আছে—"

ফণীবাবু বলিলেন, "বিপদ কি জানেন, পয়সা আমারও দরকার হ'ত

না। বড়বাবু এইমাত্র বললেন, "ওহে ফণী, দু-সের ভাল ছানা নিয়ে এস তো বৌবাজার থেকে, আজ রাত্রে বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে জনকতক লোক বলেছি। রতন গোটা দুই বড় এঁচোড় দিয়েছে তার ডালনা হবে, ছানার ডালনা একটা, আর ও-মাসে শম্ভু দুটো বিলাতী কুমড়ো দিয়েছিল, পটল তুলসীর কাছ থেকে টাটকাই পেলাম। দেখ, ছানাটা যেন ভাল হয়।" বলে আট আনা পয়সা মাত্র দিলেন। এখন বিপদ হয়েছে কি জানেন, ছানার সেরই আজ আট আনা; আর আট আনা না হলে দু-সের ছানা কিনি কোথেকে বলুন।"

অমিয় বলিল, "কেন বড়বাবুকে বলে আর আট আনা চেয়ে নিন না, সব দিন দর তো ঠিক থাকে না।"

ফণীবাবু কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন "এক দিন সস্তার বাজারে চার আনা সের ছানা ওঁকে এনে দিয়েছিলাম, উনি সেই দরটি ধরে বরাবর আমায় দাম দেন। প্রায়ই দু-এক আনা পকেট থেকে ঘুষ দিয়ে ওঁর দরটি বজায় রাখি।"

অমিয় বলিল, "এ মিথ্যাচরণ করবার দরকার? যা সত্য কথা তাই বললেই তো পারতেন।"

ফণীবাবু সাতঙ্কে বলিলেন, "চুপ, চুপ। দু-এক আনার জন্যে চাকরিটি হারাব মশায়? আমার তো কখনও সখনও দু-এক আনা যায়, আর যাঁরা বাজার থেকে আম, আনাজপাতি কিনে এনে বাড়ীর জিনিষ ব'লে চালাচ্ছেন—তাঁদের অবস্থাটা ভাবুন দেখি। বড়বাবুর ধারণা ওঁর মত সস্তা জিনিষ এ দুনিয়ায় কেউ কিনতে পারে না, পাড়ায় এই নিয়ে গল্প করেন। আমরা ওঁর সে ধারণাকে ভাঙতে পারি কি? না সে ধারণা ভাঙা আমাদের উচিত!"

পয়সা দিয়া অমিয় আর ফণীবাবুর দিকে চাহিল না। সারা মনে

তাহার বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। এই তো জীবন! কেরানীর জীবন! সামান্য সত্যকে প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের মুখে জোগায় না, অহরহ মিথ্যার মায়াজাল বুনিয়া দিব্য হাসিয়া ও কৌতুক করিয়া জীবন তাহাদের কাটে। কেন এ জীবন, কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকা? কিন্তু এই স্রোত-হীন নদীর পারে বসিয়া এই সব অনাবশ্যক প্রশ্নে মনকে উত্যক্ত করিয়া কিই বা লাভ? আপিস এবং বড়বাবু, ঋণ এবং কন্যাদায়—হাজার রকমের দুঃখকে অস্বীকার করিয়া হাজার রকমের সুখকে সঞ্চয় করিবার নেশা—ইহা লইয়াই তো জীবন দিব্য কাটিয়া যায়। কি কাজ আত্মবোধে বা আত্মপ্রশ্নে?

কাল শনিবার। হাতে পয়সা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও অমিয় বাড়ী যাইবে না। কলিকাতার বুকে বসিয়া সপ্তাহ ভোর যে-রুক্ষতা মনকে পিষ্ট করিয়া তোলে, শিয়ালদহ হইতে ট্রেন ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশ ও শ্যামল মাঠের সাহচর্য্যে মন আবার সরস হইয়া উঠে, সে-রুক্ষতা কোথায় মিলাইয়া যায়। আপিসের কারাপ্রাচীরের বাহিরে এই যে একটি দিনের পরিপূর্ণ মুক্তি—এ-মুক্তির পরিচয় কর্ম্মহীন অবস্থায় এক দিনও সে পায় নাই। সপ্তাহব্যাপী বন্ধনের বেদনায় মন যখনই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে—যখন গ্লানিতে, অতৃপ্তিতে, আত্মধিক্কারে মনের বিকার দেখা দেয়, অমনই শনিবারের প্রভাত দেখা দেয়। প্রভাতের আলোয় আপিসের কারা-প্রাচীর বিলীন হইয়া দেখা দেয়—অনন্তপ্রসারী নীল আকাশ আর সবুজ মাঠ, একখানি ভগ্নগৃহের প্রাচীর, কয়েক ক্রোশ ব্যাপী বাব্‌লা বৃক্ষ আকীর্ণ প্রান্তর এবং প্রান্তরগামিনী গঙ্গার মহিমময়ী মূর্ত্তি। সপ্তাহের পর এক দিন বিশ্রাম যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সত্যই ভগবান।

বাড়ী যাইবার উত্তেজনায় সপ্তাহের ছয়টি দিন দিব্য কাটে। শুক্রবারের বৈকাল হইতে সেই উত্তেজনা প্রবল হইয়া শনিবারের দিনটিকে

নিমেষে কোন্ কল্পলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়! শনিবার হাজিরা-খাতা সহি করিয়া চেয়ারে বসা ছাড়া কাজ কিছু অগ্রসর হয় না, এমন কি এই দিন সহকর্ম্মী কাহারও দুঃখের কথা শুনিতে ভাল লাগে। আজ কাজের ভুলে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় না, বড়দের ভ্রূকুটিতে মন খারাপ হয় না, চাই কি কেহ ধার চাহিলেও কয়েক আনা ধার দেওয়াও বিচিত্র নহে। আধ ময়লা ঝাড়নে বাঁধা সংসারের কত কি টুকিটাকি জিনিষ··· কোনটা আধ পয়সা সুবিধা দরে পাওয়া গিয়াছে, কোনটা দেশে মিলে না। মন আজ সঞ্চয়ের নেশায় মাতিয়াছে।

তাড়াহুড়ায় দুটা বাজিয়া গেল। যাহারা বাড়ী যাইবে তাহারা পোঁটলাপুঁটলি লইয়া কয়েক মিনিট আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে; সহরের জন কয়েক বাসিন্দা শুধু কলম চালনা করিতেছে। অমিয়র বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল; টিকেট কাটার ব্যস্ততা, বাজার করার ব্যস্ততা এবং ট্রেনে ওঠার ব্যস্ততায় মন যেন উড়িয়া চলে। শনিবারের ছুটির পর আপিসের বিভীষিকা মনকে শুষ্ক করিয়া তুলে, এবং আপিসের বাহিরেও সমস্ত পথটা যেন প্রাণহীন। কলিকাতার দোকানে, বাজারে, ফুটপাথে তেমন প্রাণের প্রবাহও বুঝি নাই। এখানে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের কাছে শনিবারের এই ছুটাছুটি মূল্যহীন। তাঁহারা হয়ত খতাইয়া দেখেন, দীর্ঘ মেঠো পথ অতিক্রমের পরিশ্রম, বাজে জিনিষ পত্র কেনার হায়রানি, এবং সোমবারের অস্নাত, অভুক্ত শুষ্ক মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ক্লান্তির একটি গভীর বেদনা বোধ! তাঁহারা যাহাই দেখুন, অমিয়র মনে হইল, শনিবার দ্বিপ্রহরে কলিকাতার অপমৃত্যু ঘটে! যাঁহারা ছুটির বাজারে আমোদ-আহ্লাদ করিতে থিয়েটার-সিনেমায় ভিড় জমান, ক্রিকেট-ফুটবলের মাঠে রৌদ্রদগ্ধ হন অথবা রেস-কোর্সে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন তাঁহারা সহরের মৃতদেহ কাঁধে করিয়াই আনন্দের অন্তরালে শোককে বহিয়া বেড়ান।

জীবন যে কি করিয়া সম্পদ হয় সে ধারণা তাঁহাদের নাই, অথবা জীবন সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকমের নিশ্চেষ্টতা তাঁহাদের ধাতুসহ হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ ম্লানমুখ অমিয়র পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "অমিয়বাবু, চলুন।"

"কোথায়?" বিহ্বলের মত অমিয় প্রশ্ন করিল।

"এখনি আপিসের দরজা বন্ধ হবে—যেতে তো হবে।"

অমিয় উঠিল।

পথে আসিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "ভাল লাগছে না, কেমন?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"বাড়ী গেলেন না কেন? থাক্, থাক্, বুঝতে পেরেছি। এখন শ্যামবাজারের বাসাও বোধ হয় ভাল লাগবে না।"

অমিয় বলিল, "খানিক মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

"শুধু শুধু রোদে ঘুরে শরীর খারাপ করা। তার চেয়ে আসুন আমার বাসায়।"

অমিয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না, থাক।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বুঝেছি, একখানি ঘর—তার মধ্যে বসে আড্ডা জমাতে আপনার মন চাইছে না। কিন্তু আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি, আর এক জনের কথা ভেবে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আসুন।"

অমিয় বলিল, "তার চেয়ে পার্কে চলুন না কেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনি অত্যন্ত লাজুক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সবখানি পরিচয়ই কি ভদ্রতা আর এটিকেট দিয়ে বানানো? আসল পরিচয় যেখানে মানুষ পায়—সেখানে লজ্জা তার বাহুল্য মাত্র। জানেন, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রতি 'আপনি' সম্বোধন তুলে নিতে পারি?"

অমিয় খুশী মনে বলিল, "পারেন? সত্যি পারেন? আঃ, তা হলে আমি বেঁচে যাই।"

বিশ্বজিৎ অমিয়র হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল, "এসো। তোমার ছোট ভাই বা বড় দাদা আছেন?"

"না"—বলিয়াই অমিয় হাসিয়া ফেলিল, এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আছেন, আছেন।"

"কৈ, শুনিনি তো?"

"আমিও জানতাম না,—কিন্তু এই মাত্র জানলাম।"

বিশ্বজিৎ তাহার হাতের চাপ দৃঢ় করিয়া কহিল, "তা হলে দাদার আদেশ মান্য করে চলবে।"

অমিয়র মুখে ঈষৎ ছায়া পড়িল। কহিল, "কিন্তু দাদার আদেশ মান্য ক'রে চললে আমার চাকরিটি থাকবে তো?"

"মানে?"

"ফণীবাবু বলেন, আপনি নাকি চিহ্নিতনামা লোক?"

"ফণীবাবু বলেছেন এ কথা!" বিস্ময় কাটিয়া বিশ্বজিতের মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া নামিল, "ওঃ, তা সে বলতে পারে এ-কথা। সে-ই শুধু বলতে পারে।"

"ও-কথা কেন বললেন?"

"ক্রমে সব শুনবে। একটা কথা ভাবছি, নূতন চাকরি তোমার, চিহ্নিত লোকের সঙ্গে মিশে সত্যিই যদি কোন অনিষ্ট হয়!"

"অনিষ্ট?" অমিয় হাসিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমি জানি অনিষ্টকে তুমি ডরাও না, অন্যায়কে অগ্রাহ্য করবার সাহসও তোমার আছে। না হ'লে সমস্ত জেনে শুনে

তোমাকে কি আমার বাসায় সেদিন টেনে নিয়ে যেতে পারতাম ? তবু ভাই—”

অমিয় বলিল, “তবু নেই। একটু পা চালিয়ে, ক্ষিদেটা আমার বেশীই পেয়েছে।”

“তাই নাকি ? তোমার যে ক্ষিদে পায় এ-কথা যেন নূতন বলে মনে হচ্ছে।”

দু-জনেই হাসিতে লাগিল।

১২

বাড়ী ঢুকিবার মুখেই এক জন স্থূলকায় প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিশ্বজিতের দেখা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, “এই যে বিশ্বজিৎবাবু, আর যে বড় ক্লাবে দেখতে পাই না ?”

বিশ্বজিৎ বলিল, “সময় ক’রে উঠতে পারি না, নলিন-দা।”

নলিন-দা বলিলেন, “আরে রাখ তোমার বাজে কথা, সময় ক’রে উঠতে পারি না ! জান আমার বাড়ীতে তিনটে রুগী, তবু সখ এমনি জিনিব এক দিনও হাজিরা দিতে ভুল করি না। জান না বুঝি এবার কি প্লে হচ্ছে ?”

“ক্ষত্রবীর বুঝি ?”

মাথা নাড়িয়া নলিন-দা বলিলেন, “আরে রামঃ বল—ও-সব সেকেলে বই কি আজকালকার দিনে চলে ? এবার রবিবাবুর ‘চিরকুমার সভা’ ধরা হয়েছে।”

“বলেন কি দাদা ? এতটা উন্নতি হয়েছে ক্লাবের ?”

“উন্নতি কি সাধ করে হ’ল—ঠেলায় প’ড়ে, বুঝলে। ‘পাণ্ডব-গৌরবে’ আমার ভীমের পার্ট দেখেছিলে তো —কমসে কম হাজার নাইট নেমেছি

ওতে—বইখানা ধর, আগাগোড়া মুখস্থ ব'লে দেব। চল্লিশখানা রূপোর মেডেল—একখানা সোনার, অথচ—আশুবাবু ওই ভীমের পাট দেখে কাগজে বার করলেন নিন্দে! ছ্যাঃ—কোথাকার এক চোতা কাগজ—পড়ে কে বল তো ভাই? মনে মনে বললুম, জীতা রহ। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখ নি। আসুক আবার নতুন বই সিলেক্‌সনের সময়—তোমায় যদি কাত না করি তো···কেমন, ভোটের জোরে দাঁড় করালুম তো 'চিরকুমার সভা'।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আচ্ছা দাদা, নমস্কার।"

খপ করিয়া তিনি বিশ্বজিতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মানে? সরে পড়তে চাও? ওটি হচ্ছে না। চল সঙ্গে।"

বিশ্বজিৎ বিব্রত হইয়া বলিল, "দেখছেন না, ইনি সঙ্গে রয়েছেন।"

নলিন-দা বলিলেন, "তাতে কি, ওঁকে নিয়ে চল না কেন? কে উনি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "উনি সম্প্রতি আমাদের আপিসে ঢুকেছেন।"

নলিন-দা লাফাইয়া উঠিলেন, "আপিস ষ্টাফ্! বাঃ, এতক্ষণ বলতে হয়। ওঁকে বেশ চমৎকার মানাবে ফিমেল পার্ট। নিয়ে চল।"

অমিয়র মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নলিন-দা বলিলেন, "এই ফিমেল পার্ট নিয়ে কি মারামারি ক্লাবে। একটাও কি জুৎসই চেহারা মেলে। গাল-চড়ানো, সাড়ে চার হাত লম্বা, গড়নের নেই শ্রীছাঁদ, যেন বাখারিতে কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হ'ল! আবার চেহারা মেলে তো হয় মুখ দিয়ে রা বেরোয় না, না-হয় গলার স্বরটি কর্কশ। তাদেরই খোসামোদ করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।" হঠাৎ অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার পার্ট-টার্ট আসে তো? গান?"

অমিয় মৃত্নস্বরে বলিল, "না।"

নলিন-দা বলিলেন, "কুছ পরোয়া নেই, উপযুক্ত কাটারি পেলে শান দিয়ে নিতে কতক্ষণ? বুঝলে, বিশ্বজিৎ ভাই, তোমার এই নলিন-দার হাত দিয়ে আজ অবধি পাঁচ-ছ-শ ফিমেল পার্ট তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। এক-একটিকে রত্ন বললে বেশী বলা হয় না। পরশু ষ্টারে রিপন কলেজের যে 'চাঁদবিবি' প্লে হ'ল—তার চাঁদবিবি আর যোশী দুইই এই অধীনের হাতের তৈরি। কেমন করল বল দেখি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "চমৎকার।"

নলিন-দা বলিলেন, "এঁকে পেলে ওদের নামও চাপা পড়িয়ে দিতে পারি। হরেন—আমাদের হরেন গো, আজকাল বলে কি জান? বলে ফিমেল পার্ট আর করব না। আরে মর, তোর ওই শুঁট্‌কো চেহারা, আর মিহি গলা নিয়ে তুই করবি মেলা পার্ট! দিয়েছিলুম নৃপবালার পার্ট, ওর টাক পূর্ণর পার্ট। নিলে না। না নিলি নাই নিলি—আমি চেষ্টা করলে অমন এক-শটা নৃপবালা এনে হাজির করতে পারি। তবে কি জান, আপিস ষ্টাফ ছাড়া বাইরের লোক দিয়ে প্লে করানোতে মাঝে মাঝে আপত্তি হয়, তাই। নইলে হ্যাঁ—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনি এগোন নলিন-দা, আমি একটু জিরিয়ে জলটল খেয়ে—"

নলিন-দা বলিলেন, "তোমরা ছোকরার দল দিন দিন বড় আয়েসী হয়ে উঠছ। সেখানেও জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, জিরোবার জন্য ফরাস পাতা আছে। তবে যদি বৌমার মুখখানি না দেখলে শান্তি না-হয় তো আলাদা কথা।" কথা শেষে নলিন-দা সরবে হাসিতে হাসিতেই চলিয়া গেলেন।

বিশ্বজিৎ অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "যাবে—আমাদের ক্লাবে?"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি। আজ একা একা থাকতে ভাল লাগছে না। একটু গোলমাল, হৈ চৈ করে সময়টা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, হোম-সিক্‌নেস্‌।"

বিশ্বজিতের স্ত্রী সুপর্ণা আজ ঘরের এক কোণে বসিয়াই ষ্টোভ জ্বালিল, ঘোমটার শালীনতা বজায় রাখিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই চা তৈয়ারী করিল এবং প্লেটে বিস্কিট রাখিয়া পরিবেশন করিল।

বিশ্বজিতের মত স্বাস্থ্যসম্পদে সুপর্ণা সম্পদশালিনী নহে। খাটো সওয়া তিন হাত ক্ষয়া গোছের চেহারাটির মধ্যে একটি ক্লান্তির ভঙ্গিমা পরিস্ফুট! গায়ের বর্ণ বা অলঙ্কার কোনটাই প্রচার করিবার মত নহে, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আবদ্ধ বেণীতে হয়তো কেশ-সৌন্দর্য্যের নমুনা কিছু মিলিতে পারে, হাতের ক্ষয়প্রাপ্ত আটগাছি বরফি চুড়ির মধ্যে ফ্যাশানের এতটুকু নমুনা নাই। যে কাপড়খানি সে পরিয়াছে তাহার পাড়ের বিশেষত্বও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এমন সাদাসিধা ধরণের স্ত্রী না হইলে কেরানীর সংসারে মানাইবে কেন? সে-সংসারে শান্তিই বা আসিবে কোথা হইতে?

বিশ্বজিৎ সুপর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আজ সিনেমায় যাবে?"

"না"—বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুপর্ণা বাহির হইয়া গেল।

অমিয় বলিল, "আপনারা সিনেমায় প্রায়ই যান বুঝি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "হাঁ, ঐ আমার একটা বদ নেশা। মানুষকে যেমন ভূতে পায় আমায় তেমনি দেশভ্রমণের নেশায় পেয়ে আছে। প্রথম যখন রেলের চাকরিতে ঢুকি তখন মনটা খুশীতে ভরে উঠেছিল—বইয়ের পাতায় যে-সব বর্ণনা পড়ে মনে আনন্দ পেয়েছি—এখন সেই সব দেশ চোখে দেখবার সুযোগ পাব। পয়সা লাগবে না, পাস নিয়ে বেরিয়ে

পড়লেই হ'ল। তখন সংসার ছিল না ঘাড়ে—ছিলাম স্বাধীন—পাঁচটা বছর ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। ভারতবর্ষের বাইরে পা দেবার সুযোগ এ জীবনে হবে না, কাজেই সিনেমা দেখে সাধ মিটাই।"

অমিয় বলিল, "ভারতবর্ষকে আপনি তবু চোখে দেখেছেন—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "হয়তো চোখে না দেখলেই ভাল করতাম! দিল্লী-আগ্রায় গিয়ে যা দেখেছি তাতে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে; বৃন্দাবন, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা বা কাশীতে যা দেখেছি তাতে ভক্তি-শ্রদ্ধাগুলি হারিয়েছি, পুরাণ-কথায় অবিশ্বাস জন্মেছে আর মাদ্রাজের ওদিকে বেড়িয়ে রবিবাবুর সেই কবিতার লাইনটি মনে পড়ে,

"যাহারে রেখেছ পিছে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

বাহির হইতে কে ডাকিল, "বিশ্বজিৎ-দা, আছেন?"

"কে?"

"আমি রমেন। একটু আসবেন এদিকে, একটা কথা ছিল।"

বিশ্বজিৎ উঠিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সিনেমায় আজ আর যাওয়া হ'ল না ভাই।"

"কেন?"

"হাতে মোটে গোটা দুই টাকা ছিল, একটি তো গেল বেরিয়ে। যে ডাকছিল ও কে জান? আর এক দিন বলেছিলাম না, প্রেসে কাজ করেন অথচ রোজ পার্কে হাওয়া না খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, সেই সুখী দম্পতি। একটি টাকা না হ'লে ওদের লেকে যাবার বাস-ভাড়ার অনটন!"

অমিয় বলিল, "পয়সা নেই, তবু বেড়াবার সখ আছে?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কেন থাকবে না? জীবন যখন উপভোগের

জিনিষ—তখন অর্থের অনটনে কি যায় আসে ? এমন শনিবারের সন্ধ্যা জীবনে আর কতবার আসবে কে বলতে পারে !”

অমিয় বলিল, “আপনার মনেও—”

বিশ্বজিৎ বলিল, “আমার মনেও সখ প্রচুর, অমিয়। দিন আসছে, চলে যাচ্ছে, প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তনই হচ্ছে, কিন্তু আমরা তার কতটুকু উপভোগ করতে পারি ! একটি প্রবল দুঃখে অভিভূত হয়ে অনেক কিছুই আমরা হারাচ্ছি। ওদের দেখে এক-এক সময় হিংসে হয়। ওরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া ; খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদে ওদের হিসাব নেই, পরের দুয়ারে হাত পাততেও লজ্জা বোধ করে না। ওরা জানে সুনাম-দুর্নাম, লাভক্ষতি—জীবনের মেয়াদ যত দিন—মাত্র তত দিনই ! নিজের বংশধরদের জন্য সঞ্চয় মূর্খেরাই করে থাকে।”

অমিয় বলিল, “আপনারও কি সেই মত ?”

বিশ্বজিৎ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, “যে-সভ্যতার স্রোতে আমরা ভাসছি তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। এক সময়ে মনে হয় বইকি—ওরাই সুখী—কিন্তু যখন ওদের ঘরে পোলাওয়ের পর দিনই হাঁড়ি চড়ে না, শুকনো মুখে দু-আনা পয়সা ধার ক’রে মুড়ি চিবিয়ে ক্ষিদে মেটায়, তখন মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে ! ওরাই বলতে পারে, ‘ইট, ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি।’ সত্যিই ওতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না আমার সন্দেহ হয়।”

অমিয় বলিল, “আমারও মনে হয়, আনন্দের ষ্ট্যাণ্ডার্ড তো সকলের এক নয়, কাজেই অনুভূতিহীন মনের ওগুলিও মস্ত খোরাক। খানিক হৈহৈ ক’রে কাটান, মন্দ কি ! আজ আমারই ইচ্ছে করছে অমনি হৈহৈ খানিক করি, কেননা, মনের মধ্যে আপনার জনের সান্নিধ্যলাভ না করতে পারার দুঃখ আমায় পাগল ক’রে তুলেছে।”

বিশ্বজিৎ বলিল, "চল তাহলে নলিন-দার ক্লাবে যাওয়া যাক্।"

অমিয় বলিল, "তার চেয়ে এই ঘরখানি তো মন্দ লাগছে না, বিশ্বজিৎ-দা! আপনার ছেলেটি বেশ শান্ত ভাবেই ঘুমুচ্ছে, বাপ-মায়ের মনে কিসের দুশ্চিন্তা ও অবোধ তা জানে না। বাল্যকাল সত্যই সুখের।" একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমিয় গুটানো বিছানার উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "কি জানি, কোন্ কালটা আমাদের জীবনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল বলতে পারি না। যখন চিন্তার জট ছাড়াতে প্রাণান্ত হয় তখন শিশুকালের কথা স্মরণ করি, যখন শক্তি হারাই তখনি যৌবনের জন্য অনুতাপ জাগে—আসলে যা আমরা সৌভাগ্য ও সম্ভ্রমে অতিক্রম করে যাই, তাই হয়তো ভালবাসি।"

অমিয় বলিল, "জীবন নিয়ে এমন একটা সুন্দর কাব্য লেখা যায় না। বিশ্বজিৎ-দা?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "যায় বইকি—কিন্তু তার পৃষ্ঠা ওল্টাবে কে! আমি সংসারী লোক, আমার সময় কম। তুমি সন্ন্যাসী, তোমারই বা কাব্য-চর্চ্চার সময় কোথায়? খোলা ছাদের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কখনো কখনো বিস্তীর্ণ আকাশ আর অসংখ্য নক্ষত্র দেখে কারও কারও মনে আত্মার রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তা তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু নীচের কোলাহলভরা সংসারে চোখ কান সঁপে দিলে, সে চিন্তার বুদ্‌বুদ্ কতক্ষণ বল? এমনি সংসারের আবর্ত্ত যে বাঁধা-সড়ক ছাড়া পাশ কাটিয়ে চলার ক্ষমতা নেই। তোমার জীবন-কাব্যের একখানি পাতাও হয়তো কেউ উল্টে দেখবে না।"

অমিয় বলিল, "না দেখুক। আমি লিখব নিজের আনন্দে। অর্থ উপার্জ্জন আমার লক্ষ্য নয় যে পাঠক ভোলাবার কৌশল আয়ত্ত

করতে যাব। যাঁরা আর্ট-ক্রিটিক তাঁদের মতামতের ভরসাও আমি রাখি নে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "তাহলে সে-লেখার নাম কাব্য দিও না, আর কিছু বল। ভাল কথা, জীবনকে তোমার কি মনে হয়? বন্ধন, না মুক্তি?"

অমিয় বলিল, "বন্ধনের বেদনা ও মুক্তির আনন্দ দুই-ই আছে এতে। আমি তিরিশ-টাকা মাইনের কেরানী—আমি আকাশের পানে চেয়ে আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা যখন করি, তখন আমার ক্ষুদ্রত্ব কোথায় থাকে? জগতের যে-কোন মনীষী বা মহাঋষির আসনের পাশে তখন আমার স্থান, সেই তো আমার মুক্তির ক্ষেত্র। আবার এই ঘরখানির মধ্যে স্ত্রীপুত্রের রোগ বা দুঃখ দেখে যখন বিচলিত হই, আপিসের কশাঘাতে মন বিকল হয়ে ওঠে তখন বন্ধনের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, তখনই তো আমার ক্ষুদ্রত্ব ধরা পড়ে।"

"তাহ'লে তুমি কে?"

"আমি কে—সেই জিজ্ঞাসাই আমার প্রথম ও পরম প্রশ্ন; আমি কি—সেই স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টাই তো আমার সব চেয়ে বড় কাজ। অথচ অসংখ্য মেঘের মধ্যে একটি মেঘের মত, সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত আমি নামগোত্রহীন। আমাকে জানবার সত্যকার চেষ্টা তো কোন দিন করি না—এই তো আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ!"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "তোমার দার্শনিকত্ব রাখ, ওর সীমা নেই, সংখ্যা নেই। জান কি অমিয়, এ জগতে যে যত বেশী চিন্তাশীল তার অশান্তি তত বেশী!"

"কেন বিশ্বজিৎ-দা?"

"কি জানি কেন, ঘুম যারা ভালবাসে—মাঝে মাঝে জাগা তারা

পছন্দ করে না হয়তো। আর তর্ক চলবে না অমিয়—তোমার বৌদিদি কড়া নেড়ে থামতে ইঙ্গিত করছেন—দুষ্টু খোকাটাও বিছানায় উঠে বসেছে।”

অমিয় হাত বাড়াইয়া বলিল, “খোকাকে আমার কোলে দিন।”

“নাও”, বলিয়া অমিয়র কোলে দিতেই খোকা কাঁদিয়া উঠিল। অমিয় আনাড়ীর মত গুন্‌গুন্ করিয়া কি ছড়া বলিতে গেল তাহাতে খোকার চীৎকার সপ্তমে উঠিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, “ওরা কোল চেনে। তোমার আড়ষ্ট হাতের ধরা বুঝতে পেরেছে দুষ্টু, দাও।”

বিশ্বজিতের কোলে উঠিয়া খোকা শান্ত হইল।

বিশ্বজিৎ বলিল, “আর নয়, যার ধন তাকে গচ্ছিত ক’রে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি চল। নলিন-দা নইলে রাগ করবেন।”

কলিকাতার মধ্যে এতখানি ফাঁকা জমির কল্পনা করা যায় না। কর্ম্মচারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রেলওয়ে বিভাগ কয়েক বিঘা জমি প্রাচীর ঘিরিয়া দান করিয়াছেন। প্রকাণ্ড লৌহ-গেটের পাদমূল হইতেই লাল সুরকির শোভন পথটি আরম্ভ হইয়া পাঠাগার ও রঙ্গমঞ্চের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া পশ্চাতের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। পথের দু-ধারে যে-সব খণ্ড জমি পড়িয়া আছে তাহার কোনটিতে মরসুমী ফুলের গালিচা পাতা, কোন খণ্ড সবুজ তৃণাস্তৃত, কোন খণ্ডে জুঁই-গোলাপের ঝাড়। সবুজ জমির কোল হইতে বিজলী-স্তম্ভের সারি পশ্চাতে ফুটবল খেলার মাঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। গাড়ী-বারান্দার নীচে যাহাতে বৃষ্টির দিনে অফিসারদের মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা হলে প্রবেশ করিল। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চেরও এমন প্রশস্ত হল আছে কিনা সন্দেহ! হলে চেয়ারের সারি, অতিকায় থামের উপর প্রকাণ্ড লোহার জয়েষ্ট দিয়া হলের ছাদটি তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রত্যেক থামের গায়ে ইন্‌ষ্টিট্যুট-সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উচ্চ ইংরেজ অফিসারের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রকাণ্ড হলকে সাজাইবার উদ্যম কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই, কেবল তাহার স্থায়িত্বের দিকেই কড়া রকমের নজর দেওয়া হইয়াছে।

হলের এক ধারে চার-পাঁচখানি তক্তাপোষ জুড়িয়া এক একটি আসর তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রত্যেক আসরে প্রকাণ্ড একটি সতরঞ্চ, তাহার উপর সাদা চাদর ও গোটা কয়েক আধময়লা তাকিয়া পড়িয়া আছে। গড়গড়াও দু-একটি দেখা যায়। সেখানে কোন দল বসিয়া তাস খেলিতেছেন, কাহারা বা পাশার আড্ডা বসাইয়াছেন, দাবার ছক সম্মুখে রাখিয়া কয়েকজন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওপাশে লাইব্রেরির আপিস-ঘরে এখানকার সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দের আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। পাশের নাতিপ্রশস্ত ঘরে স্বাস্থ্যচর্চ্চায় কয়েকটি ছেলে মনোনিবেশ করিয়াছে। ব্যায়ামাগারের পাশ দিয়া একটি সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়াছে। দোতলায় উঠিলেই পাঠাগারের প্রকাণ্ড ঘরটি সম্মুখে পড়ে। গোটা ষাটেক বড় আলমারি এবং কাঠের র‍্যাকে ঠাসা বই, টেবিল পাতিয়া দুই জন লাইব্রেরিয়ান মোটা লেজার খুলিয়া বসিয়া আছেন—এক জন চাপরাসী বাবুদের হুকুম মত আলমারি হইতে বই বাহির করিয়া দিতেছে।

বিশ্বজিৎ বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এক খানা ভাল দেখে বই দিন তো। এখানা তো মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।"

লাইব্রেরিয়ান হাসিয়া বলিল, "অনেকেই ঐ 'কমপ্লেন' করেন, কিন্তু

উপায় কি বলুন। আপ-টু-ডেট যা কিছু নভেল বাংলায় বেরয় সবই আমাদের রাখতে হয়, সব বই তো আমাদের পড়া নেই, লিষ্ট দেখে আপনারা বেছে নিতে পারেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "নভেল ছাড়া অন্য বই বড় কম এখানে।"

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "এই আমার খাতা দেখুন, ডেলি পাঁচ-সাত-শ বই ইস্যু হয়, এর মধ্যে নাইনটি-নাইন্ পারসেণ্ট নভেল। কাজেই কেনার সময় নভেলের ভালমন্দ বাছতে গেলে চলে না, যা বেরয় তাই কিনতে হয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বাংলা দেশের পাঠকরা যে লম্বকর্ণের মত একথা রবিঠাকুর মিথ্যে বলেন নি। যাই হোক, আপনাদের উচিত অন্য বই কিনে লোকের টেষ্ট জন্মিয়ে দেওয়া।"

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "আমরা তো আপনাদের হুকুমের চাকর—যা বলবেন তাই দিতে বাধ্য। যাঁদের বাড়ীতে বুড়ো বাপখুড়ো আছে তাঁদেরই কখনও সখনও দু-একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ নিতে দেখি, আর সব নভেল—স্রেফ নভেল। ছোট গল্পের বই হ'লেও পছন্দ হয় না। বই হাতে নিয়ে পাতা উল্‌টিয়ে দেখে বলেন, 'এ-সব ছোট ছোট গল্প চলবে না মশাই, ভাল দেখে বড় দেখে একখানা নভেল দিন।' তাই দিতে হয়। যে বই আজ ফিরিয়ে দিলেন, পনর দিন পরে সেই বইখানিই ভাল এবং বড় ব'লে আমাকে ইস্যু করতে হয়। আপনারাও হাসিমুখে নিয়ে যান। মা-লক্ষ্মীরা খুব বেশী নভেল পড়েন ব'লেই হয়তো কোন গল্পটাই মনে রাখতে পারেন না, কাজেই একই বই পনর দিন পরে দিলেও 'পড়া-বই' ব'লে অভিযোগ খুব কমই আসে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "মজা মন্দ নয়। আমাদের দেশে ভাল সাহিত্য যে গড়ে ওঠে না, এও তার একটা কারণ, অমিয়।"

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "সাহিত্যের কথা দু-একজনের কাছে ছাড়া তো শুনি না মশায়। সবাই বলে, কম্‌পল্‌সারি চাঁদা ব'লেই লাইব্রেরির বই নেওয়া, নইলে কে সাধ ক'রে মেম্বার হত মশায়? সংসারের কাজ করব, না বই পড়ব? ও-সব আলসেমি আমাদের গেরস্ত-ঘরে পোষায় না।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "শোন, অমিয়, শোন।"

অমিয় লুব্ধদৃষ্টিতে বই-ভর্ত্তি আলমারিগুলির পানে চাহিয়া ছিল। সংগ্রহ এখানকার প্রচুর। সাজাইবার বিশৃঙ্খলায় ভাল জিনিষগুলি চোখে পড়ে না। বইয়ের লিষ্ট বাহির করিয়া নাম-জানা ভাল বই বাহির করা চলে, কিন্তু বই সম্বন্ধে লাইব্রেরিয়ানের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। পাঠকের মন বুঝিয়া রস-পরিবেশনের ভার তো তাহারই উপর; ফুলকে ফুটাইতে যেমন স্রষ্টার একাগ্রতা ও সৌন্দর্য্য বোধের সাধনা দরকার, তেমনি ভাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব এই লাইব্রেরিয়ানদের। যেখানে পয়সার সঙ্গে সম্বন্ধ, পড়ার সঙ্গে নহে, সেখানে সাহিত্যের স্বাদ লইতে যাওয়া সত্যই বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশ্বজিতের বই লওয়া হইলে উভয়ে নীচে নামিল। রঙ্গমঞ্চের দু-পাশে দু-খানি ঘর। একটিতে ঐকতানবাদন সুরু হইয়াছে, অন্যটিতে নাটকের মহলা চলিতেছে। নলিন-দা তাকিয়া ঠেস দিয়া আধশোয়া অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়াছেন, পাশে চৌকির উপর দাঁড়াইয়া এক জন আধাবয়সী লোক ও একটি ছোকরা আবৃত্তি করিতেছে, বেঞ্চে বসিয়া প্রম্‌টার প্রম্‌ট্‌ করিতেছে।

নলিন-দা গড়গড়া-টানা বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়াই বলিলেন, "উঁহু, হ'ল না, আর একটু সেন্টিমেণ্ট দিয়ে—", বলিয়া চক্ষু চাহিতেই বিশ্বজিতের উপর নজর পড়িল। মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া বসিয়া কোমরের কাপড় কসিতে কসিতে বলিলেন, "আরে এস, এস। ওহে চারু, এই

ছোকরার কথাই বলছিলাম, ইনি আমাদের আপিসের লোক, মানাবে না ফিমেল পার্ট ?”

চারুবাবু একদৃষ্টে বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, “একটু লম্বা হবে না ?”

নলিন-দা তাকিয়ায় একটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, “উনি নন—উনি নন। ও, বিশ্বজিৎকেও দেখ নি তুমি ? ঐ বিশ্বজিতের পাশে দাঁড়িয়ে—কি নাম আপনার ?”

চারুবাবু অমিয়র পানে চাহিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “খাস মানাবে—চমৎকার।”

চারুবাবু লোকটি খর্ব্বকায়, মাথায় টাক্, মুখখানি ও চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র, গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী মালা, হাত পা লোমশ—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকটি সর্ব্বদাই হাসিমুখে ঘাড় দোলাইয়া গল্প করিতে ভালবাসেন। তামাক টানিতে ভালবাসেন, পান মুখে দেন না। পাঁচ জনের ছোঁয়া চায়ের কাপে তিনি চা পান করেন না, আলাদা একটি কাচের গ্লাসে তাঁহার চা পরিবেশিত হয়।

উষ্ণ চায়ের গ্লাসে সন্তর্পণে চুমুক দিয়া তিনি অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, “বসুন না, এই যে এইখানে।” বলিয়া পাশে বসাইলেন।

“কি নাম আপনার ? অমিয়, বা, খাসা নাম ! বাড়ী ? বটে, একেবারে খাস শ্রীগৌরাঙ্গ দেশের লোক ?···কোন্ সেক্‌শনে—কত দিন হ'ল ?”

অমিয়র লোকটিকে মন্দ লাগিতেছিল না। কুড়ি বৎসর আপিসে কাজ করিয়াও আচারে-ব্যবহারে কোথাও তাঁহার শহরের বা আপিসের ছাপ পড়ে নাই। যে সব প্রশ্ন ভদ্রতার খাতিরে শিক্ষিত লোকের মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত নহে, চারুবাবু আপন গ্রাম্য স্বভাবসুলভ

অভ্যাস বশতঃ অসঙ্কোচে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং উত্তর দিতে গিয়া অমিয় একটুও মনঃক্ষুণ্ণ হইল না।

অমিয়র পরিচয় লওয়া হইলে নিজের পরিচয়ও দিলেন, "আর ভাই, আপিসের গো-খাটুনির পরে এই ক্লাবে ব'সে একটু জুড়ুতে পাই। পাই তো আশী টাকা মাইনে, তিন ছেলে, চার মেয়ে; তাদের পড়াশোনার খরচ, এখানের মেসভাড়া, বাড়ীতে মস্ত সংসার—মন্দ কি এই ক্লাব। এখানে এসে বসলে সব ভুলে যাই। ওরা বলে কি জান—বলে, চারুদা, পার্টের কাঙাল! হব না কেন বল, নিজেরা সব কমিটির মেম্বার হয়ে ভাল ভাল পার্টগুলি নিবি বেছে, নতুন লোককে দিবি না জায়গা—এটা তো মনোপলি বিজিনেসের জায়গা নয়। কি বল ভায়া!"

অমিয় হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল।

চারুদা বলিলেন, "আমার ব্রজখুড়োর পার্ট দেখনি বুঝি? ষ্টারের বোস পর্য্যন্ত সুখ্যাত ক'রেছিলেন। আচ্ছা তুমিই বল তো ভায়া, আমায় রসিকের পার্ট মানায় না? ফরসা নই এবং মোটা নই বলেই কি মহা দোষ করেছি? অপরেশবাবু ঐ পার্ট করেছিলেন বলেই কি তাঁর মত চেহারা না হ'লে ও-পার্ট হবে না?" একটু কাসিয়া বলিলেন, "নলিন-দা আমাদের আলাভোলা, হতেন একটু শক্ত—তো সব ঠিক হয়ে যেত।"

এমন সময় নলিন-দা ও-পাশের কোটপ্যান্টধারী একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ললিত, এক বার ওঠ তো দেখি। তোমার দ্বারা কেমন বিপিনের পার্ট হয় দেখা যাক।"

যুবক শ্যামবর্ণ—মুখ চোখের শ্রী আছে। মাথার চুল ব্যাকব্রাস করা ও লাইমজুস গ্লিসারিনের কল্যাণে চক্‌চকে। সুট, টাই এবং জুতার পারিপাট্য দেখিয়া লোকটিকে বিলাসী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়াই বোধ হয়! মুখে চুরুট ধরিবার ভঙ্গিটি বাঁকা—এবং চক্ষু দুটিতে গর্ব্বিত

প্রসন্ন হাস্যরেখা। নলিন-দার কথায় তিনি উঠিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "আমরা কি পারব ও পার্ট? আমাদের না আছে সেন্টিমেণ্ট না আছে কণ্ডিমেণ্ট।"

ঘরের সমস্ত লোকই হাসিয়া উঠিল।

নলিন-দা ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আর পাকামি করতে হবে না, বল।"

ললিত গর্ব্বিত ভাবে গাত্রোত্থান করিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বা তাচ্ছিল্যভরে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

নলিন-দা পুনরায় চক্ষু মুদিয়া গড়গড়ায় টান দিলেন ও ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, ঠিক হচ্ছে না।"

ললিত বলিল, "এখনই যদি সব বলতে পারব রিহার্স্যালে দরকার কি? কালই বই নামিয়ে দিন না।"

ঘরের সকলের মুখেই চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

চারুবাবু অমিয়কে নিম্নস্বরে বলিলেন, "দেখলে তো ঠাট্টা। অথচ ওদের ডেকে ডেকে খোসামোদ ক'রে পার্ট দেওয়া চাই। কিনা চেহারা ভাল! আরে বাপু, আমাদের চেহারা নিয়ে—এই বাঙালী চেহারা নিয়ে কোন হিষ্টরিক্যাল বই তো তা হ'লে করা চলে না! যস্মিন দেশে যদাচার—। খোট্টাই গালপাট্টা আর বুকের ছাতি যদি খুঁজতে চাস তো দরোয়ান ধরে ধরে পার্ট দে—"

কে এক জন বলিল, "চুপ, চুপ, আস্তে কথা বলুন।"

চারুবাবুর পাশে যে ভদ্রলোক বসিয়া পান চিবাইতেছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চারুবাবু বলিলেন, "তুমি কি কাল আস নি রতন?"

রতন হাসিয়া বলিল, "কালও একটা টাল গেল কিনা, জামা গায়ে দিয়ে আবার খুলে ফেলতে হ'ল।"

চারুবাবু বলিলেন, "বড় ভোগাচ্ছে তো ? টি-বির একমাত্র ওষুধ চেঞ্জে যাওয়া। তাই কেন নিয়ে যাও না।"

রতন বলিল, "কেরানীর স্ত্রী যাবে চেঞ্জে ! সংসার তো ছোট নয় তোমার চারুদা, বোঝ তো সব—ডাইনে আনতে যাদের বাঁয়ে টান ধরে তারা করবে যক্ষ্মা রুগীর চিকিৎসে—রাজারাজড়ার রোগের সেবা !"

চারুবাবু বলিলেন, "ভোগান্তি তো !"

"সে তো বটেই। কতগুলো কাক মরে কেরানী হয় জান ? এক-শটার কম নয়। তারা ভুগবে না তো ভুগবে কে ?"

চারুবাবু বলিলেন, "তোমরা যে কেন চাকরির লাইন ধরলে বুঝতে পারি নে। তোমাদের তো দিব্যি সোনা-রূপোর দোকান ছিল—কাজ-কারবার ছিল ?"

রতন বলিল, "সেকেলে স্যাকরার দোকান ব'লে খদ্দের হয় না। প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া নিয়ে কাচের শো-কেসের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে হরেক রকমের গহনা যদি সাজিয়ে রাখতে পারতাম তো দোকান আমাদেরও চলত হয়তো। আমার বাড়ীর বাইরের চুনবালি-খসা ঘরে, গলির মধ্যে, রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে আর পুরোনো যন্ত্রপাতি আর মান্ধাতার আমলের সিঁদুর-লেপা লোহার সিন্দুক নিয়ে কি খদ্দের ভোলান যায় ? বাবা বুঝেছিলেন দিন খারাপ আসছে, তেমন ধারা পুঁজি তো নেই যে জাঁকিয়ে দোকান খুলতে পারি—তাই এই তালপাতার ছাউনিটুকু তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন।"

চারুদা বলিলেন, "কিন্তু বাড়ীতে তুমি থাক কতক্ষণ ! আপিস আর ক্লাব—এই তো দেখি সারাক্ষণ।"

রতন বলিল, "তোমাদের পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে থাকি ভাল। ত্ব-বেলা যাদের কোন রকমে ত্ব-মুঠো জোটে তারা জরির পোষাক প'রে রাজা

সেজে যখন বড় বড় বুলি আওড়ায় তখন ভাব দিকি ব্যাপারখানা। সে আনন্দের তুলনা আছে, দাদা?”

রতনের পাশ হইতে আর একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, “একট নেশা তো চাই মানুষের। হয় বিড়ি সিগ্রেট, নয় গাঁজা আফিং চণ্ডু চরস মদ, নিদেন পক্ষে জরদা—কিংবা চা।”

রতন বলিল, “ঠিক বলেছ, ভাই, নিদেন পক্ষে পান আর চা। বল তো আর এক কাপ চা দিতে।”

ছোকরাটি বলিল, “আপনি তো সিনিয়রমোষ্ট ম্যান—সুপারিণ্টেডেণ্ট আপনাদের ভাল, গ্রেড পেলেন না কেন?”

রতন হাসিয়া বলিল, “সমস্ত যোগাযোগ হয়েও একটির জন্য সব আপসেট হয়ে গেল, ভাই।”

“কি?”

“অনেক খুঁজেপেতেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক পর্যন্ত বার করতে পারলাম না—ধান সম্পর্কে পিসেমশাই হলেও চলতো!”

যাহারা রতনের কথা শুনিল, তাহারাই হাসিয়া উঠিল।

আবার চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল, “চুপ, চুপ।”

অবশেষে খাবারের প্লেট লইয়া চাপরাশি দেখা দিল। ঘরে যে কয়জন লোক আছেন, সকলের জন্য প্লেট সাজানো হইয়াছে, তথাপি প্রথমে খাবার লইবার জন্য সে কি কাড়াকাড়ি। স্কুল-কলেজেও সতীর্থবৃন্দের মধ্যে খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি হয়, কিন্তু তাহাতে খেলার আনন্দ আছে, মাধুর্য্য আছে। এ যেন নিতান্ত খাইবার জন্যই যাচ্ঞা করা। নয়টায় ভাত খাইয়া যে কেরানী শুষ্কমুখে বৈকাল পাঁচটায় খাবারের জন্য সাগ্রহে হাত বাড়ায় এবং খাবার হাতে আসিবামাত্র

গোগ্রাসে গিলিতে থাকে, তাহার লোলুপতার কুশ্রী প্রকাশকে ঢাকা দিবার কোন পন্থাই নাই!

ও-পাশ হইতে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ কি ভিক্ষে নাকি? রীতিমত চাঁদা দিই মাস মাস—জানে কচুরি খাই না, তার বদলি কিছু দে, তা না সেই একটি রসগোল্লা! কেন ভিক্ষে নাকি?"

গোলযোগ বাড়িয়া উঠিল এবং সেক্রেটারীর সুব্যবস্থায় আর একটি রসগোল্লা পাইয়া ভদ্রলোক অবশেষে সুস্থির হইলেন।

বিশ্বজিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অমিয় হ্যারিসন রোড ধরিয়া সোজা গঙ্গার দিকে চলিল। কোলাহল, হৈচৈ সে চাহিয়াছিল, কিন্তু আনন্দের নামে যাহারা নিরানন্দের বেসাতি করিতেছে, তাহাদের হট্টগোল কে কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে। প্রাসাদে বসিয়াও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া ও ভিক্ষার বুলি মুখে আওড়াইয়া ইহারা দিন কাটাইতেছে। যাহারা রঙ্গমঞ্চের সাজানো রাজা—চালচলনে, জরির পোষাক গায়ে জড়াইয়াও যথার্থ পরিচয় তাহারা ঢাকিতে পারে কি?

এত শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া লাভ নাই, যে-গঙ্গা প্রান্তরবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদের দেশ ঘুরিয়া আসিয়া শহরের প্রাসাদে মাথা কুটিয়া মরিতেছে, তাহারই তীরে বসিয়া খানিক দেশের কথা ভাবা যাক না কেন?

কিন্তু শহরের গঙ্গা ও পল্লীর গঙ্গায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেখানে বালুচর গঙ্গার স্রোত বিদীর্ণ করিয়া মাথা তুলিতেছে—দু-দিন পরে নদী মজিয়া মাঠের রূপ পাইবে; এখানে ড্রেজারের সবল

আঘাতে সেই বালুস্তূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। সেখানে জনবিরল উচ্ছেপটলের ক্ষেতের ধার দিয়া বন-ঝাউকে পাশ কাটাইয়া বক্রগামিনী গঙ্গা এক কূল ভাঙ্গিয়া অন্য কূল গড়িয়া অত্যন্ত আলস্যভরে চলিয়াছেন—এখানে দু-পাশের বাঁধা ঘাটে তরঙ্গ-ঝঙ্কার তুলিয়া তিনি প্রখরা হইয়া উঠিয়াছেন। সেখানে কাচস্বচ্ছ জলে শুভ্র পাল তুলিয়া বাঁশের দাঁড় বাহিয়া দু-একখানি রুগ্ন নৌকা গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটিতেছে, এখানকার ঘোলা জলের উপর বড় বড় জাহাজ, নৌকা, ষ্টীমলঞ্চ, বড় পানসী প্রভৃতি ভাসিতেছে—জল ভাল চোখে পড়ে না; বিদ্যুতের আলোয়, বাঁশীর শব্দে গঙ্গার কলধ্বনি ডুবিয়া গিয়াছে। সেখানে প্রভাতবেলায় গঙ্গার বালুচরের ধারে বসিলে যে সুমিষ্ট তরঙ্গধ্বনি অন্তর-বীণার তারের সঙ্গে একতানে বাজিয়া উঠে, কিংবা ঘনায়মান সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ঢেউ ভাঙিয়া কুচি কুচি কাচের মত জ্বলিতে থাকে; উপরের গাঢ় নীল আকাশ সেই বিরাট মহিমায় রূপ দান করে, আর্দ্র বায়ুতে ও অন্ধকারে বন-ঝাউয়ের ঈষৎ গুঞ্জনধ্বনি গঙ্গার স্তবগান গাহিতে থাকে; উপরের ঝিকিমিকি নক্ষত্র, নৌকা টানিবার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, কখনও বা ওপারে কৃষকবধূর ঘাটে জল ভরিবার শব্দ এবং নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর একটি রূপলোক ও মায়ালোককে পৃথিবীতে নামাইয়া আনে—সেই কল্পলোক কি এই শব্দকোলাহলময়ী বিদ্যুৎ-আলোক-বিদীর্ণা ষ্টীমার-নৌকা-জাহাজ-কণ্টকিতা অস্পষ্টনক্ষত্রখচিত বিবর্ণ আকাশের পটভূমিতে দুটি কূলের পাষাণচত্বরবন্দিনী গৈরিকবসনা গঙ্গার কূলে গড়িয়া উঠিতে পারে?

হাওড়া-সেতু হইতে যেদিকে দৃষ্টি ফিরান যায় সেই দিকে আলোর মালা সাজান।

বিপুল ঘর্ঘর নাদে গঙ্গাবক্ষ সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে, পুলের পথ

দিয়া পঙ্গপালের মত নরস্রোত এবং নীচে দিয়া পিপড়ার মত নৌকার সারি চলিয়াছে। আলো আর অন্ধকারে মিশিয়া অজানা রহস্যের পরিবর্ত্তে গভীর ভয়ের সৃষ্টি করিতেছে।

পাড়াগাঁয়ের সরল কৃষক শহরের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া ও শহরের সাহচর্য্যে বাস করিয়া যেমন না শহরের মার্জ্জিত রুচি না পাড়াগাঁর মিষ্ট স্বভাব সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে, তেমনিই এই গঙ্গা। ইহার কূলে বসিয়া বা জলস্পর্শ করিয়া সেই চক্ষু-অগোচরীভূতা দ্রবময়ীর কল্পনা করাও বাতুলতা। এখানে তিনি ভাগীরথী, ওখানে গঙ্গা।

ষ্ট্র্যাণ্ডের পথ ধরিয়া অমিয় ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল।

১২

শনিবার যদি বা কাটিয়া গেল—রবিবারের সুদীর্ঘ অবসর দেখিয়া অমিয় ভীত হইয়া পড়িল। আহার সারিয়া কি করিবে সে! সারা দুপুর নিরবচ্ছিন্ন অবসর, গল্প করিবার লোক নাই, কাজ করিবার হেতু নাই, হাতের কাছে পড়িবার মত বইও নাই। আবার কি সে বিশ্বজিতের সন্ধানে ছুটিবে? তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে হানা দিয়া, আর একটি প্রাণীকে বঞ্চিত করিয়া নিজের ফাঁকা মুহূর্ত্তগুলিকে হাসি-গল্পের দ্বারা পূরণ করিয়া লইবে? তাহার চেয়ে, কলিকাতার পথে পথে ঘুরিলেও তো অনায়াসে সময় কাটিয়া যায়। চক্ষুর কার্য্যকরী শক্তি এখানে সহস্রগুণ—যা কিছু নূতন দেখাইয়াই তো মনকে সে ভুলাইতে পারে। মানুষের হাতের রচনা বিশ্বশিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে। যেখানে যেটি রাখিলে মানায় সেইখানেই সেটি রাখা হইয়াছে—শিথিল ভঙ্গির কোন চিহ্নই নাই। প্রথম দর্শনে মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে বই কি!

ঘুরিতে ঘুরিতে অমিয় ময়দানে আসিয়া পড়িল। এখানে ভ্রাম্যমান নরনারীর অভাব নাই। চীনাবাদাম, ডালমুট ভাজা, সুগন্ধি গোলাপ জলে ভিজানো আক, কচি শসা দুইখানা করিয়া কাটা, আলু-কাব্লি ও ফুচ্কা কচুরি ইত্যাদির বোঝা লইয়া অক্লান্তকর্ম্মী হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা এধার ওধার ঘুরিতেছে। উহারা প্রকৃতিকে হয়ত বা বাল্যকাল হইতেই তুচ্ছ করিতে শেখে, এবং মানুষের মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারে; হাঁটিতে হাঁটিতে যে-পথিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিংবা সামান্য তৃষ্ণায় যাহার মুখকান্তির আর্দ্রতা কমিয়া আসিতেছে, তাহারই কাছ ঘেঁষিয়া মনভুলান স্বরে বিক্রেয় জিনিষের রসনারোচক নামগুলি উচ্চারণ করে কি করিয়া? হাঁটু পর্য্যন্ত ময়লা ছেঁড়া কাপড় তুলিয়া, ঈষৎ ফরসা ফতুয়াটি গায়ে চাপাইয়া এবং ময়লা একটি কাপড় বা গামছা মাথায় বাঁধিয়া মাঠের মধ্যে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কত ক্রোশই যে ইহারা অতিক্রম করিতেছে! আগেকার দিনে গিনির মালা গলায় গাঁথিয়া সঞ্চয়কে সঙ্গে লইয়াই ফিরিত, এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মহিমা ইহারা বুঝিয়াছে। ভিক্ষায় সম্মান রক্ষা করার ধাতু ইহাদের প্রকৃতিগত নহে; মরুভূমির মধ্যে জলাভাবে ও সরস খাদ্যাভাবে যাহাদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠিতে পারে, বাংলা মুলুকের সহস্র রকমের প্রলোভন তাহাদের বিলাসী করিয়া তুলিবে কোন্ পথ দিয়া। সুতরাং মন তাহাদের দৃঢ়, চক্ষু তাহাদের সেই জন্মপল্লীর বালুসমুদ্র-অভিমুখী; প্রবাসের দীর্ঘতর দিন কাটাইতে মমতা বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন অনাবশ্যক মনে করে।

অমিয় এক পয়সার চীনাবাদাম কিনিল। ময়দানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার সময় বা একা একা বেড়াইবার সময় মন এবং চক্ষু যখন তন্ময় হইয়া থাকে, তখন অজ্ঞাতসারে রসনাকে সহযোগী করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করে না। পকেট হইতে একটি একটি বাদাম

বাহির করিয়া হাতে খোসা ভাঙিয়া যখন সে রসনাকে উপহার দেয় এবং দন্ত ও জিহ্বা সাহায্যে তাহা উদরসাৎ হয় তাহা হয়ত দৃশ্য-দর্শনরত চক্ষু ও কল্পনাবিভোর মনের অগোচরই থাকিয়া যায়। কোন কিছু না থাকিলে শুধু বেড়াইতে বেড়াইতে বাদাম চিবাইবার সময়টিও উপভোগ করা যায়।

রবিবারের দ্বিপ্রহর হইলেও ভ্রাম্যমাণ নরনারীর অভাব ছিল না। সূর্য্যের তাপ আছে, গাছের ছায়ায় বসিয়া কেহ গল্প, কেহ বা গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে। কেহ পকেট হইতে আড়-বাঁশী বাহির করিয়া ফুঁ দিতেছে।

গাছতলায় না বসিয়া অমিয় মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

"অমিয়বাবু যে, নমস্কার।"

অমিয় দেখিল ফণীবাবু আধশোওয়া অবস্থায় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন।

ফণীবাবুর সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সে তাহার পাশে গিয়া বসিল।

ফণীবাবু উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "শ্যামবাজার থেকে পাল্লা মেরে এসেছেন এত দূর বেড়াতে?"

অমিয় বলিল, "একা-একা বাসায় ভাল লাগল না, দিনের বেলায় ঘুমোনো অভ্যেস নেই। আপনি কেন এলেন?"

ফণীবাবু বলিলেন, "আমি তো প্রতি রবিবারই আসি। সপ্তাহে এই একটি দিন মাত্র প্রকৃত ছুটি পাই।"

অমিয় বিস্মিতনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

ফণীবাবু বলিলেন, "আপনি ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবেন না।

আপনারা তো সুখী লোক মশায়। আপিসটুকু করলে রোজই পাঁচটার পর ছুটি, আমার অদৃষ্টে সে-সুখটুকু জোটে না।”

অমিয় বলিল, “আর কোন কাজ করেন বুঝি?”

ফণীবাবু সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “বড়বাবুর বাড়ীতে এটা-ওটা করতে হয়। লোকটি আপিসে দেখেন এত কড়া, কিন্তু সংসারের কোন কাজ করতে হ’লেই পাঁচ বছরের ছেলের চেয়েও অবোধ। তাঁকে চালিয়ে নিতে হয়।”

“তাঁর সংসার দেখেন তো আপনার সংসার দেখেন কে?”

“দেখেন ভগবান। বউটা শক্ত—চালিয়ে নিতে পারে। বিশ্বজিৎদার ওখানেই বাসা—ওঁরাও আপনার মত দেখেন। ভাবছেন রবিবার দিনটা তো অনায়াসে···কিন্তু মশায়, সাধ ক’রে আগুনে হাত দিলে কি পোড়ে না? পোড়ে। একেই তো বউ আমার উপর খাপ্পা হয়ে থাকে, তার উপর এমন দুপুরটুকু হাতে পেয়ে নষ্ট করি কেন!” একটু থামিয়া বলিলেন, “সে জানে না যে আমি ময়দানে আসি। জানে বড়বাবুর বাড়ীতে রবিবারের দুপুরেও কাজের ভিড়। অথচ বড়বাবুর কাছে বলা আছে—রবিবার সকালে এক বার দেশে না গেলে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা হয় না। কাছেই দেশ, বড়বাবু আপত্তি করেন না।”

অমিয় ফণীবাবুর কথায় কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, “ধরুন এই সময় বড়বাবু যদি হঠাৎ বেড়াতে এসে আপনাকে দেখতে পান?”

ফণীবাবু বলিলেন, “তা হ’লে বলব, এই মাত্র দেশ থেকে ফিরছি; এই দেখুন, গামছাটিও সঙ্গে আছে।”

“যদি আমি ব’লে দিই আপনি দেশে যান নি?”

“তা কি কেউ লাগায় নি ভাবেন? বহু বার লাগিয়েছে। স্ত্রীর

হঠাৎ অসুখ করেছে বলে দেশে যেতে পারি নি—এ কৈফিয়ৎও কত বার দিতে হয়েছে।”

অমিয়র কৌতুক-প্রবৃত্তি কখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সে বলিল, “এই রকম মিথ্যা লুকোচুরি খেলতে আপনার ভাল লাগে?”

ফণীবাবু হাসিলেন, “আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। আপিসের খাটুনির পর বাড়ীতে নিত্যি হাঁড়িঠেলা আপনার ভাল লাগে? নিত্যি বাজার করা, এখানে ওখানে ছোটা, ফায়-ফরমাস খাটা আপনি পারেন? একাধারে চাকর ও রাঁধুনী—”

অমিয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, “এই আপনার কাজ! অথচ দেশে বলছেন জমি আছে—”

ফণীবাবু বলিলেন, “জমি থাকার রস কত জানেন না তো। এক কাঁড়ি টাকা খাজনা গুনতে জিব বেরিয়ে যায়। ভাগে জমি দেওয়া, যে-বার হয় দু-এক মণ পাই, যে-বার হয় না, আপিস থেকে টাকা ধার ক'রে খাজনা মেটাই। বাপ-পিতামো যদি ঐ জমির আপদ না রেখে যেতেন কোন্ হতভাগা, মশায়, চাকরি করত?”

অমিয় বলিল, “এখনও তো জমি বেচে দিতে পারেন?”

ফণীবাবু বলিলেন, “দুটি ভাই নাবালক, কার জমি বেচব? আর এক বিঘে কিনতে পারলাম না, নষ্ট করব? আর সব পারি মশায়, বাপ-পিতামোর নাম ডুবোতে পারি না।”

দুই জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ফণীবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া বলিলেন, “বিড়ি খাবেন?”

“আমি বিড়ি খাই নে।”

দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ফণীবাবু বিড়ি ধরাইলেন। এক মুখ ধোঁয়া

ছাড়িয়া ফণীবাবু খুশী মনে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেবেলায় যাত্রার ছড়া শুনেছিলাম,

'অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল
তার সাক্ষী দেখ দময়ন্তী নল।'

বড় বড় রাজারাজড়া যা খণ্ডাতে পারেন নি, আমরা তো কোন্ ছার।"

অমিয় বলিতে যাইতেছিল, আমাদের শিক্ষানুযায়ী আমাদের অদৃষ্ট তো আমরাই তৈয়ারী করিয়া লই, কিন্তু সে-কথা সে উচ্চারণ করিল না। সে-কথা উচ্চারণ করিয়া কোন লাভ নাই।

ফণীবাবু বলিলেন, "আপনার এই দুপুর বেলাটি কেমন লাগে?"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি।"

ফণীবাবু বলিলেন, "সত্যি বলতে কি মশায়, এখানে শুয়ে বিড়ি টানতে, বাদাম চিবুতে, বা একটু ঘুমুতে কার না ভাল লাগে। ও কি উঠছেন যে?"

"চলি—অনেকক্ষণ তো হ'ল।"

"আমাদের বাসায় যাবেন? বিশ্বজিৎদা তো বাসায় নেই।"

"কোথায় সে?"

"হয়ত কোথাও বায়স্কোপ দেখতে গেছে। তা চলুন না, আমার বউ আছে, এক পেয়ালা চা আপনাকে খাইয়ে দিতে পারব।"

"চা আমি ভালবাসি না।"

"আহা—খান তো? ওদের মত মিষ্টি চা তৈরি না করতে পারলেও বউয়ের হাতেও চা নেহাৎ মন্দ হয় না।"

"ফণীবাবু—", অমিয় রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "আপনি যা জানেন না, তা নিয়ে কথা কইবেন না। চা খাবার জন্য আমি ঠিক ওখানে যাই না।"

ফণীবাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "তা আমরা জানি, চা ছাড়াও—"

অমিয়র মুখে অনেকখানি রক্ত জমিয়া উঠিল; পরুষ কণ্ঠে সে বলিল, "চা ছাড়াও আর কি আছে বলুন? বলুন—", কথার শেষে সে ফণীবাবুকে একরূপ ধমকই দিল।

ফণীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "রাগ করছেন কেন, বন্ধুত্ব না থাকলে কেউ কারও কাছে যায় না—সে তো সবাই জানে।"

অমিয়র রাগ পড়িয়া গেল, কিন্তু মনের জ্বালা মিটিল না। ফণীবাবু সরল বা নির্ব্বোধ নহেন, হাসির সঙ্গে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার মুখের ভাবকে রহস্যে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল, অমিয়র ক্রোধের মুহূর্ত্তে তাহা তিনি দমন করিয়া ফেলিলেন। না জানি এই সামান্য বন্ধুত্বের সূত্র লইয়া অসাক্ষাতে আলোচনার জের ইঁহারা কত দূর টানিয়া থাকেন? সে আলোচনার মর্ম্ম কি বিশ্বজিৎ বোঝে না? অথবা, বুঝিয়াও উপেক্ষা করে।

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া ফণীবাবু বলিলেন, "আপনারা হঠাৎ কলেজ থেকে বেরিয়ে আপিসে ঢুকেছেন, মনে করেন, সব সময়ে সত্য কথা বলাটাই নিরাপদ? তা নয় অমিয়বাবু। আপিস তো নীতি-শিক্ষার স্থান নয়। পরশু—হ্যাঁ, পরশুই তো, শুনলাম আপনি বিশ্বজিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন—'আচ্ছা আপিসে এরা কথায় কথায় এত অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে কেন?' বিশ্বজিৎ উত্তর দিলেন, 'শিক্ষার অভাব।' সেটি কিন্তু সত্য কথা নয়। এমন অনেক শিক্ষিত আছেন যাঁরা খারাপ কথা দিনরাত বলে থাকেন।"

"কেন বলেন?"

"যে-খাটুনি তাঁরা খাটেন, তা যখন অসহ্য বোধ হয় তখনই মনে স্ফূর্ত্তি আনবার জন্য বলেন। যে-খাটুনি খাটেন তার তুলনায় মাইনে পান কম—তাই হয়ত বলেন।"

"তাহলে এঁরা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ?"

"তা তো বটেই। আমরা, যারা মুখে রক্ত তুলে খেটে মরি, তাদের মাইনে ত্রিশ থেকে আশী। তাদের সামান্য ভুলে মাইনে কমে, সার্ভিস-শীটে ব্যাড্ মার্ক হয়, ইন্‌ক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়; আর যাঁরা গদিয়ান হয়ে ব'সে আয়েস করতে করতে চুরুটের টানের সঙ্গে কলমের টানটি দিয়েই খালাস, তাঁদের গ্রেডের আরম্ভ আড়াই-শ থেকে! বলেন কি মশায়, এত বড় অবিচার ধর্ম্ম কত দিন সইবেন ?"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "ধর্ম্ম বহুকাল থেকে অনেক কিছুই সয়ে আসছেন, এটুকুও আমাদের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত হয়ত হাসিমুখেই সইবেন। কিন্তু ফণীবাবু, যখনই আমরা যোগ্যতার কথা ভাবি, তখনই হিংসার ভাবটি মনে জাগে এই বড় আশ্চর্য্য, নয় কি ?"

ফণীবাবু হাঁ করিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "হিংসা! হিংসা কোথায় ?"

"কোথায় যে হিংসা তাই যদি বুঝব তো যোগ্যতার বিচারে ভুল করব কেন! আমরা যখন মিথ্যা বলি,—তার পরমুহূর্ত্তে কি ভাবি কেন মিথ্যা বলছি ? ভাবি না, শুধু বলার জন্যই বলি। কাজ করি, কেননা কাজ না-করলে পেট চলে না তাই; কাজের মধ্যে কোথাও ইন্‌টারেষ্ট সৃষ্টি করতে ভালবাসি না।"

ফণীবাবুর বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখিয়া অমিয় সহসা সচেতন হইল। আবেগ দমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "চলুন বাসায় গিয়ে এক দিন না-হয় স্ত্রীর কাছে সত্য কৈফিয়ৎই দেবেন। তাতে তিনি রাগ নাও করতে পারেন।"

ফণীবাবু বলিলেন, "বেশ আছেন! সে রণচণ্ডী মূর্ত্তির সামনে এই দুপুর বেলায় দাঁড়াব আমি ? তার চেয়ে মিথ্যা কথা বলা ঢের সহজ।"

অমিয় উঠিয়া বলিল, "তা হ'লে সহজ কাজই করুন। আমি চল্লাম।"

বিশ্বজিৎ বায়স্কোপে যায় নাই, দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া নলিনদার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। নলিনদার মুখখানি শুষ্ক, বিশ্বজিতের চোখে উদ্বেগের ছায়া। অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "শুনেছ অমিয়, চারুদার খবর?"

"না তো!"

"কাল রাত্রিতে সার্কুলার রোড পার হতে গিয়ে হঠাৎ একখানা ট্যাক্সির সামনে গিয়ে পড়েন। ড্রাইভার ব্রেক্ কসতে কসতেই চারুদা গেলেন চাকার তলায়।"

"ইস্! তারপর?"

"তারপর আর কি—সোজা হাসপাতাল। এই মাত্র নলিনদা সেখান থেকে আসছেন। অবস্থা ভাল নয়, আজকের দিনটা টেকেন কি না সন্দেহ!"

অমিয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। চারুদা তাহার সঙ্গে প্রথম আলাপ-প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেইগুলি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল: 'আর ভাই, আপিসের গো-খাটুনির পর এই ক্লাবে এসে একটু জুড়োতে পাই। পাই তো আশী টাকা মাইনে, তিন ছেলে, চার মেয়ে, তাদের পড়াশুনার খরচ, এখানে বাসাভাড়া, বাড়ীতে মস্ত সংসার···মন্দ কি এই ক্লাব।'

আজ কোথায় ক্লাব, কোথায় সংসার, আর আশী টাকা মাহিনার কেরানী চারুদাই বা কোন্ পথে পা বাড়াইয়াছেন!

অমিয় আকুল স্বরে বিশ্বজিৎকে ঠেলা দিয়া বলিল, "চল, তাঁকে দেখে আসি।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ছ-টার সময় নলিনদা আমাদের ডেকে নিয়ে যাবেন। চল একটু চা খাবে।"

নলিনদা বিদায় লইতেই অমিয় বলিল, "যদি বিধাতা থাকেন, এ তাঁর সত্যই অবিচার। কেন তিনি দুঃখের উপর মানুষকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কিন্তু তিনি যে নেই, অমিয়। আমরা আঘাত পাই, আবার আমরা এক দণ্ডে শেষ হয়ে যাই; যেমন পশুর নিয়তি, তেমনই মানুষের। এর সঙ্গে আর এক জনের মহিমাকে কেন অনর্থক খর্ব্ব কর। কাল চারুদার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, তাই আজ এ দুঃসংবাদকে মনে স্থান দিয়েছ। অজ্ঞাত রমেনের মৃত্যুর জন্য এই মুহূর্ত্তে তোমার মন কাঁদবে কি?"

"যাকে আমি জানি না, তার সম্বন্ধে—"

"তাহলেই তোমার মনের মায়ায় তুমি হাসছ, কাঁদছ। চীনে হাজার হাজার লোক জাপানীর বোমায় কীটপতঙ্গের মত প্রাণ দিয়েছে শুনে বড় জোর তুমি বিস্ময় প্রকাশ করতে পার। জাপানীদের বর্ব্বরতাকে ধিক্কার দিতে পার, কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে তোমার প্রতিবেশী কালু সেখকে টিনের চালা চাপা পড়ে মরতে দেখলে তুমি আর্ত্তনাদ করে উঠবে। দুঃখ গ্রহণ করে তোমার মন। তার গণ্ডীর মধ্যে আঁকা যে-বৃত্তগুলির উপর সে ঘুরে বেড়ায় তাদের সুখদুঃখে সে সচেতন, অন্য কোথাও নয়।"

"কিন্তু চারুদার জন্য আমার মন সত্যই কাঁদছে। অমন সরল লোক—"

"চল, চা খাবে।"

"না বিশ্বজিৎ-দা, চা এখন ভাল লাগবে না।"

"বসবে চল, পথে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে চারুদা কি তোমার ভাল হয়ে উঠবেন ?"

ষ্টোভ জ্বালাইয়া সুপর্ণা কিন্তু চা তৈয়ারী করিল এবং অমিয়র সম্মুখে পেয়ালা ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চা খান ঠাকুরপো।"

অমিয় বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার প্রতিবেশীরা আমার চা খাওয়া হয়ত পছন্দ করেন না।"

সুপর্ণা সরিয়া গেলে বিশ্বজিৎ বলিল, "কেন ?" একটু থামিয়াই উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলিল, "তা জানি।"

"কি জান, বিশ্বজিৎ-দা ? কিছুই জান না।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "হাজার হোক তোমার দাদা আমি—বয়সে বড়। কলকাতায় এক বাসায় সাত-আট ঘর লোকের সঙ্গে পনর বছর কাটিয়ে এলাম ; জানি বইকি কিছু কিছু !"

"তুমি লোকের জিবকে ভয় কর না ?"

"লোকের জিবকে শাসন করার শক্তি যখন নেই, তখন ভয় করব কেন ? যারা সত্য কথা বলতে ভয় পায়, তাদের আলোচনা আড়ালেই চলে ; আমার বা সুপর্ণার কানে তার বাষ্পবিন্দুও পৌঁছয় না।"

"যদি পৌঁছয় কোন দিন ?"

"সুপর্ণাও হাসে, আমিও হাসি। সেদিন বাড়ীতে ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থাও করে ফেলি।"

অমিয় বলিল, "তোমার মন শক্ত হ'তে পারে, বউদিরও কি—"

"তাহ'লে তোমার বউদির মুখেই শোন। সু, শোন তো একবার।"

সুপর্ণা আসিলে অমিয়র মুখ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। এই কথা নাকি বিশ্বজিৎ স্ত্রীর সম্মুখে পাড়িবে ?

কিন্তু অমিয়র লজ্জা অহেতুক। বিশ্বজিৎ সুপর্ণাকে রহস্য করিয়া

বলিল, "চায়ে তুমি মিষ্টি কম দিয়েছ, তোমার ঠাকুরপো অনুযোগ করছেন।"

সুপর্ণা তাড়াতাড়ি চিনির টিনটা তুলিয়া অপ্রতিভ মুখে বলিল, "আমরা কম চিনি খাই, তাই—"

অমিয় বিশ্বজিতের কল্পিত অনুযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল না, দু-চামচ বেশী চিনিই লইল এবং সরবতের মত সবটুকু চা গলাধঃকরণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বিশ্বজিৎদার কমন্‌সেন্স আছে, কেমন বাঁচিয়ে দিলেন সিচুয়েশন্‌টা!"

পাঁচটার সময় দরজার বাহিরে নলিনদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অমিয় ও বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে সেই সঙ্কীর্ণ গলিতে দশ-বার জন লোক নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, সকলের মুখেই আসন্ন বিপদের ছায়া। কথা দূরে থাকুক, জোরে নিশ্বাস টানিতেও ইঁহারা সঙ্কুচিত। পরস্পরের মুখের পানে নীরবে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবেই সেই দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিলেন।

বিশ্বজিৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সব শেষ বুঝি?"

নলিনদা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সব শেষ।"

পুনরায় বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কখন খবর পেলেন?"

"চারটে বত্রিশে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনারা বোধ হয় তৈরি হয়েই এসেছেন?"

নলিনদা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, খাটিয়া নিয়ে রমেনরা কলেজে গেছে, এঁরা ফুল কিনে এইমাত্র এখানে এলেন।"

একটি ছোকরা ফুলের চুবড়িটা নলিনদার সম্মুখে রাখিল।

বাতাসে চুবড়ির মুখের কলাপাতাখানি উড়িয়া যাইতেই দেখা গেল

এক রাশ গোলাপ ও গন্ধরাজের সঙ্গে একগাছি সাদা মল্লিকার গোড়ের মালা ধব্ ধব্ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে সঙ্কীর্ণ গলিটি পর্য্যন্ত উতল হইয়া উঠিল। আশী টাকা মাহিনার কেরানীর ভারাক্রান্ত জীবনে বিবাহের দিন ছাড়া এমন ঐশ্বর্য্য ও এতখানি সম্মান লাভ কোন শুভ মুহূর্ত্তে আর হয়ত ঘটিয়া উঠে নাই!

১৩

সোমবার বেলা দশটা হইতে পুনরায় কর্ম্মজগতের কোলাহল সুরু হইল।

দাদা বলিলেন, "শম্ভু ভাই, কাল ট্যাংরায় গিয়ে মাছ যা ধরলাম! ইয়া পাকা পাকা রুই, দু-ঘণ্টার মধ্যে গোটা চারেক।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের এক দিন নিয়ে চলুন না দাদা।"

দাদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দেখব চেষ্টা ক'রে আসছে রবিবার; এস, পান খাও।"

শম্ভুচন্দ্র পান মুখে দিয়া বলিলেন, "শুনেছেন শনিবারের খবর?"

"না তো!" দাদা কচি ছেলের মত বিস্ময়ে আকুল হইয়া উঠিলেন।

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "হরেন—ঐ রেকর্ড-কীপারের কাজ করে—এক তাড়া কাগজ পেট-কাপড়ে লুকিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। পড়বি তো পড়্ বড়বাবুর চোখে। পেটের কাছটায় উঁচু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি পিলে হয়েছে হরেন, রোজ জ্বর হয়?' হরেন বললে, 'কই, না তো?' 'এস তো এদিকে!' ব'লে বড়বাবু হঠাৎ তার পেটে হাত দিলেন। হরেন কেঁদে বললে, 'কি করি বড়বাবু পঁচিশ টাকা মাইনে পাই, কাল ছেলেটা এসে কেঁদে বললে খাতা না হ'লে ইস্কুলে মাষ্টাররা বকেন।' 'তাই ব'লে চুরি করবে?'—বড়বাবু ধমকে উঠলেন।...হরেন

বড়বাবুর পা জড়িয়ে ধরে কি কান্নাটাই কাঁদলে! বড়বাবুর দয়া হ'ল—কথাটা আর সায়েবের কানে তুললেন না, শুধু বললেন, 'সব সময় মনে রেখো ভগবান সম্মুখে আছেন, আমি না হয়ে অন্য কেউ হ'লে তোমার চাকরি যাওয়া আজ ঠেকাত কে?"

দাদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বটে! হরেন নেহাৎ ভালমানুষটি—মুখ দিয়ে রা বেরোয় না, তার পেটে পেটে এত!"

পিছন হইতে কে জবাব দিল, "সে বেচারি তো ত্বখানা কাগজ চুরি ক'রে চাকরিটি খোয়াতে বসেছিল, আর কত বড় বড় মহাপুরুষ যে গুদাম সাবাড় ক'রে দিব্যি মাইনে বাড়িয়ে রাজত্ব করছেন! কোম্পানীর মাল—কারও দরদ আছে কি? এখানে কি রকম জান?" বলিয়া খগেনবাবু দাদার পানের ডিবা হইতে গোটা তুই পান তুলিয়া মুখে পুরিলেন এবং এক চিমটি দোক্তা গালে দিয়া আরম্ভ করিলেন, "বহু দূর ব্রাঞ্চ-লাইন থেকে খবর এল—বড় জলকষ্ট, ষ্টেশনের ধারে একটি পুকুর কাটিয়ে না দিলে যাত্রীদের প্রাণ যায় যায়। শ-খানেক সই বুকে ক'রে খানকতক দরখাস্তর কাগজ ফাইল-জাত হয়ে হেড আপিসে এল। হুকুম হ'ল পুকুর কাটাও। দশ হাজার টাকা মঞ্জুর। বছরখানেক পরে আবার রিপোর্ট এল এবার বর্ষায় পুকুরের জল যা বেড়েছে তাতে লাইনের অবস্থা ভীতিপ্রদ—অবিলম্বে পুকুর না বোজালে লাইন টেঁকানো মুস্কিল হবে। হুকুম হ'ল, পুকুর বোজাও। বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর। আসলে কি জান, কাগজেই পুকুর কাটানো এবং পুকুর বোজানো হ'ল—আর ত্রিশ হাজার টাকা···হুঁ-হুঁ বাবা, তু-খানা কাগজ নিয়ে এত!"

দাদা বলিলেন, "তোমার নেহাৎ গল্প!"

খগেনবাবু বলিলেন, "পুকুরেরটা না হয় গল্প, কিন্তু আপিসের কপিইং পেনসিল, কাচের পেপার-ওয়েট, ভাল কালি, ভাল কলম, মোমবাতি,

ঝাড়ন, স্পিটুন, কাচের দোয়াত, এগুলির কি পাখা গজায় নাকি! তিন মাস অন্তর ইন্‌ডেন্ট তো হয় দেখি; পেয়েছ কোন দিন ওর কোনটি?"

শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষাতে দাদা সঙ্কুচিত হইয়াই ছিলেন, বলিলেন, "যেতে দাও ও-সব কথা, কাজ করা যাক্।" শম্ভুচন্দ্র চলিয়া গেলে চোখ টিপিয়া নীচু গলায় বলিলেন, "বাজার থেকে কিনে নিব চালাচ্ছি, কলমটিও আপিসের নয়।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ইচ্ছে করে দিই ধরিয়ে চুরি! কিন্তু কার চোখ ফোটাব বল। যাঁদের মাইনে মোটা—এখানে তাঁদের কথাই বেদবাক্য! দরখাস্ত ক'রে আমরাই হয়ত শেষকালে চোর বনে যাব!"

"কেন?"

"কেন আবার! উপরওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে তুমিই তখন বলবে, কেন, মাস-মাস তো আমরা কাগজ, কলম, নিব পাই।"

দাদা বলিলেন, "আমি বলব একথা! কি যে বল, খগেন ভাই!"

এমন সময় রাজেন বলিয়া একটি ছোকরা দাদার পিছনে দাঁড়াইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "হাতে ওখানা কি রাজেন?"

"আজ্ঞে প্রেস্‌ক্রিপসন্। আমার ওয়াইফ্ আজ ছ-মাস ভুগছে। ওষুধ কিনতে কিনতে তো সব বিকিয়ে ফেললাম, মশাই।"

"কি অসুখ?"

"ডাক্তার তো বলে বেরিবেরি। প্রথম প্রথম পা ফুলত, এখন হার্ট অ্যাফেক্ট করেছে। চোখের অবস্থাও ভাল নয়।"

"বটে, তা খাওয়াচ্ছ কি?"

"দুবেলা রুটি—টম্যাটোর জুস্, ভাল ডিম, ফলপাকুড়, আর ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ভিটামিন এ টু জেড্।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ঐ পেটেণ্ট ছাইভস্মগুলির বদলে কিছু টাট্কা খাঁটি দুধ খাওয়াও—রোগী বল পাবে।"

রাজেন হাসিল, "গরুর দুধ ছেড়ে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারি—আমাদের কি, ডুবেছি, না ডুবতে আছি। আচ্ছা দাদা, আমাদের মত গরিবের ঘরেই কি যত রোগ?"

দাদা বলিলেন, "ভগবান পর্য্যন্ত শক্তর ভক্ত, তা রোগ তো রোগ! বড় লোক আর ক-টা ডাক্তারকে পোষে বল, আমরাই তো বলতে গেলে ডাক্তারের অন্ন, ঐশ্বর্য্য। যারা ভাল খায়, বছরে শরীর খারাপ না হ'লেও চেঞ্জে যায়, ঠাণ্ডায় গরম কাপড়ে শরীরকে মুড়ে রাখে, গরমে খস্খস্ টাঙিয়ে বা সিমলে-দার্জ্জিলিঙে পালিয়ে গরম থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের সঙ্গে রোগ কোন্ দুঃখে মোলাকাৎ করবে বল তো, ভাই?"

খগেনবাবু বলিলেন, "ভগবানের রাজত্বে এ-বিধান অন্যায়। এক জন টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর হাজার জন না খেয়ে মরবে!"

বিশ্বজিতের কানে কথাটা গিয়াছিল। সে উত্তর দিল, "দাদা, এ হ'ল নিছক কম্যুনিজম্। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব, রুশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপন—এ-সব ইতিহাসচর্চ্চা আপিসে কেন?"

খগেনবাবু রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "তাই বলে সত্য কথা বলব না?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আজ আপনি যদি বড়বাবু হন, খগেনবাবু, আপনি সর্ব্বপ্রথম কি চাইবেন জানেন? নিয়ম আর শৃঙ্খলা। আপনি যোগ্যতার উদাহরণ কথায় কথায় দেবেন। যারা চিরকাল দুঃখ বহন করে আর কাঁদে—তাদের বলবেন, স্বভাবের দোষে ওরা অমন। যেমন অবস্থা তেমন ভাবে চললেই তো কোন গোল থাকে না। ক্ষমতা মদের মত, যে খায় সে তো মাতাল হয়ই, যে খায় না, তার চোখেও ঘোর লাগে। যে পায় না, তার হিংসে বাড়ে। কাজেই ভগবানকে টেনে

এনে অক্ষম অভিযোগগুলি পেশ ক'রে আমরা দুর্ব্বল কম্যুনিজম্ প্রচার করি। আসলে আমরা বঞ্চিত, দরিদ্র এবং সঙ্কীর্ণমনা।"

খগেনবাবু টেবিলে চাপড় মারিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "তুমি আমাদের নীচ বলছ?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমি এবং আপনি, এবং আরও অনেকে। এ তো সত্যি কথা—আমাদের ভিতরের ডিফর্মিটি বাইরের সুন্দর জামা-কাপড়ে আমরা ঢেকে রেখেছি ব'লে সত্যিই কি আমরা বিকলাঙ্গ নই? আজ আপনার মাইনে বাড়লে আপনি কি মাইনে-বাড়া নিয়ে আন্দোলন করবেন, না ইকনমি পলিসিকে সাপোর্ট করবেন?"

খগেনবাবু পুনরায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্ব্বেই শম্ভুচন্দ্র ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, "এই মাত্র ডেপুটির কাছে সার্কুলার এল—টেন পার্সেন্ট ওয়েজ-কাট!"

দেখিতে দেখিতে দাদার টেবিলের ধারে সমস্ত সেক্‌শন আসিয়া জড় হইল। কাহারও মুখে কথা সরিল না, বিনা বাক্যব্যয়ে ও অবনত মুখে দোষী যেমন বিচারকের মুখ হইতে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়, সকলের অবস্থা তেমনই স্থাণুবৎ।

খগেনবাবু শান্তির পানে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার চালাও তোমার আপীল!"

দাদা সনিশ্বাসে বলিলেন, "আর আপীল! ফাঁসির রায় দেবার পর—আপীল!"

শান্তি শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় বলিল, "একবার এসোসিয়েশনের থ্রু দিয়ে—"

রাজেন বলিল, "কমাক না মাইনে, কাজও পাবে তেমন, এক ঘণ্টা টিফিন ভোগ করি, তখন এক ঘণ্টা খাটব, আর সব ঘণ্টা ফাঁকি দেব।"

শান্তি বলিল, "তাতে কোম্পানীর তো বড় লোকসান! তোমার কাটা মাইনেটা ফিরে পাবে যাতে সেই চেষ্টা কর।"

রাজেন বলিল, "ছাই চেষ্টা। সাপ যখন মাথায় কামড়েছে—তখন তাগা বাঁধা মিছে।"

বৃদ্ধ নিত্যহরি বলিলেন, "যখন লাভ হয় তখন তো বলে না গ্রেড বাড়িয়ে দাও। লোকসানের বেলায় আমরা!"

সুরেন বলিলেন, "না পোষায়, চাকরি ছেড়ে দাও।"

নিত্যহরি ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "চাকরি ছাড়ে সব মিঞা। আধা মাইনে ক'রে দিলে হাসিমুখে সুড় সুড় ক'রে চেয়ারে ব'সে কলম নাড়বেন। যাদের কলম মাত্র ভরসা তাদের কেউ গ্রাহ্য করে নাকি?"

শান্তি বলিল, "তাতেই তো লেখার জোর আসে না। আজ আমরা সবাই মিলে যদি আপিস ছাড়ি, কাল নয়, এক ঘণ্টা পরেই দেখবে সেক্‌শান ভর্ত্তি; খাতা-কলমে কাজের কোন কদর নেই।"

সুরেন বলিল, "এই সব রেকর্ড-পত্র যদি নষ্ট করে আমরা আপিস ছাড়ি?"

শান্তি বলিল, "বড় বয়েই গেল। নূতন রেকর্ড আরম্ভ হবে। কিছু টাকা হয়ত লোকসান হবে—তাতে কোম্পানীর ভারি ক্ষতি!"

অমিয় হিসাব করিল, ত্রিশ টাকার দশ পারসেণ্ট আর কতই বা। আপিসে ঢুকিয়া প্রথম মাস হইতেই তাহাকে কাটা মাহিনা লইতে হইবে। কতই বা কম? এক জোড়া জুতা কিংবা শাড়ী এক জোড়ার দাম। জুতাটা পরের মাসে কিনিলেও চলিবে, শাড়ী নহিলে মানুষের লজ্জা নিবারণ হয় কিসে?

এমন সময় বড়বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

কাগজপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "শুনেছ সব?

আসছে মাস থেকে শত করা দশ ভাগ মাইনে কমে কাজ করতে হবে।"

কে এক জন বলিল, "এ যে মার্চ্চেন্ট আপিসেরও অধম ক'রে তুললে। সায়েবরা কেন প্রোটেষ্ট করুক না।"

বড়বাবু বলিলেন, "প্রোটেষ্ট করবে কে? একেবারে খোদ কর্ত্তার হুকুম—কেরানী অফিসার কেউ বাদ যাবে না। ডেপুটিকে বলতেই হেসে কি বললেন জান? বললেন—বনার্জ্জি, তোমাদের টেন পারসেণ্ট আর কতই বা, আমার পনর-শয়ে যাবে দেড়শ। ভাব দেখি একবার কি অবস্থা!"

ফণীবাবু সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আহা।"

বড়বাবু মুখ ভেংচাইয়া বলিলেন, "আহা! কি আমার সায়েবের উপর দরদ রে! ওদের তো ভারিই ক্ষতি তাতে। নিজের মুখেই তো বললে, একটা রেস আর গোটা দুই টি-পার্টি মাসে কমাতে হবে দেখছি। আমাদের কি ক্ষতি হবে জান?"

বিশ্বজিৎ মনে মনে হিসাব করিল, "আপনার দু'শ-র থেকে কুড়ি কমলে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বইতে কিছু কম অঙ্ক হয়ত জমা পড়বে, কিন্তু আমাদের ষাটের ছয় কমলে খোকার দুধ কমিয়ে বালির ব্যবস্থা হবে, না হয় চায়ের নেশা তুলে দিতে হবে।"

মাহিনার দিন আপিসের মধ্যে কোলাহলটা বেশীই বোধ হইল। আপিসে এবং আপিসের বাহিরে অনেক রকমের অচেনা লোক দেখা গেল! পাগড়ি মাথায় লম্বা লাঠি কাঁধে গণ্ডা কয়েক কাবুলী শিকারী বিড়ালের মত ওৎ পাতিয়া পায়চারি করিতেছে, খোট্টা মহাজন লাল

খেরো-বাঁধান খাতা হাতে ও বাঙালী পাওনাদার নোট-বুক লইয়া এধার ওধার ঘুরিতেছে। পানওয়ালা, চাওয়ালা, খাবারওয়ালা, শালওয়ালা ইত্যাদি ওয়ালারাও সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে কেরানীদের ব্যস্ততারও অন্ত নাই। মাহিনা লইয়া কেহ সুড়ুৎ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে, কেহ পাশ কাটাইয়া পানের দোকানে আড্ডা জমাইতেছে, কেহ বা কাবুলীর লাঠি ধরিয়া শুষ্ক হাসির দ্বারা রসিকতা করিয়া কিছু সময় চাহিতেছে। গালিগালাজ এবং মন-কষাকষিও এধার ওধার দেখা যাইতেছে। যে টাকা আদায় করিতেছে তাহার মুখও গম্ভীর, যে দিতেছে তাহার মুখও অপ্রসন্ন। যেখানে বন্ধুত্বের সুতা পলকা, সেখানে কথার আঘাতে সুতায় টান ধরিতেছে, যেখানে কিছু শক্ত, সেখানেও কঠিন বাক্য-বিনিময়ের ফলে মুখে আঁধার ঘনাইতেছে।

রমেন বলিল, "আচ্ছা শান্তিবাবু, জংলা শাড়ী কেমন? ছেলেমানুষ বৌকে মানাবে না?"

শান্তিবাবু বলিলেন, "খগেনবাবুর টাকা শোধ দিয়েছ তো? দিলে কেনাবে তোমায় জংলা শাড়ী।"

রমেন বলিল, "কোত্থেকে দেব—টাকায় এক আনা ক'রে সুদ। সুদ দিতে গেলে আসল শোধ হয় না, আসল শোধ দিতে গেলে উপোস দিতে হয়। মনে করেছি এ-মাসে আর কিছু দেব না, হাতে পায়ে ধরে—"

"পার ভাল।" বলিয়া শান্তিবাবু পিছন ফিরিলেন।

অমিয় কোঁচার খুঁটে টাকা কয়টি বাঁধিতেছিল, পেন্সিল খাতা লইয়া সুরেনবাবু আসিয়া বলিলেন, "কিছু সাহায্য করবেন?"

"কাকে?"

"ওই যে দোরগোড়ায় থান কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রীলোকটি, একটি ন-দশ বছরের ছেলের হাত ধরে—উনি কে জানেন? আমাদের সেকশানে কাজ করত অমৃত, তারই বিধবা স্ত্রী। বেচারার দেশের ঘরবাড়ী দূরে থাক, জমিটুকু পর্য্যন্ত নেই, আজীবন কলকাতায় ভাড়া-বাড়ীতে কাটিয়ে গেল। কোথায় যে দেশ ওরাও হয়ত জানে না। আজ অমৃত নেই, ছেলেগুলি নাবালক, ভিক্ষে ছাড়া ওর উপায় কি?"

"কেন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা কিছু পান নি?"

"যা পেয়েছেন তা দেনা শুধতেই গেছে। অমৃত বেঁচে থাকতে ফাণ্ডের টাকা উইথ্‌ড্র করেছিলেন, কো-অপারেটিভের মোটা ধার ছিল। আর এক বছরের বাড়ীভাড়া দিয়ে তবে সে-বাড়ী থেকে উঠতে দিয়েছে ওঁদের। এখন টালার ওদিকে খোলার ঘর একখানা ভাড়া করে থাকেন। প্রতি মাসে মাইনের দিন ভিক্ষে নিতে আসেন।"

রাজেন পাশ হইতে বলিল, "রোজ রোজ ভিক্ষে দেয় কে? আমাদেরই বলে হাত পাতলে ভাল হয়—তার পরকে ভিক্ষে দেওয়া?"

স্বরেনবাবু বলিলেন, "আপনি দেবেন নাকি কিছু?"

অমিয় হয়ত সাহায্য করিতে পারিত না, কিন্তু কাল চারুবাবুর শ্মশান-সহযাত্রী হইয়া মনটায় তাহার আঘাত লাগিয়াছিল। চারুবাবু বাংলায় একটিই নাই, লক্ষ লক্ষ আছেন। আজীবন ভাড়া বাড়ীতে কাটাইয়া স্ত্রীপুত্রকে পথে বসাইয়া যাইতে ইঁহারা তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। হয়ত অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে সম্মুখে রাখিয়া উৎসবের ক্ষেত্রে ইঁহারা হল-চালনা করেন। হলচালনার ফলে যে-বিষতরুর উদ্ভব হয়, তাহার ফল

সপরিবারে ভোগ করিয়া ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইয়া যান। কে জানে, বীরেনের মতটির কোন মূল্য আছে কি না! ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা সোৎসাহে ধর্ম্মের নামে অশান্তি ও দুঃখকে বহুমুখীন করিয়া বাংলা দেশে প্লাবন আনিবার আয়োজন করিতেছেন, আইনে কেন তাঁহাদের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান নাই?

দুঃখমোচনের সংকল্প থাকিলে কি হয়, ক্ষমতা যে অত্যন্ত সীমাঘেঁষা নিজের সংসারের তট যাহার বালুরাশিভরা, সে দিবে অন্য ভাঙনের মুখে বাঁধ! দুঃখমোচনের চেষ্টাতেও যে বড় দুঃখ জমা আছে—সে কথা এই অক্ষমদের উচ্চ কণ্ঠের সাহায্যে আজ বোঝাইবে কে?

পাওনাদারের মত ভিখারীর ভিড়ও আপিসের দুয়ারে এই দিন বেশী দেখা যায়। কেহ সাজা ভিখারী, কেহ বা সত্যকারের। কিন্তু আসল-নকলের পার্থক্য কোন দাতাই নিরূপণ করিতে পারেন না। যাহারা ধার শোধ দিতেছে, তাহারা ভিক্ষা দিতেও কার্পণ্য বোধ করিতেছে না। রাস্তায় পয়সা হারাইয়া গেলে যেমন ইহাদের দৃকপাত নাই, তেমনি ভিক্ষা দিবার সময়েও কাহাকে ভিক্ষা দিল বা ক-পয়সা দিল এ হিসাব দরিদ্র কেরানী কোন্ দুঃখে রাখিতে যাইবে? চারি দিকের ছিদ্র এক দিকে মাত্র ছাতা ধরিয়া ঢাকা যায় কি?

১৪

১লা এপ্রিল হইতে রেলের টাইম-টেবল্ বদল হইয়াছে, কাজেই ইছাপুর ষ্টেশনে অমিয়দের নূতন গাড়ী থামিল না। বীরেনকে দেখিবার প্রত্যাশা অমিয় করিয়াছিল, এই কয় দিনের ঘটনার স্রোত বীরেনের মতবাদের কূলে তাহার যুক্তির তরীখানিকে ভিড়াইতে চাহিতেছিল, অথচ বীরেনের দেখা আজ পাইল না। সে ভাবিতে লাগিল, পারিবারিক বা

আপিসের গল্পের আকারকে আর কতই বা বাড়াইয়া তোলা যায়? সাহেবের বা বৌয়ের ভালবাসা লইয়া গৌরবের স্তম্ভ রচনা করিলেও মনের মধ্যে অতৃপ্তি একটুখানি থাকে বইকি! বাহিরের কল্পিত ভালবাসাকে, রঙীন ফানুসে বাতি পুরিয়া আকাশ-অভিমুখী বেলুনের মতই কিছুক্ষণ পরম বিস্ময়ের মত প্রচার করিতে পারা যায় হয়ত, মনের গোপন ভালবাসাকে রূপদান করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু আপিস এবং সংসার দুটি ক্ষেত্রের দুই প্রকারের ভালবাসা লইয়া, কবি না হইয়াও, প্রত্যেকের কবিত্ব করিতে সাধ জাগে না কি? নিজের পোযাকপরিচ্ছদ, বাসভবন ও আপিস, মেস এবং রুচি, ব্যয় এবং বুদ্ধিবিদ্যা লইয়া কাহার গল্পের গতি না অনায়াস হইয়া উঠে? কপির দর হইতে ক্যাবিনেটের খবর, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনীতি, ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম্, সাহিত্যের সেরা বইয়ের নাম ও প্রসিদ্ধ ফিল্ম-ষ্টারের গুণব্যাখ্যান—এক সঙ্গে স-সমারোহে চালাইয়াও কি ক্লান্ত হইয়া পড়ি! ইতিহাসের অধ্যায় যাঁহারা নূতন করিয়া সংযোগ করেন তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের চোখে বৃহৎ হইয়াই দেখা দেয়—আমরা বিজ্ঞের মত নিজের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া তাঁহাদের প্রতিভাকে খণ্ডিত ও খর্ব্বিত করিয়া আনন্দ পাই। যে ঢেউ কূলে আছড়াইয়া ভাঙিয়া পড়ে, তারই বালুতটোচ্ছ্বসিত মর্ম্মরধ্বনির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিই। ইতিহাস-রচনার শক্তি আমাদের নাই, সমালোচনায় শুধু তৎপর!

সত্যই রাণাঘাট আসিলেও অমিয় মুখ খুলিল না। পুরাতন গল্প নূতন করিয়া জমাইতে প্রবৃত্তি তাহার নাই। প্রত্যেক বার শীতের সময় শীতের প্রতাপ, গ্রীষ্মের দিনে সূর্য্যের খরতাপ ও বর্ষার মেঘে পরিমিত বা অপরিমিত বারিবর্ষণ লইয়া সংসারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিযোগ চলে। রবিশস্যের দর কমবেশীতে দরিদ্রের অন্নই যায় আসে, অসময়ের কপি সস্তা হইলেও আনন্দ তাহাদের মুখের রেখাকে উজ্জ্বল করে না। পুকুরে

যদি অপর্য্যাপ্ত কলমিলতার ফুল ফোটে ও আউশ চালের বাজার নামিয়া যায় তাহারা উপরপানে দু-হাত তুলিয়া অদৃশ্য দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

দেশের ষ্টেশন আসিলেও অমিয় ভাবিতে ভাবিতে চলিল। পকেটে তাহার টাকা আছে, প্রথম উপার্জ্জনের টাকা—কিন্তু হিসাবের খাতায় পিষিয়া সে-অর্থ পাওয়ার মুহূর্ত্তেই বিবর্ণ ও রসহীন হইয়া গিয়াছে। পকেটে যাহা বাজিতেছে তাহা টাকা নহে—হিসাব। সংসারীর কানে সংসারের আর্ত্তি বা আর্ত্তনাদ!

পুরাতন বনপথ, গাছের ডালে পাখীর কূজন, পথের ধুলা ও পথের বালিতে সপ্তাহের অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা, বাতাসের হাতছানিতে ভাঁটের পাতা দুলিতেছে—সশীর্ষ সাদা ফুলে অন্ধকার বনে হাসির সমারোহ কিন্তু প্রাণ কই, সুর কোথায়?

অবনী বলিল, "ওয়েজ-কাট সব গভর্ণমেণ্ট আপিসেই আরম্ভ হ'ল—তবু মন্দের ভাল। একেবারে চাকরি না গিয়ে—"

অমিয় বলিল, "একেবারে চাকরি গেলেই বা ক্ষতি কি হ'ত!"

পাঁচু বলিল, "তা সত্যি, একে তো চলে না, খরচের হাত বেড়ে গেলে কখনও কমানো যায়! তার চেয়ে চাকরি যাওয়া ছিল ভাল।"

অমিয় বলিল, "কাল গঙ্গাস্নানে যাবে?"

অবনী হাসিল, "হঠাৎ পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা কেন?"

অমিয় বলিল, "শহরে বসে শান্তি হারাতে বসেছি, রেলের পথে মা দেখে আজ তৃপ্তি হ'ল না—মাঠের কোলে ব'সে ওকে ভাল ক'রে দেখব

"অমিয়, এখনও কি কবিতা লেখ?"

"লিখি বইকি, তবে কল্পনার নূপুর তার পায়ে আজ বাজে না বাস্তবের রূঢ় পদাঘাতে সে উদ্দাম ভাবে নৃত্য করে। ঠিক তোমাদের গদ্য-কবিতার মত।"

"গদ্য-কবিতা লিখতে গেলে শক্তির দরকার।"

অমিয় বলিল, "সাজানোর বাহাদুরি! এবং সাহস!"

পাঁচু বলিল, "তোমরা যাই বল—ও কবিতাও আদর পেয়েছে।"

অমিয় বলিল, "পোলাওয়ের মুখে মুড়ি কি মন্দ লাগে পাঁচু? খাদ্য-তালিকায় রুই মাছ আর পুঁই শাক চিরকালই পাশাপাশি থাকবে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি—আদর কেউ না কেউ দেবেন বইকি।"

পাঁচু বলিল, "তোমরা যাই বল, নূতনের ক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে কত দিন ওদের দাবিয়ে রাখবে?"

অমিয় বলিল, "আমরা রাখব দাবিয়ে ক্ষমতাকে! অভ্যুদয়কে কি পদ্দা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়, না ছেঁড়া চট দিয়ে সাজিয়ে তার শ্রী হরণ করা চলে? যে তারা আকাশে জ্বলে—তাকে মানুষ ফুঁ দিয়ে নেবাতে পারে? গলাবাজি করে অভ্যুদয়কে প্রচার করতে হয় না—সে আপন নিয়মে আপনি জেগে ওঠে।"

"এই তো গোপালপুরে এলাম।" অবনী বলিল।

"আর ঐ নূতন পুকুর—গোরস্থান। কালের ইঙ্গিত ওর মধ্যে আমি দেখতে পাই। এমনি আমাদের সাহিত্যেও। মহাকাল অট্টহাস্য ক'রে চলেছেন—নদীর স্রোত সৃষ্টি ক'রে, বালির রাশি ছড়িয়ে, জঞ্জাল উড়িয়ে, ঝড় বইয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে—ভাঙনের নেশায় দুটি হাতে অসুন্দর, ভঙ্গুর, অশিব, ক্লেদার্দ্র সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে মহাকাল ছুটেছেন। কোথায় কাব্যগগনের শতসহস্র পিক? যে-সুরে ভারতচন্দ্র ও মাইকেল ঝঙ্কার তুলেছিলেন, সেই সুর রইল অমর হয়ে, আর সব গেল মিলিয়ে; ঋষি বঙ্কিম যা দিলেন, মহাকাল কুন্দমাল্যের মত সাদরে তা গলায় পরলেন—আর হাজার ভক্তের গাঁথা মালা নিষ্ঠার অভাবে ধুলায় গেল মিশিয়ে! বর্ত্তমান কাল প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনে বড় কাল—সুতরাং

সৃষ্টির উল্লাস বা গৌরব তাঁদের মজ্জাগত সংস্কার! নিষ্ঠার বিচার করবে কালের কষ্টিপাথর।"

পাঁচু বলিল, "তোমাদের কবিরা বর্ত্তমান ফেলে কেবলই ভবিষ্যতের অন্ধকারে হাতড়ে মরেন। আমরা ওসব বুঝি না। আজ আমার ব্যক্তিগত জীবনে যে সাহিত্য সাড়া দিল, তাই আমাদের সত্যকারের পাওনা। যিনি অন্তরের বস্তু চিনিয়ে দিয়ে আমায় রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন—সেই কুশলী শিল্পীকে কেন প্রশংসা করব না?"

"নিশ্চয়ই তাঁর প্রশংসা করবে। আমরা যা আছি—সেই কথাই ব. বলে কয়জন? মনস্তত্ত্বের গুহায় রশ্মিপাত করতে গিয়ে আমরা বিদেশী মনীষীর শরণাপন্ন হই বলেই হাতের নাগালে কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিষকে মর্য্যাদা দিতে ভুল করি। এখন সাহিত্য থাক। পথের ধুলো বেড়ে উঠল। কাল যাবে তো গঙ্গা নাইতে?"

"যাব। তোমায় ঠিক ভোর পাঁচটার সময় ডাকব কিন্তু।"

"ডেকো। বাকি সাহিত্য-আলোচনা সেই মাঠের মধ্যে চলতে চলতেই হবে।"

প্রথম সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে মাঠের মহিমা কীর্ত্তন করা চলে না, সে শুধু দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী, সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিবার মত অমৃত। কোমল আকাশ, মিষ্ট বাতাস আর বাব্‌লা-শিমুল-সজ্জিত বিস্তীর্ণ মাঠ—অপ্রকাশিত দিবসের মায়াময় মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যাতীত সম্পদকেই মনে করাইয়া দেয়।

পাঁচু বলিল, "সাহিত্য-আলোচনা সুরু হোক।"

অমিয় বলিল, "না, সূর্য্যোদয় দেখব। মানুষে চিরকাল যা নকল ক'রে চলে—তার কথা বিছানায় শুয়ে বা চেয়ারে ব'সে পড়াই ভাল।"

অবনী বলিল, "গঙ্গা আর বেশী দিন নয়।"

অমিয় বলিল, "কেন! গঙ্গা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে?"

অবনী বলিল, "যা বালির চর উঠেছে মাঝখানে—গ্রীষ্মকালে ষ্টীমার চলে না।"

সে-কথা সত্য। পটলের ক্ষেতের শেষ প্রান্তে একখানি চালাঘর ছিল। ক্ষেত্রস্বামী রাত্রিকালে ফসল চুরি যাইবার ভয়ে কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া সেই কুটীরে সজাগ পাহারা দিত। কুটীরের চালার উপর এক শিশু বাব্‌লা তরু হেলিয়া পড়িয়া মধ্যাহ্নের খরতাপে কুটীরখানিতে ছত্রদানের কার্য্য করিত। তাহারই কোল ঘেঁসিয়া তখন গঙ্গা বহিতেন। আজ মাত্র তিনটি বৎসর পরে বাব্‌লা গাছটি বয়সের সঙ্গে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে, কুটীর কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, আর পটলক্ষেতের প্রসার বাড়িয়াছে। গঙ্গা পোয়া মাইল পথ সরিয়া গিয়াছেন। ওপারে গুপ্তি-পাড়ার সু-উচ্চ পাড় তেমনই সীমানা রক্ষা করিতেছে, গঙ্গার গর্ভ সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে; স্রোতের সে বেগ কোথায়? সত্যই কি ত্রিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দুজীবনের পরম কাম্য এই নদী লুপ্ত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মহিমা প্রচার করিবে? গঙ্গানদী লুপ্ত হইলে আর্য্যজাতির থাকিবে কি?

অবনী বলিল, "মুর্শিদাবাদের ওদিকে লোক হেঁটে গঙ্গা পার হয়, কাটোয়ার কাছেও অতি কষ্টে খেয়া চলে। এখন নবদ্বীপের পর আর ষ্টীমার যাবার উপায় নেই। তাও বর্ষাকালে নবদ্বীপে ষ্টীমার চলে, নইলে যা করেন কালনা।"

পাঁচু বলিল, "গেল বার শান্তিপুরের একটু আগে বয়রার কোলে চর জেগেছিল—দু-দিন ষ্টীমার আসতে পারে নি। কালীগঞ্জের বাঁকে প্রায়ই তো ষ্টীমার আটকায়।"

অমিয় বলিল, "গঙ্গা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে ?"

অবনী বলিল, "বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর থেকে গঙ্গাজলের বীজাণুনাশক শক্তি কত বেশী। বছরখানিক কলসীতে ধরে রাখলেও এ জলে পোকা হয় না।"

পাঁচু বলিল, "তব তট নিকটে যস্য নিবাস, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস; এইবার বুঝি আমাদের বৈকুণ্ঠচ্যুত হ'তে হয়।"

অমিয় বলিল, "রহস্য নয়। চারি দিক দিয়ে আমাদের বালুচর জেগে উঠছে। স্রোত আর বইবে না—জীবননদী বা গঙ্গানদী কোনখানেই না।"

মা বলিলেন, "এবারকার টাকা থেকে ঠাকুর-দেবতার পূজো দেব ব'লেই সব টাকা আমার হাতে তুলে দিলি কেন? তোর হাতখরচের জন্য কিছু রাখলি নে?"

অমিয় বলিল, "যা তোমাদের দরকার রাখ, বাকিটা আমায় দিও।"

"তুই তো বলছিস নতুন বাসা করবি।"

"হ্যাঁ, মেসে যাব। তা সেখানে এখনই নগদ টাকা কিছু লাগবে না, মাসকাবারে দিলেই চলবে।"

"তোর বিছানা-বালিশ কিছু দরকার হবে না?"

"সে সামান্যই।"

"তা হোক, এই দশটা টাকা রাখ। আর শোন, বালিশ-বিছানায় তেমন খরচ না হয়, বৌমার জন্য এক জোড়া শাড়ী আনিস আসছে শনিবারে। কোথাও নেমন্তন্ন হ'লে বেচারী খেতে যেতে পায় না।"

"তোমারও তো কাপড় নেই।"

"বিধবার ময়লা ছেঁড়াতেই চলে যায়। ওদের তো তা চলে না।"

"তা হোক, আগে ধুতি তার পর শাড়ী।"

মা স্নেহ-কোপকটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "না, আগে শাড়ী। পূজোর সময় তোর পিসীমারা দু-খানা ধুতি দিয়েছিল, সে দু-খানা এখনও ট্রাঙ্কে পোরা আছে।"

অমিয় বলিল, "তার একখানা তো স্নান ক'রে পরেছি, যদিও তোমার নাম ক'রে তাঁরা দিয়েছেন, ব্যবহার করছি আমি।"

মা বলিলেন, "বেশ করেছিস, জল খাবি আয়।"

"এত সকালে আবার কি দেবে?"

"কাল একাদশী ছিল, দুধ খাইনি, তার ক্ষীর ক'রে রেখেছি, দুটো নারকেল-নাড়ুও বুঝি ফেলিরা দিয়ে গিয়েছে।"

"আচ্ছা মা, ফেলিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে ওঁকে নিতে আসেনি?"

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিতে আসবেও না কোন দিন। অমন দেবতুল্য স্বামী, ছুঁড়িটার কপাল!"

অমিয় বলিল, "বিয়ের সময় দেনাপাওনা নিয়ে সামান্য গোলমালে কত জীবন যে নষ্ট হয়ে যায়!"

মা বলিলেন, "দেনাপাওনার গোলমাল তো নয়, সে অন্য কথা।"

"কি কথা?" অমিয় সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

মা বলিলেন, "তা আর নাই বা শুনলি।"

"না, তুমি বল। তুমি যতক্ষণ না বলবে, আমি জল খাব না।"

"পাগল দেখ! জানতিস তো ফেলির শ্বশুর মস্ত এক জন পণ্ডিত-বংশের ছেলে ছিলেন। নিজে টোল উঠিয়ে চাকরি নিয়েছিলেন বটে,

বাড়ীতে পূজো-পার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব কিছু বাদ দিতেন না। রোজ গঙ্গাস্নান ক'রে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে তবে তিনি কাছারিতে যেতেন—ছেলেকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। তিনটে পাস দিয়ে ছেলে গ্রামে এল—কত রাজা-জমিদার ওকে মেয়ে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। উনি মস্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, টাকা দেখে টললেন না। বংশ বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন। ফেলির বাপের সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে খ্যাতি আছে, মেয়েটিও দুর্গাপ্রতিমা। বংশ-গোত্রের মিল হতেই বিয়ে হয়ে গেল।"

"তার পর ?"

"বছরখানেক পরে লগন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে—ফেলির বাপ উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। আর মেয়ের পানে চেয়ে চোখের জল ফেলছেন। বার বছরের মেয়ে বাপের চোখের জল দেখে হাপুস-নয়নে কাঁদছে। মা নেই, থাকলে বাপের এত মনঃকষ্ট হ'ত না। তাঁরা কাঁদছেন, এমন সময় দেখলেন হুম্ হাম্ শব্দ ক'রে বেয়ারারা একখানা পাল্কী বয়ে এনে তাঁরই দোরগোড়ায় নামালো। পাল্কী থেকে বেরুলেন ফেলির শ্বশুর। মুখ তাঁর আষাঢ়ের আকাশের মত থমথমে, চোখে যেন আগুন জ্বলছে।"

ফেলির বাপ অভ্যর্থনা করলেন, "বসুন বেয়াই।"

গম্ভীর মুখে ফেলির শ্বশুর জবাব দিলেন, "বসব না, একটা কথার জবাব আমার চাই।"

ফেলির বাপের মুখ শুকিয়ে গেল—ঢোঁক গিলে বললেন, "কিসের জবাব ?"

শ্বশুর বললেন, "মেয়ের মা কোথায় ? আমার বেয়ান ঠাকরুণ ?"

ফেলির বাপ মাথা নীচু করলেন।

শ্বশুর বললেন, "আপনি হয়ত বলবেন, তিনি তীর্থ করতে গিয়ে কলেরায় মারা গেছেন।"

এক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ। একটি ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়!

ফেলির বাবা হয়ত জবাব দিতে না পেরে মাথা তুলবেন না এই ভেবে তো সবাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

ওপাড়ার বিশু খুড়ো হঠাৎ ফেলির শ্বশুরকে প্রশ্ন করলেন, "কেন, আপনার সন্দেহ হয় নাকি?"

কট্‌মট্‌ করে বিশু খুড়োর পানে তাকিয়ে তিনি তাঁকে কোন উত্তর না দিয়ে ফেলির বাবাকেই বললেন, "আপনিই বলুন। সত্যবাদী ব'লে আপনার এদিকে খ্যাতি আছে, আশা করি—"

ফেলির বাবা মাথা তুললেন; চোখে তাঁর জল, আর একটা তেজ দেখা গেল। আমরা জানালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখলাম—তাঁর মুখের তেজ—যেন দু-চোখে দুটি পিদীম জ্বলে উঠল। স্পষ্ট মৃদু স্বরে বললেন, "না, তিনি দেহত্যাগ করেন নি।"

"তবে কেন আপনি মেয়ের বিয়ের সময় সে-পরিচয় গোপন করেছিলেন?"

তেমনি নির্ভীক স্পষ্ট কণ্ঠে ফেলির বাবা বললেন, "গোপন আমি কিছুই করি নি, আপনি জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথাই বলতাম।"

"আপনি জানতেন তো এই পাপ—"

তাঁকে বাধা দিয়ে ফেলির বাবা বললেন, "আমি এখনও জানি পাপ তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারে না।" উপস্থিত সকলকে দেখিয়ে বললেন, "এঁরা সবাই জানতেন সংসারে তাঁর আসক্তি ছিল না। নেহাৎ খেতে হয় তাই খেতেন, থাকতে হয় থাকতেন। আমাকে সর্ব্বদাই তীর্থদর্শনের অনুরোধ জানাতেন। তীর্থদর্শনে বেরিয়ে

তাঁকে যে জন্মের মত হারাব ভাবতে পারি নি।” তাঁর চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

ফেলির শ্বশুরের মুখের ভাব বদলাল না। বললেন, “আমরা সমাজের মানুষ। তিনি সন্ন্যাসিনী হোন আর যাই হোন, গৃহত্যাগ করেছেন। এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন না।” ব’লেই পাল্কীতে গিয়ে উঠলেন।

পাড়ার লোক তাঁকে কত অনুরোধ করলে। বললে, “ওঁর স্ত্রীর কলঙ্ক হ’লে এ-গাঁয়ের সমাজই কি ক্ষমা করত?” তিনি কোন কথা না শুনে পাল্কী হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

“তার পর থেকে ফেলিদি বুঝি এইখানেই রইলেন?”

“তিন বছর পরে ফেলির শ্বশুর গেলেন বদরী নারায়ণে; সেখান থেকে ফিরে এসেই তাঁর মত বদলাল, আবার পাল্কী নিয়ে ছুটে এলেন এই গ্রামে। ফেলির বাবার হাত ধরে বললেন, “মাপ করবেন বেয়াই, আমার ভুল ভেঙেছে। বৌমাকে পাঠিয়ে দিন।”

ফেলির বাবা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। বললেন, “আপনার ভুল ভাঙল কিসে বেয়াই?”

শ্বশুর বললেন, “যোশী মঠে মা-জীর পরিচয় পেলাম। তিনি বছর খানেক হ’ল মহানির্ব্বাণ লাভ করেছেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম সব।”—ব’লে জামার পকেট থেকে একটা শিলের আংটি বার ক’রে বেয়াইয়ের হাতে দিলেন। কোন সন্দেহ রইল না, এ দেবী আর কেউ নন, ফেলির মা।

ফেলির বাবা সেদিন যেন ফেলির মাকে নূতন করে হারালেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। ধরা গলায় বললেন, “কিন্তু বেয়াই, তোমার সমাজ?”

ফেলির শ্বশুর বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, সমাজকে সন্তুষ্ট হ'তে হবে। কই, মা কোথায় ?"

ফেলির বাবা বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড। মেয়ে কুয়োতলায় বসে কাঁদছে, আর কাঁচি দিয়ে কচ্ কচ্ করে সেই মেঘের মত কালো মিশমিশে চুলের গোছা কাটছে। বাবা তো থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "ও কি করছিস ?"

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ওঁকে ফিরে যেতে বল বাবা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

বাবা মেয়ের মাথায় হাত রেখে কত বোঝালেন, আমরা কত বোঝালাম, মেয়ের সেই কি গোঁ, যাব না। শ্বশুর সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত ঠায় ব'সে আছেন—বৌমাকে তাঁর নিয়ে যাবেন, পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে ওদের বাড়ীতে। মেয়ের সেই এক গোঁ, যাব না।

শ্বশুর বললেন, "তিনি নাই যান, এক বার আমায় নিজের মুখে ব'লে যান এ কথা।"

একখানি আধময়লা শাড়ী পরে ফেলি এসে শ্বশুরের সামনে দাঁড়াল, নেড়া মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া, তবু শ্রী যেন ফুটে বেরুচ্ছে। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বশুরের জবাবে আস্তে আস্তে বললে, "আপনি মিথ্যে কষ্ট ক'রে এলেন, আমি তো যাব না।" ব'লে হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রেই চলে গেল। শ্বশুরের দু-চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় ফেলির বাপকে বললেন, "আজ দেবীদর্শন হ'ল। কিন্তু তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবার মত চণ্ডীমণ্ডপ আমার ছিল না, তাই ভগবান আমার কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতীকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েকে দেখে মায়ের মহিমা বোঝা যায়।"

মা চুপ করিলেন।

অমিয় রুদ্ধ নিশ্বাসে এই অপরূপ কাহিনী শুনিতেছিল। অতি সাধারণ পাড়াগাঁয়ের এক অল্পশিক্ষিতা মহিলা—অল্পবয়সে এমন মর্য্যাদা-বোধ কে তাহাকে শিখাইয়া দিল! মাতৃ-অপমানের অগ্নিতে মনের কোমল বৃত্তিগুলি তাহার নিঃশেষে পুড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই চণ্ডিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল হয়ত।

সাগ্রহে সে প্রশ্ন করিল, "ওঁর স্বামীও ওঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি?"

"করেছিলেন। এক বার ফেলির শ্বশুর মারা গেলে, এক বার ওর বাপ মারা গেলে। ও যায় নি।"

অমিয় বলিল, "ওঁর স্বামী কি করেন?"

মা বলিলেন, "বড় চাকরি করেন। ফেলিকে কয়েক বার টাকাও পাঠিয়েছিলেন, ও নেয় নি।"

"তিনি কি বিয়ে করেন নি?"

"কেন করবেন না। যেবার লগনে ফেলিকে পাঠাবার কথা, সেই বারই শ্বশুর ফিরে গিয়ে ছেলের বিয়ে দেন।"

অমিয় আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে জলখাবারের রেকাবিটা টানিয়া লইল।

দুপুরবেলায় খাওয়ার পর মা পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন, আশা পাখা হাতে করিয়া চৌকির উপর বসিল।

অমিয় বলিল, "হেঁসেল-পাট উঠল?"

"হ্যাঁ, এইবার একটু গড়িয়ে নিই।"

অমিয় রহস্য করিয়া বলিল, "তা হ'লে তোমার শাড়ীই চাই এক জোড়া। শুনি মেলাই নেমন্তন্ন হয়—আর তুমি রক্ষা করতে পার না!"

আশা হাসিল, "তাই নাকি! মা বলেছেন বুঝি?"

অমিয় বলিল, "তা কাছে-পিঠে দু-একটা নেমন্তন্ন খেয়ে এলেও তো পারতে, একটু মোটা হতে।" বলিয়া আশার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশা বলিল, "তাও পারতাম, কিন্তু কাছে নেমন্তন্ন হয় কই?"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা, এবার আমায় কেমন দেখছ?"

আশা প্রত্যুত্তরে রহস্যের ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ঠিক গেল বার যেমন দেখেছিলাম।"

অমিয় বলিল, "ঠিক তেমনি! রোগাও নয়, মোটাও নয়?"

"না, গো, না, কালোও নয়, ফর্সাও নয়, তবে—"বলিয়া আশা সহসা থামিয়া গেল।

"তবে কি?"

"না, বলব না, হয়ত আমারই দেখবার ভুল।"

"না, বল।" বলিয়া অমিয় আশার হাতে চাপ দিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আশা বলিল, "চাকরি পেলে লোকের চেহারা যেমন খুশী-খুশী হয় তেমনটি নয়।"

"আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল।"

আশা পাখা থামাইয়া অমিয়র মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি দিনরাত কি ভাব বল তো? চাকরি পাওয়ার পর তোমার ভাবনাও যেন বেড়েছে।"

অমিয় রহস্যচ্ছলে বলিল, "তোমার কাপড় কিনতে পারি নি—মা যা আনতে বলেছিলেন—"

আশা বলিল, "ঠাট্টা নয়।"

অমিয়র মুখে ছায়া নামিল। মৃদুস্বরে বলিল, "চাকরি পেয়ে অবধি আমার মনে হয়েছে কি জান, যেন ছেলেবেলার খেলাঘরে ফিরে এসেছি!

আমার চারদিকে কত খাবার পরবার জিনিষ—অথচ খোলামকুচির ভাত ও কালকাশুন্দা পাতার ডালনা রেঁধে 'কয়া' 'কয়া' করে ভোজ খাওয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে। তোমাকে ভাল একখানা শাড়ী কিনে দিতে পারি নি—এ দুঃখও তো কম নয়। চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার ঝড়ের রাত, একটি ছোট পিদীম হাতের আড়ালে ঢেকে পথে পা বাড়িয়েছি। পিদীমের আলোটিকে বাঁচাতে প্রাণপণ করছি—এদিকে উঁচুনীচু পথে কতবার যে হোঁচট খাচ্ছি—"

আশা বলিল, "যার যা আয়, তেমন ব্যয় করলেই কোন কষ্ট থাকে না।"

অমিয় বলিল, "কোন রকমে কষ্ট করে চারটি খাওয়া আর মাথা গুঁজে থাকা—এরই জন্য কি জীবন বইতে হবে? ঠিক ঐ হাতের আড়ালে নিবু-নিবু দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখার মত? এইটুকুর জন্যই কি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মা আমায় লেখাপড়া শেখালেন?"

আশা বলিল, "সবাই তো চাকরি করছে।"

অমিয় বলিল, "সবাই করছে বইকি চাকরি। সংসার পাতছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে যাতে তারা চাকরি একটি পায়, বা চাকরিওয়ালা বর পায়। অতি কষ্টে তাদের মেয়ের বিয়ে ও ছেলের লেখাপড়া চলে।...কিন্তু তার পর? ধারের খুঁটিটি যদি হেলান দেবার জন্য না থাকত তো চাকর্যে আমরা কোন্ কালে মাটিতে গড়াগড়ি খেতাম।"

আশা বলিল, "সবাই তো তোমার মত ভাবে না।"

"ভাবে আশা, নিশ্চয়ই ভাবে। তাদের মুখের হাসিতে প্রাণ নেই, বাইরের পোষাকে জৌলুষ নেই,—তবু তারা সমাজকে সাজিয়ে এবং নিজেরা সেজে সভ্যতা প্রচার করে। যারা সত্যিই ভাবে না, তাদের ভাববার ক্ষমতাই নেই। হয়ত কোন লাভ নেই ব'লেই ভাবে না।"

আশা বলিল, "সত্যিই ভেবে লাভ নেই, যা করেন ভগবান—"

"মিথ্যা কথা, ভগবান কিছু করান না, করে মানুষে। যারা সবল মানুষ, সুস্থ মানুষ, সম্পন্ন মানুষ, তারা ভগবান নিয়ে চুলচেরা বিচার করুক গে—তাদের অফুরন্ত অবসর, আমাদের ওসব দিকে মাথা ঘামানো চলে না।"

আশা বলিল, "কেন চলে না? বরং আমরাই তো ভগবানকে বেশী ক'রে ভালবাসব।"

"কেন?"

আশা বলিল, "কারণ তিনি গরিবের। দুর্য্যোধনের রাজভোগ তুচ্ছ ক'রে বিদুরের খুদ খাবার জন্য তাঁর ঘরেই রইলেন।"

অমিয়র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "তার পর?"

আশা আপন মনে বলিতে লাগিল, "তার পর কি—ভগবানের উপর নির্ভর রেখে কাজ কর দেখি, কেমন না শান্তি পাও?"

অমিয় বলিল, "হয়ত দুর্ব্বলের অক্ষম ত্যাগের মধ্যেই ভগবানের মহত্ত্ব লুকানো, আশা। মা ফলেষু কদাচন। তাই তিনি দুর্ব্বলেরই শক্ত আশ্রয়। তাঁর ভক্তদের তিনি বেশী ক'রে কষ্ট দেন, কেননা কষ্ট বইবার একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় না পেলে ভক্ত মানুষ তদ্দণ্ডেই যে বুক ফেটে মারা যেত।"

আশা ঈষৎ আহত হইয়া বলিল, "তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?"

"সত্যি না।" আগ্রহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আশার সীমা না বাঁধতে পারলে সত্যিই সুখ নেই। এত দিন বুঝতে পারি নি, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোক কেন বেঁচে থাকে, আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে কেন তারা কাজ করে, কেন অত্যাচার সয়, প্রতিবাদ করে না। কেন কাঁদে আর কপাল চাপড়ায়, অথচ বলে, ঈশ্বর তুমি দেখো।"

"তুমি ঠাট্টাই করছ।" বলিয়া অভিমানে আশা মুখ ফিরাইল।

"না, আশা, না। যদি ভগবান নাই-ই থাকেন সে তর্ক আমরা করব না। যাঁরা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছেন তাঁদের উপর জগৎসৃষ্টির সঠিক ইতিহাস নির্ণয় করবার ভার রইল। আমরা আশাহত, স্বাস্থ্যহত, জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কেরানী—আমাদের নাস্তিক্যবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। সত্যি আশা, তিনি আছেন; আমার অক্ষমতাকে, অসাফল্যকে, পাপকে, ভীরুতাকে এবং মনের গ্লানিকে মুছে দেবার জন্য তাঁর থাকা প্রয়োজন। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

১৫

অমিয়দের নূতন যিনি অফিসার আসিয়াছেন তিনিও ঐ কথা বলেন। একবার কোন এক দুঃসাহসী কেরানী অফিসার গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দুঃসাহস এই জন্য যে, সামান্য এক জন কেরানীর পক্ষে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎলাভ বহু বিধিনিষেধের অন্তর্গত। প্রথমতঃ বিভাগীয় যিনি বড়বাবু তাঁহার মতামত লওয়া একান্ত আবশ্যক, বড়বাবুর পর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্। সামান্য কেরানীর ক্ষুদ্র অভিযোগের কাহিনী লইয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অমূল্য সময় পাছে অপব্যয়িত হয় এইজন্যই হয়ত কড়া আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। সে যাহা হউক, অফিসার গুপ্ত সাহেব এই বিষয়ে ছিলেন পরম উদার। আদর্শ হিন্দু প্রণালীতে তিনি আপিসের বিজাতীয় খাদ্য পরিবেশন করিয়া উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতেন। ধর্ম্মালোচনার জন্য তাঁহার কাছে যে কোন সময়ে যে কোন কেরানীর আসিতে বাধা ছিল না। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, বিবাহ করেন নাই। চিরকুমার

থাকিলেই সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল এবং গভীর রহস্যের আরোপ করিয়া অনেক মুখরোচক কাহিনীই পল্লবিত হইয়া উঠে ; গুপ্ত সাহেব সম্বন্ধেও এমন অনেক হৃদ্য গল্পের প্রচলন ছিল, এ-কাহিনীর সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া তাহা উল্লিখিত হইল না। মোটের উপর লোকটির স্বাস্থ্য ভাল। অফিসার বলিয়া সুট পরিতেন। কিন্তু কপালে ফোঁটা তিলক ও মাথায় সতেজ টিকি রাখিয়া আপন নিষ্ঠাকে প্রচার করিতে ভুলিতেন না। হাজিরাটি ছিল সময়মত, এবং সেজন্য প্রত্যেক বিভাগের উপর কঠোর নিয়ম জারি করিয়াছিলেন—হাজিরা-খাতা ঠিক দশটার সময় তাঁহার টেবিলে পৌঁছান চাই। কয়েক মিনিট দেরিতে কোন বিভাগ হইতে যদি খাতা না আসিত তো তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম লইয়া তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেন। তিন দিন লেট হইলে তাঁহার বিধানে একদিন ছুটি কাটিবার নিয়ম ছিল, এবং লেটের সংখ্যা বাড়িলে আইনও কঠোরতর হইত। তা বলিয়া গুপ্ত সাহেব লোকটি হৃদয়হীন নহেন। হাজিরা-খাতা আসিবার পরেই তিনি চোখে চশমা আঁটিয়া গীতা খুলিয়া বসিতেন, এবং একটি অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্যান্ত কাহারও তাঁহার কক্ষে প্রবেশের অনুমতি মিলিত না। অতঃপর আপিসের কাজ আরম্ভ হইত ; কাজ আরম্ভের প্রণালীটি ছিল একটু অদ্ভুত।

ফাইলের স্তূপ বগলে লইয়া কোন বিভাগের বড়বাবু হয়তো গুপ্ত সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলেন। গুপ্ত সাহেব মোলায়েম একটু হাসিয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনার আজকের শ্লোকটি আগে বলুন।"

বিভাগীয় বড়বাবু ফাইলের স্তূপ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "কাম এষ ক্রোধ এষ—ইত্যাদি।"

সন্তুষ্ট চিত্তে গুপ্তসাহেব বলিলেন, "ঠিক, ঠিক। দেখি আপনার ফাইল ?"

একবার এক চাপরাসীর জরিমানা করাতে সে বেচারা কাঁদিয়া গুপ্ত সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। গুপ্ত সাহেব নিজের পকেট হইতে সেই দুটি টাকা দিয়া আপিস ডিসিপ্লিন বজায় রাখিলেন, তত্রাচ কলম ডালিয়া হুকুম বদলাইলেন না।

যাহা হউক, এহেন গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে যে দুঃসাহসী কেরানী এক বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পরেশ। দশটি বছর একই গ্রেডে পড়িয়া থাকিয়া চারি দিকের ধারে-কর্জ্জে জর্জ্জরিত হইয়াই একদা তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। আর দুটি বৎসর পরে যে অবসর লাভ করিবে অথচ গ্রেডের আশা নাই—তাহার পক্ষে নূতন করিয়া কি ক্ষতিই বা হইতে পারে? বিশেষতঃ গুপ্ত সাহেব দয়াবান। হিন্দুর ধর্ম্ম যিনি বোঝেন, হিন্দুর ব্যথাও কি আর তিনি বুঝিবেন না!

প্রথম সাক্ষাতে অফিসারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পা-দুটি তাঁহার কাঁপিতেছিল বইকি! নমস্কার করিয়া স্থাণুর মত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুপ্ত সাহেব আপন সহাস্য মুখখানি দুঃস্থ কেরানীর শুষ্ক মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন, "কি চান?"

"সার্, আমার বড় কষ্ট।"

"কোন্ সেক্শানে কাজ করেন?"

পরেশবাবু সেক্শানের নাম বলিলেন।

"কত বছর সার্ভিস হল?"

"তেত্রিশ চলছে।"

"তেত্রিশ—!" গুপ্ত সাহেব ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিলেন। এক মিনিট থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কত বয়স হ'ল আপনার?"

"তিপান্ন, সার্।"

আবার এক মিনিট নিস্তব্ধতা। গুপ্ত সাহেব অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "গীতা পড়েছেন তো ?"

গীতা পাঠ না করিলে গুপ্ত সাহেবের কাছে কোন আবেদনই টিকিবে না—একথা আপিসের সামান্য চাপরাসী পর্য্যন্ত জানিত, সুতরাং পরেশবাবু অসঙ্কোচেই বলিলেন, "হ্যাঁ, সার্।"

"আচ্ছা, বলুন তো কোন অধ্যায় থেকে যে-কোন একটা শ্লোক ?"

পরেশবাবুর শুষ্ক মুখ শুষ্কতর হইল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। অসঙ্কোচ মিথ্যাভাষণের ফল যে এমন হাতে হাতে ফলিবে তাহা ভাবিতেই পারেন নাই। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন আগে এক বার পড়েছিলাম, ভাল মনে নেই।"

গুপ্ত সাহেবের মুখের প্রসন্নতা স্তিমিত হইয়া আসিল, ধীরে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "অথচ হিন্দু আপনি! এই বয়সেই আগেকার লোকেরা বানপ্রস্থ নিতেন। সাহেবরা বিদেশী বলে পঞ্চাশ পার হ'লেও আর পাঁচটি বছর দয়া করে চাকরিতে রাখে ; হিন্দু নিয়ম জানলে কি আর রাখত ? যাই হোক, আপনার উচিত প্রত্যহ গীতা পড়া।" বলিয়া ঘটাং করিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানি নাতিবৃহৎ গীতা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম ?"

পরেশবাবুর নামে গীতাখানি উৎসর্গ করিয়া গুপ্ত সাহেব বলিলেন, "ধরুন। প্রত্যহ এইখানি পড়বেন, আপনার বাড়ীতে পড়াবেন। নীচেয় বাংলা টীকা আছে, বুঝতে কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আর কাল থেকে একটি করে শ্লোক আমাকে শুনিয়ে যাবেন।"

পরেশবাবু গীতা গ্রহণ করিলেন।

গুপ্তসাহেব বলিলেন, "দাঁড়ান, আজই দু-ছত্র পাঠ্য আপনাকে শুনিয়ে দিই।" বলিয়া আবৃত্তি করিলেন, 'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু

কদাচন।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, কর্ম্ম কর, ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল কামনা করে যে কর্ম্মই করা যাক না কেন, তাতেই দুঃখের উৎপত্তি। কর্ম্ম করলে ফল লাভ হ'তেও পারে না-ও পারে। যদি না হয় তোমার দুঃখের অন্ত থাকবে না। "এই ধরুন না কেন, আপনার কথা। যা কাজ করেন, সেইমত মাইনে পান, অথচ আশা করেন তার অনেক বেশী। কাজেই দুঃখ আপনার ঘোচে না। হিন্দু হয়ে প্রতিপদে যদি গীতাকে অনুসরণ করেন তো কোন দুঃখই আপনার থাকবে না। নমস্কার।"

পরেশবাবু বিদায় গ্রহণ করিলে গুপ্ত সাহেব তাঁহার নিম্নতম কর্ম্ম-চারীকে ডাকিলেন।

"আচ্ছা, সুধীরবাবু, আপনি কি প্রত্যেক সেক্‌শানের প্রত্যেক কেরানীকে গীতা দেন নি?"

"আজ্ঞে না, স্যর। সব ডিষ্ট্রিবিউট করে উঠতে পারিনি।"

"কত গীতা আপনাকে দিয়েছি?"

"হাজার কাপি দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের বড়-বাবুদের ডেকে পাঠান। তাঁদের কাছে কেরানীদের লিষ্ট নিয়ে তাঁদের হাতে আজই ওগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করে দিন। কাল সকালে নামের লিষ্ট, সেক্‌শান ইত্যাদির একটা ফেয়ার কাপি করে আমার কাছে পাঠাবেন। আমি প্রত্যেককে ডেকে পাঠ জিজ্ঞাসা করব।"

সুতরাং অমিয়ও একখানি গীতা পাইয়াছে। পাইয়া বুঝিয়াছে দুঃস্থ জীবনে গীতার মুল্য কতখানি।

যখনই প্রত্যক্ষ অবিচারে মনের মধ্যে মালিন্য জমিয়া উঠে—সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে থাকে ঃ

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

ইত্যাদি।

মনের প্রশান্তি ফিরিয়া আসে।

বিক্ষুব্ধ মন অভাব-অনটনের অনলে দগ্ধ হইতে থাকিলে ভগবানের উক্তি বেশী করিয়াই মনে জাগে ঃ

অসংশয়ং মহবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

বৈরাগ্য নহে তো কি! ফল কামনা করিলেও যে জীবনে ফললাভ আকাশ-স্বপ্ন, দুঃখের গুরুভারে পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, বিকৃত মুখের কালিমায় পরাজয়েয় গ্লানি, নিষ্প্রভ নয়নে পথহারার নৈরাশ্য পরিস্ফুট—সে-জীবন সম্বন্ধে গীতার শ্লোকগুলি কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসার এবং সর্ব্বোত্তম সান্ত্বনার বাণী বহন করিতেছে না?

কালো প্যাডের বর্ডারে সাদা বড় বড় হরফে অমিয় এক দিন গীতার পরম আশ্বাস বাণী উৎকীর্ণ করিয়া দিল ঃ

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

১৬

এমনই ভাবে গীতা লইয়া সুখদুঃখকে অমিয় যখন অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তখন অকস্মাৎ বীরেনের পত্র আসিয়া তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। অন্তরের স্থৈর্য্য ও গীতার শ্লোক সে-আঘাতে একাকার হইয়া গেল।

বীরেন লিখিয়াছে :

অমিয়, বহুদিন পরে আজ তোমাকে চিঠি লিখছি, বহু দূর থেকেও বটে। মনে ক'রো না, তোমার কুশলসংবাদ-প্রত্যাশায় মন আমার উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ রয়েছে, যেমন বহুদিন প্রিয়বস্তুর অদর্শনজনিত কোন বন্ধুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে! আসলে ওটা গৌরচন্দ্রিকা। মনের উৎকণ্ঠা যেখানে স্বাভাবিক—দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদ সেখানে তিষ্ঠতে পারে না। যেখানে বিরহ-নিবারণের কোন উপায় নেই, সেখানে লিপিপ্রাচুর্য্য থাকবেই। তোমার সম্বন্ধে আমার যখন উৎকণ্ঠা নেই, আশা করি আমার সম্বন্ধে তোমার উৎসাহও সেখানে স্বভাবতই স্তিমিত। কিন্তু এই দীর্ঘ দিন, বোধ হয় বছর দুই হবে, ঠিক হিসাব আমার নেই, এই দীর্ঘ দিন পরে তোমার ঠিকানা খুঁজে তোমাকে চিঠি লেখার অর্থ তোমাকে অত্যন্ত বিস্মিত তো করবেই, সেই সঙ্গে স্তিমিত কৌতূহল-শিখাটিকে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল করবে না কি? চিঠিতে একান্ত ভাবে আমারই কয়েকটি কথা তোমাকে জানাতে প্রবল ইচ্ছা হ'ল। আশ্চর্য্য নয়? যাকে বন্ধু ব'লে মানি অথচ আত্মার সন্নিকটে বসিয়ে আলাপ করতে ভালবাসি নে, যাকে দুর্ব্বল ভেবে কৃপা করি অথচ কথার আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা বোধ করি নে, তার কাছে আমার অন্তরের কি এমন গোপন কথা থাকতে পারে? এবং এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করলেই বা ক্ষতি কি? সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, এ বুঝি প্রকৃতির মস্তবড় একটা অভিশাপ যে, এই পৃথিবীর এক জন না এক জনকে মন-পুস্তকের গোপন অধ্যায়গুলি যদি খুলে না দেখাতে পারলাম তো যত্ন ক'রে এত অক্ষরের শোভা ও ভাষার কলরব তুলে ভাবের কমলবন বিমথিত করলাম কেন! ভয় নেই, কৃষ্ণনগর কলেজের স্মৃতি রোমন্থন করব না, বাল্যস্মৃতিও না। জীবনের যেখান থেকে ছেদ টানব ভাবছি, সেখান থেকেই আমার কাহিনীর

আরম্ভ। কাহিনী না তো কি!…ট্রেনের কথা মনে পড়ে? আমার বিবাহ-বিদ্বেষ নিয়ে তোমাদের পরিহাস হয়ত কত অলস অবসর-মুহূর্ত্তে কৌতুক সৃষ্টি করেছে, কিন্তু দুঃখকে ঠেকাবার ঐ একটি মাত্র বর্ম্মই আমি আবিষ্কার করেছিলাম। সে বর্ম্ম আজও আমার অটুট থাকলেও মনে হচ্ছে ওতে যেন মরচে ধরে আসছে। হেসো না, এবং বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে কোটেশন ছেড় না:

Marriage is like beleaguered fortress,

those who are without want to get in.

মোটেই না। যার সামনে দিনরাত্রি আগুন জ্বলছে, সে কোন্ সুখে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করবে! কিন্তু দুঃখকে যে ঠেকানো যায় না—এ কথা আমি স্বীকার করি। দুঃখের প্রবেশপথ যে বহু শত—মনের ছিদ্রগুলি তো সহজ নয়। যে বাড়ীখানিতে দু-দিন মাথা রাখবার জায়গা পেলাম, সেখানে মমতার উর্ণনাভ বোনা আরম্ভ হয়ে গেল। যেমন মুহূর্ত্তের বিশ্রাম উপভোগ করেছি—অমনি মনে কল্পনার ইন্দ্রধনু ফুটে উঠতে চায়। নিজেকে যতই অশুচি বাঁচিয়ে আগলে চলি—অলক্ষ্যে মন অন্ধকার পথে ততই টক্কর খায়। ভূমিকা আর দীর্ঘ করব না। আসল কথা বলি।

তুমি তো জান, আমার একটি ভাই ছিল এবং তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবার ব্রত (তোমার ভাষায়) আমি নিয়েছিলাম। এক দিন বুঝি তোমাকে বলেছিলামও,—সে যদি উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করে তো আমিই তাকে গুলি ক'রে মারব। ভাব দেখি কত বড় স্পর্দ্ধার কথা! মানুষ ইচ্ছে করলেই কি মানুষকে গুলি ক'রে মারতে পারে? সহজ অবস্থার মানুষের দ্বারা তা কি সম্ভব? আমার সে দম্ভবাণী অলক্ষ্যে বসে কেউ হয়ত শুনেছিলেন। কেউ মানে ভগবান্ নন। আমি ঈশ্বর মানি না। মানি না:

God is to man what sun is to earth, and more.

কেউ মানে আমার অন্তরের সুপ্ত কোন বৃত্তিও তো হ'তে পারে, যে-বৃত্তি সময়বিশেষে অত্যন্ত সজাগ হয়ে অতীতের উপর বিহার করতে ভালবাসে। অতীতের মতবাদের ফাঁকে ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ভাইয়ের উপর স্নেহ আমার কিছু ছিল বইকি, যে-স্নেহের বহিঃ-প্রকাশকে চোখ রাঙিয়ে দিনরাত শাসন করতাম। স্নেহ যদি না থাকবে তো দুর্দ্দান্ত সাহসী হয়েও মন কেন কার্য্যক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল! তারপর শোন। ভাই আমার কলকাতায় পড়ত। ভিতরে ভিতরে সে যে মনুষ্যধর্ম্মের চর্চ্চা করছিল সে-খবর তো পাই নি কোনদিন। টাকা চাইলে টাকা দিয়েছি, পাসের খবর জেনে খুশী হয়েছি—এই পর্য্যন্ত। বাড়ীতে ছুটিছাটাতে দেখা হলে কখনও কুশল-প্রশ্ন করি নি; একসঙ্গে বসে তার সঙ্গে যে কোন বিষয় নিয়ে পাঁচ মিনিট আলোচনা করেছি—সে কথা তো মনে পড়ে না। তার অসুখ হ'লে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকি নি, অথচ তাকে মনের বার করতে গিয়ে দেখলাম, অবহেলিত ভাঙা ঘরের কার্ণিশে সে যেন যত্নে বর্দ্ধিত এক অশ্বত্থ গাছ। শুকনো চুনসুরকির মধ্যে তার অনেকগুলি শিকড় সেঁধিয়েছে, বহুমুখী শিকড়ে রস টানবার শক্তিও তো কম নয়! বুঝলাম, বর্ম্মে আমার মরচেই ধরেছে। ব্যাপারটা কি জান, ভাই আমার কোন দুঃস্থ প্রতিবেশীর কন্যা-দায় উদ্ধারের মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন। ভয় নেই, প্রণয়-প্রেম এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গও ছিল না, উদার মনের একাগ্র পরিণতিই তাকে পরোপকারের যূপকাষ্ঠে আকর্ষণ করেছিল। দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে দুঃখের হ্রদে ভাই আমার নেমে গেলেন। আমার শাসন অনায়াসে সে অগ্রাহ্য করলে। ভাবতে পার অমিয়, অনিমন্ত্রিত দুঃখ যখন বিপুল বন্যার বেগে

আমার গৃহাঙ্গনে এল, তখন তাকে বহন করবার যোগ্যতা আমার কতখানি ছিল! হরজটামুক্ত-জাহ্নবীবেগধারা-বিপর্য্যস্ত মত্ত ঐরাবতের কথা স্মরণ কর। পিস্তল আমার কাছেই ছিল, গুলি করতে পারলাম কই? বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, চাকরি আর কেন! কিন্তু ছাড়ব বললেই তো চাকরি ছাড়া যায় না। ভাত খাব না বললেই কি অন্নত্যাগ সম্ভব! কিছু কৌতূহল হ'ল। দেখি না খরচপত্র বন্ধ করে দিয়ে, ভাই যে দায়িত্ব মাথায় নিলেন তা বহন করবার ক্ষমতা ওঁর কতখানি। উনি দুঃখের হ্রদে আর পাঁচ জনের মত তলিয়ে যান, না মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন? হায় রে আমার আশা! হাঁড়িসুদ্ধ ভাত দেখেও কি একটি ভাতের অবস্থা জানতে ভুল হয়? সবাই যে-হ্রদের তলদেশে থিতিয়ে পড়েছে, ও সেখানে শোলার মত ভাসবে! যারা ভাবের চাষ-আবাদে মনোযোগী, তাঁরা যে মরুভূমির বালুতে বাষ্প হয়ে যাবেন এ আর বেশী কথা কি! বার দুই বাড়ী গিয়েছিলাম, দেখলাম, ত্রৈরাশিক অঙ্কের নির্ভুল উত্তরের মত সংসারের অবস্থা। অসম্পূর্ণ বিদ্যা নিয়ে ভাই গোটা দুই টুইশনি করছেন। চাকরির যা বাজার—সহায়-সম্পদ কিংবা গোত্র-জাতির খুঁটি না থাকলে সে-ক্ষেত্রে অবলম্বনহীন লতার মত কাদামাখা তো হতেই হবে। ভাই লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, বৌমাটি এসে প্রণাম করলেন। ময়লা কাপড়ে তাঁর দুর্দ্দশার কাহিনী লেখা রয়েছে। মুখ দেখি নি, কিন্তু বলতে পারি ময়লা কাপড়ের মতই সে-মুখ ম্লান। শীর্ণ দেহ হয়ত আহারের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মন সে যুক্তি মানবে কেন?

অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন রাত্তিরে, ভাত না রুটি?'

বললাম, 'কিছু না, এখনই আমায় ফিরতে হবে।' বউমা কাতর

সংক্ষিপ্ত অনুরোধ জানালেন থাকবার জন্য। কিন্তু দুঃখের অন্ন মুখে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের মধ্যে কোথায় ফাঁক স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ছুটে পালালাম। না পালালে সেই মুহূর্ত্তে ওদের কিছু অর্থসাহায্যও হয়ত করতাম।

তার পর দ্বিতীয় বার যখন বাড়ী যাই, বোধ হয় বছর খানেক বাদে, সে নিতান্ত দায়ে প'ড়ে। দুঃখবিলাসের চর্চ্চা ক'রে নরেন (ভাইয়ের নাম) বাস্তুখানিকে মহাজনের হাতে প্রায় দান ক'রে ফেলেছেন। আমায় চিঠি লিখেছেন বৌমার জবানীতে। হঠাৎ নাকি তাঁর মনে হয়েছে, অভাবের তাড়নায় কাজটা ভাল করেন নি ; পিতৃপিতামহের বাস্তু ইত্যাদি ভাবপ্রবণতায় ভরা ফাঁপা সে-চিঠি। ভাবালুতা যে ছোঁয়াচে তা বোধ হয় তুমি ভালরূপেই জান। না হ'লে পিতৃ-পিতামহের বাস্তুর দোহাই আমার মনকে স্পর্শ করল কেন? সেন্টিমেণ্ট্যাল না হ'লে অনায়াসে কি মনে করতে পারতাম না : The world is our room.

বাড়ী এসে দেখলাম, প্রবল বেগে সেখানে দুঃখচর্চ্চা সুরু হয়ে গিয়েছে। বাড়ী ঋণের দায়ে বাঁধা পড়েছে—সে তো তুচ্ছ, নরেন পিতৃপিতামহদের জলগণ্ডূষের উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। রোগা কালো একটি মানবশিশু—দিনরাত কাঁদছে, অসুস্থ দেহের জন্য কি অপ্রচুর আহারের জন্য কে জানে? নগ্ন দারিদ্র্য আর কাকে বলে! এ দেখেও সেদিন চলে আসতে পারলাম না। মহাজনের সঙ্গে দেখা ক'রে বাস্তু রক্ষা করব—হয়ত এই সঙ্কল্পের জন্য। কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আসল সঙ্কল্প আমার প্রকাশ পেল। টাকা আমি ক-বছরে কিছু সঞ্চয় করেছি, ইচ্ছা করলে অনায়াসে ওদের দারিদ্র্য মুক্ত করতে পারি! কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? দীর্ঘকাল

অনাবৃষ্টিতে শুকনো ফাটা জমির মধ্যে এক কলসী জল ঢালার মত সে কি নিরর্থক নয়? অনেক ভেবে দুঃখমোচনের আর একটি উপায় বার করলাম। উপায় সহজ, কিন্তু তোমরা ভাববে—এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর জগতে নেই। দেখেছ তো, ভাঙা ঘরের ফাটলে যে বট অশ্বত্থ বা ডুমুর গাছ বেড়ে ওঠে তাকে টেনে তোলা কত কঠিন! প্রত্যেক বার তার সতেজ শাখাগুলিকে কেটে পতনোন্মুখ গৃহকে বাঁচানোর অপচেষ্টার মত মূর্খতা আর নেই। শিকড়সুদ্ধ না ওপড়ালে শাখার পল্লবিত হওয়াকে রোধ করবে কে? তেমনি আমি যদি আজ ওদের সাহায্য করি, সে দুঃখমোচন হবে কিছুক্ষণের জন্য। দু-দিন পরে আবার বাস্তু বাঁধা পড়বে। আবার সেই হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে। ঠিক করলাম শিকড়ই উপড়ে ফেলব, তাতে যদি বাস্তুর দুই-একখানা ইঁট স্থানচ্যুত হয়—হোক। আমার সংসারে ও-আগাছা আমি রাখব না। বার করলাম পিস্তল। ভেবে দেখলাম ওর দরকার হবে না। ছোট একটি শিশুর কান্না বন্ধ করতে আমার শক্ত হাত দুখানি যথেষ্ট। শিউরে উঠো না, হাঁ, শিশুহত্যাই বটে। বংশলোপ পিণ্ডলোপের ব্যবস্থা। কেন করব না? হাজার হাজার বছর ধরে মনু-বিধান মেনে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আমরা, তাই মৃত আত্মার জলগণ্ডূষের নামে নিজেদের পশুবৃত্তি চরিতার্থতার ফলগুলিকে—শুকনো, রুগ্ন, কুৎসিত ফলগুলিকে—সযত্নে লালন ক'রে চলেছি। অহংভাবটাই যে আমাদের নীচে নামিয়ে দিয়েছে, নইলে যার গৃহ নেই, সে কেন বাস্তুভিটা বাঁচাতে ছুটে এসেছে; যার সন্তান নেই, সে কেন বংশরক্ষার মোহে দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে! এই রাত্রিতেই এ সমস্যার সমাধান করব। ও-ঘরে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর চীৎকার—বাপ-মা তার ঘুমিয়েছে। গ্রীষ্মকাল, কাজেই দরজায় খিল পড়ে নি। সুযোগ তো হাতের কাছেই। উঠ্‌লাম। রীতিবিরুদ্ধ

হ'লেও ওঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দু-হাতের মুঠো আমার তখন শক্ত। দাঁতের উপর দাঁত চেপে নির্নিমেষে শিশুর মুখের পানে চাইলাম। ঘরের স্তিমিত আলো তার মুখে পড়েছে। মনে হ'ল, একটানা কান্না ছাড়া ওর দেহে জীবনের লক্ষণ কোথায়? মৃতকে আঘাত করব! গীতা মনে পড়লো: 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' শিশুর মৃত্যু মানেই আমারও মৃত্যু। ভাবতেই মনটা আনন্দে শিউরে উঠল। বাঃ রে, মুক্তি! এ-কথা তো এক দিনও মনে জাগে নি। আমিও তো ইচ্ছা করলে মরতে পারি! মরবার অস্ত্রও আমার কাছে রয়েছে। মরে তো দুঃখজয় আমিও করতে পারি। কিন্তু আবার সংস্কার উঁকি মারল, ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম ঘরে। আত্ম-ঘাতীর মুক্তি নেই! কিসের মুক্তি! আত্মার? বন্ধু, হেসো না; আমি অনেক কিছু অবিশ্বাস করলেও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, এর পুনর্জন্ম আছে। ভরত রাজার মৃগমুগ্ধ মনের একাগ্রতার আলোকে এর পরজন্মের অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। না হ'লে আমরা বাঁচব কি ক'রে? মৃত্যু যদি আমাদের নবজন্মের রূপান্তর না হবে তো দুঃখের জাঁতায় আত্মাটি যে নিষ্পিষ্ট, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতীয় আত্মা যদি ভারতবর্ষের গণ্ডী না পেরোতে পারে, উঃ, ভাবতে পার সে দুঃসহ ব্যথা! তাই আমি মনের জোরে আমার আত্মাকে সাগরপারে উত্তীর্ণ ক'রে দেবই দেব। যদি জন্মাই—এ-দেশে আর নয়। এই দুঃখবাদীর দেশে, কালির ছাপ কপালে এঁকে,—না, না, এখানে নয়। স্বদেশকে সবাই ভালবাসে, আমি ভালবাসি না। আত্মার কি কোন স্বদেশ আছে? নিছক মনোবিলাস মাত্র। আমি যদি জন্মাই—সাত সমুদ্রের পারে গিয়েই জন্মাব। লেনিনের রাশিয়ায়, কিংবা হিট্‌লারের জার্ম্মেনীতে; মুসোলিনীর ইটালীও আমার কাম্য। কেমালের তুর্কী,

পিলসুডিস্কির পোল্যাণ্ড অথবা ডি ভ্যালেরার আয়র্লণ্ডকেও আমি পছন্দ করি। ইংলণ্ডে জন্মাতে পারলে তো বেঁচে যাই। মোট কথা, ওরা দুঃখ পেলেও তাকে জয় করবার মন্ত্র জানে। ওদের ঘরে রুগ্ন শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনি করে চেঁচায় কি? তুমি ইতিহাসের না-হয় উপন্যাসের নজির দেখাবে। আমিও জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি, সে-দুঃখ ওদের শরতের মেঘ। বার মাস তার তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকতে হয় না ওদের। একখানি ভাঙা ঘরের তলায় পিতৃপিতামহের জল-গণ্ডূষকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে ওরা দুঃখজয়ীর দল ব'লে গর্ব্ববোধ করে না। দুঃখকে ওরা মহত্ত্ব ব'লে স্বীকার করে না, ঘৃণ্য কৃমিকীটের মত পিষে মারবার চেষ্টা করে। তাই তো মন আমার ছুটে যেতে চায় নীল সাগরের পারে। বলতে পার, ঘরের কাছে জাপান রয়েছে—সূর্য্যোদয়ের দেশ। হ্যাঁ, জাপানকেও আমি শ্রদ্ধা করি। আমাদের সূর্য্যাস্তের দেশে যত মহিমাই থাকুক না কেন (অধ্যাত্ম মহিমা, নয় কি?) আমি ভালবাসি সূর্য্যোদয়ের দেশ। যেখানে মানুষের সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, অটুট কর্ম্মশক্তি, অফুরন্ত আনন্দ, সবল মননশীলতা—সব মিলে একটি সম্পূর্ণ মানুষকেই প্রকাশ করে। যদি ওদের মধ্যে বর্ব্বরতা কিছু থাকে, সেটুকু অপরিমিত জীবন-তরঙ্গের ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। আমাদের শান্তসমাহিত, দুঃখজর্জ্জরিত জীবনের রুগ্ন প্রকাশের চেয়ে তা কত মনোহর! প্রচণ্ড যে সুন্দর হয় সে-জ্ঞান ওদের দেখলে পাই, সুন্দর যে নিষ্প্রাণ হয় সে সম্ভাবনা তোমার আমার মধ্যে বর্ত্তমান। যাই হোক, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি কিনব এইটাই স্থির ক'রে ফেললাম। কিন্তু মরবার আগে ওদের একটু শিক্ষা দিয়ে যাব না? খবরের কাগজে এই নিয়ে যদি হৈচৈ না হ'ল, আমার এ অন্তর্দাহ যদি কাউকে না বোঝাতে পারলাম তো বৃথা আত্মঘাতী হয়ে লাভ! হাঁ, শিক্ষাই দেব! সঙ্কল্প স্থির ক'রে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম সেই খোলা দরজায়।

শিশুর কান্না থেমেছে ; ম্লান আলোয় দেখলাম, তার মা এ-পাশ ফিরে সন্তানকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছেন। শুকনো স্তন্যরসে হয়ত বা শিশু সান্ত্বনা পেয়েছে। ঘুমন্ত স্নেহে তার মা একখানি শীর্ণ হাত বেড়ে রুগ্ন শিশুকে সাপটে ধরেছেন। ম্লান আলোয় মনে হ'ল, যেমন রুগ্ন তার মা, তেমনি রুগ্ন তাঁর সন্তান। দু-জনের উপরেই মৃত্যু তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি মেলে ধরেছেন।

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব', সুতরাং আমি আর কেন? আবার ফিরে এলাম ঘরে। আমার কথা শুনে বুঝতে পারছি, তুমি হাসছ! মনে মনে বল্‌ছ, সেন্টিমেণ্টাল হওয়ার কতকগুলি সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত আছে —সেগুলির কাছে নদীর স্রোতে বেতসলতার মত মন আমাদের নুয়েই পড়ে। হয়ত সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যই কি ভ্রাতৃস্নেহ বা বংশরক্ষার মমতা ওর অন্তরালে সক্রিয় ছিল? তা যদি ছিল তো ওদের অর্থসাহায্য না ক'রে চলে এলাম কেন! কেন বাস্তরক্ষার প্রয়াসমাত্র করলাম না? কেনই বা রাইফেল-ফ্যাক্টরির চাকরি ছেড়ে দিলাম!

এখানে, বাংলা থেকে বহু দূরে ব'সে অনুভব করছি—আমাদের মনের ছাঁচ সত্যই অন্য দেশের থেকে আলাদা। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা দেশ ; অল্প শ্রমে ফসল ফলে, অল্প দুঃখে মন গলে। এখানে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশী, যাতে চোখের জল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বার হয়, স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে বুকে বাধে। এই রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরে ব'সে (দেশের নাম করব না)—সূর্য্যাস্ত দেখছি। কোন মহিমা নেই। ধুলায় ধুলায় এখানকার পথঘাট আচ্ছন্ন। গরিব অধিবাসীদের নোংরা পোষাক ও কলহমুখর বাক্‌বিতণ্ডায় সারা দিনমান সারা রাত্রি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এরা ভূতের মত খাটে, কৃমিকীটের মত নীচু হয়ে থাকে, খায় ছাইভস্ম—

তবু কোলাহল না ক'রে গল্প জমাতে পারে না, বুক না কাঁপিয়ে হাসতে জানে না। আশ্চর্য্য এই দেশ! এত দরিদ্র অথচ এত অল্পে সন্তুষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কথা মনে পড়ে। সেখানকার অধিবাসীদের কথা। আমার সেই বাসগৃহ, ভাই, ভাইয়ের বউ এবং রুগ্ন খোকাটিকে। তারা কি এখনও বেঁচে আছে? হয়ত নেই। না থাকুক, আমি বাংলায় আর ফিরব না। কি কাজ এই ভাবপ্রবণ প্রাণটাকে ধ'রে রেখে।

চিঠি দীর্ঘ হয়ে গেল, এখনও আসল কথা বলা হয় নি। আমার পাসবইখানি সঙ্গেই আছে। সমস্ত টাকা তুলে তোমার কাছেই পাঠাচ্ছি। ওগুলোর সদ্গতি না-হওয়া পর্য্যন্ত আমার আত্মার মুক্তি নেই। ভেব না, দেশের কোন সদ্প্রতিষ্ঠানে এ টাকা দান করব—কোন অনাথ আশ্রমে। রোগীর জন্য আমার মাথাব্যথা নেই, আতুরের জন্যও নয়। এ টাকা নরেনকেই দিয়ো। বাঙালী কি না, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির সন্তান আমি, মনুবিধানের অন্তঃসমর্থক আমি—ভায়ের উপর স্নেহটা কিছু অনুভব করছি, কিছু মমতা বাস্তুর প্রতি—আর কিছু বা সেই মৃত্যু-অভিমুখী বংশধরের প্রতি। স্বীকার করছি, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—জন্মলগ্নের বন্ধন, রক্তের ঋণ, পিতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। যদি কখনও সংবাদপত্রে এই হতভাগার মৃত্যুসংবাদ পাও, মুক্তিসংবাদ মনে ক'রে উল্লাস ক'রো। আর প্রার্থনা ক'রো, জন্মান্তর যদি হয় এ দেশে যেন আর না হয়—এই আর্য্যের দেশে, মনুর দেশে, স্বর্গের দেশে। যেখানে দুঃখ আছে—জয়ের অস্ত্র বিকল, ভাবা আছে—জড়তা ঘোচে নি, প্রাণ আছে অথচ আগুন জ্বলে না—তেমন ঘুমপাড়ানীর দেশে নয়। ছবিতে ওদেশের অনেক মানুষ দেখেছি, ইতিহাসে ওদের অদ্ভুত কাহিনী পড়েছি, ওরা সত্যকার মানুষ—স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, মনীষায়, পশুশক্তিতে ও নিয়ত যুধ্যমানতায় অফুরন্ত প্রাণশক্তি ওদের নিয়ত

অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। কাচের আবরণে আগুনকে ওরা ঘিরে রাখে নি, ওরা জানে এ আগুন বাইরের বাতাসে নেচে উঠলে যেমন সহজে বিপদ বাধায়, তেমনি মনোহর হয়ে দীপ্তি পায়। আমি মিশতে চাই ঐ প্রচণ্ড-মনোহরের মধ্যে।

পুঃ—যখন এ-পত্র পাবে, তখন আমি হয়ত ভ্রূণ-অবস্থায় ওদেশের কোন উল্কাজ্যোতিতে পরিণত হ'তে চলেছি। বাংলার নীল আকাশে যে কোমল নক্ষত্র সন্ধ্যাবেলায় জ্বলে ওঠে, তাদের মিছিলে আমায় খুঁজে পাবে না। চৈত্র-দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের দিকে যদি তাকাবার শক্তি না হয়, চক্ষু বুজে সূর্য্যকিরণের লাল আভায় আমাকে ভাবতে চেষ্টা ক'রো। দুঃখকে অনায়াসে জয় করলে যে—সে যে পবিত্র এবং সে যে মানুষ তাতে কি সন্দেহ করতে পারবে, বন্ধু?

অমিয় এ আঘাতে নির্ব্বাক হইয়া গেল। চোখ দিয়া এক ফোঁটাও জল বাহির হইল না, জল বাহির হইলে সে বুঝি বাঁচিয়া যাইত!

১৭

পরদিন সকালবেলায় মেসের কোলাহলটা কিছু বেশী বলিয়াই বোধ হইল। বিপুলকায় বিষ্ণুবাবু কোনদিন সাতটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না; যদিও ঘুম ভাঙে তাঁহার কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষু বুজিয়া বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া ছিন্ন তন্দ্রার আলস্যটুকু ঘণ্টা দুইয়ের জন্য উপভোগ করিতে তিনি ভালবাসেন। মেসের মধ্যে এই লোকটিই ভাল এবং নির্ব্বিবাদী। সকলের কথাতেই থাকেন অথচ কাহারও সঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপ নাই। বার্দ্ধক্যের প্রান্তরে সবেমাত্র পা দিয়াছেন, কিন্তু বিবাহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তা বলিয়া সংসার সম্বন্ধে মোটেই

অচেতন নহেন। কলিকাতার কোন্ গলিতে সস্তায় কোন্ বিশেষ জিনিষটি পাওয়া যায়, এ সকল তথ্য তাঁহার অজানা নহে। চাকরি করেন কোন নামজাদা গভর্ণমেণ্ট আপিসে। মাহিনা মাঝারি। ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সংসার পাতিতে পারিতেন, কিন্তু কেন ইচ্ছা করেন নাই সেইটাই এই মেসবাসীদের কাছে পরম রহস্য। অমিয় প্রথমটা ইহাকে বীরেনের ধাতুতে গড়া বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝিল, এ-ধাতু আলাদা। এখানে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তো দূরের কথা, ধূমের রেখা-মাত্র নাই। নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ। ভাল খাওয়া, টাকা বাঁচানো, শয়নের আরাম ও আপিসের দপ্তর তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ। সকালে সংবাদপত্র এক বার পড়েন এবং আপিসে বা বাহিরে কোন রাজনীতিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে মতামত সংগ্রহ করিয়া মেসের ছাদে বসিয়া সেগুলি নিজস্ব বলিয়া সরবে চালাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। যথা :

'হুঁ, গান্ধীর কথা আর কেউ মানবে না, কংগ্রেস হয়েছে একটা অ্যারিষ্টোক্রাট প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর আবার জাতীয়তা! এই বার দেখেছ হিট্‌লারের গুঁতো, বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের প্ল্যানটা ওদের অনেক দিনের।' ইত্যাদি।

সংবাদপত্রে বন্যার কাহিনী পড়িয়া বলেন : 'আর মশায়, দেশ গেল! গরিবের জমি সব জলের নীচে। মাটির ঘর ধ্বসে পড়ছে, গাছের ডালে শুয়ে দিন কাটাচ্ছে, এদিকে শহরে সিনেমার সংখ্যা বাড়ছে। এইসব দুঃখকষ্টকে মানুষ এমনি অগ্রাহ্য ক'রেই কাটাচ্ছে, এ-জাত যদি না নামবে তো'—ইত্যাদি।

কিন্তু কোন সমিতি চাঁদার খাতা সম্মুখে ধরিলে চোখ পাকাইয়া বলেন : 'বাঙালীর মধ্যে সাধুতা কোথায়। আজ চাঁদা দেব, কাল চপ-কাটলেট খেয়ে ওড়াবে।'

অথবা : 'বন্যা হয়েছে শ্রাবণ মাসে, এখন কার্ত্তিক মাসে এসেছেন চাঁদা নিতে ! আমরা তো আর লক্ষপতি নই, নিজেরই বলে······' ইত্যাদি ।

অধিকাংশ লোকের সঙ্গে তাঁহার যে বাক্যালাপ নাই তাহার একটু মাত্র আভাস তাঁহার কথায় কখনো বা পাওয়া যায়। তিনি প্রায়ই বলেন : 'হ্যাঃ, ওসব চ্যাংড়া ছোকরাদের সঙ্গে মিশব কি, তার চেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান ভাল ।'

কিন্তু কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না থাকিলেও প্রয়োজন মত লোক ডাকিয়া গল্প জমাইতে তিনি ভালবাসেন ।

আজ প্রাতঃকালে চক্ষু চাহিয়াই উঠিয়া বসিলেন এবং বাহিরে আসিয়া যাহাকে পাইলেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনেছেন সূর্য্যিবাবু, —চাকরি করা আর পোষাল না। কোন্ দিন হয়ত ব'লে বসবে—কাল থেকে আর এস না। একে তো পাওনা মাইনের টেন পারসেণ্ট বহুদিন থেকে কেটে নিচ্ছে, আবার বলে কি না, রিডাক্শান ! আহা, সকাল বেলায় এক চোখে আর হাত দেবেন না, কে জানে আবার কোন্ সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসব ।"

বেচারা সূর্য্যবাবু বিষ্ণুবাবুর নির্দ্দেশ মত দু'টি চক্ষুতে হাত কচলাইলেন।

বিষ্ণুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, "শোনেন নি কিছু ?"

"কই, না তো ।"

কণ্ঠস্বর চড়াইয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "এখনও কাকপক্ষীতে জানে না এ-খবর। আমার দাদার ভায়রাভাই যে সিমলের হেড আপিসে কাজ করে ; যা-কিছু কলকাঠি তারাই তো টেপে। কাল হঠাৎ ক-দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে, দেখা হ'তেই বললে সব। মনে আছে মাইনে-কাটার খবর ওর মারফৎ পেয়ে সেবার আপনাদের জানাই। এই সুরেশ তো সেদিন হেসেই উঠেছিল। বলেছিল, স্রেফ গঞ্জালিস ! কেমন , সে-

খবর মিথ্যে হয়েছিল ? আজ কত দিন ধরে তার জের চলছে বল দেখি !" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন ।

সূর্য্যবাবু বলিলেন, "সে সু-খবর তো আজও মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করছি ।"

বিষ্ণুবাবু হাসি থামাইয়া সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন ও মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "যা বলি মিথ্যে বলি না । বাজে বলি না । আমরা তো চ্যাংড়া নই, বয়স আমাদের হেঃ—"

সত্যশরণবাবুকে দেখিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মুখে ছেদ টানিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "শুনেছেন সত্যবাবু, এবার আপিস থেকে বেলপাতা শোঁকাবার ব্যবস্থা হচ্ছে ।"

শুষ্ক মুখে সত্যশরণ বলিলেন, "তাই নাকি, কবে থেকে ?"

বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "শিগ্‌গিরই হবে । রিট্রেঞ্চমেণ্টের খসড়া সব তৈরি হয়ে গেছে, কেবল তারিখটি বসানো বাকী ।" বলিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "ভাবছিলাম আর দু'টো বছর যাক, রিটায়ার ক'রে কোন তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে বাস করব, তা আর অদৃষ্টে নেই ।"

সূর্য্যবাবু ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "আপনার ভাবনা কি মশাই, পাকা ফলটির মত টুপ ক'রে খসে পড়লেই হ'ল ! চাকরি তো করছেন বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ধরে, যেখানে থাকবেন পেনসন নিয়ে রাজার হালে বাস করবেন ।"

বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "তোমাদেরই বা ভাবনা কিসের ? আট-দশ বছর সার্ভিস হ'ল, উপর-নীচে কোন দিক দিয়েই নাগাল পাবে না । যেতে সিনিয়রমোষ্ট বা জুনিয়ররাই যাবে ।" একটু থামিয়া বলিলেন, "হবে না কেন, কংগ্রেস এসে ঠেকাক !"

এমন সময় প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া সুখেন্দু প্রবেশ করিল। বয়স বাইশ-তেইশ, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথার চুল অবিন্যস্ত, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। সবে কলেজ ছাড়িয়া সে চাকরিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। কে এক জন দূরসম্পর্কীয় দাদা সওদাগরি আপিসে চাকরি দিবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া পড়া শেষ হইলেও মেস ত্যাগ করে নাই।

কংগ্রেসের নিন্দা হইলে সুখেন্দু চটিয়া উঠিত, লঘুগুরু না বাছিয়া মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিত।

ঢুকিয়াই সে বলিল, "কি দাদা, কংগ্রেস আপনার বুকে আবার কি মই ডললে? বেশ তো আছেন মেস, আপিস আর সায়েব নিয়ে, ও-সব খারাপ নাম আবার সকাল বেলায় কেন?"

বিষ্ণুবাবুর বৃহৎ লাল চক্ষু দুইটি কুঁচকাইয়া ছোট হইয়া গেল, মুখের কুঞ্চনে হিট্‌লারী ফ্যাশানের গোঁফটিকে বার দুই নাচাইয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "কত ধানে কত চাল এখনও তো বোঝ নি, যাদু! সবুর কর, সবুর কর, আগে চাকরিতে ঢোক, তখন বুঝবে।"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, "সে তো আপনাদের মত মহাত্মাদের দেখেই বেশ মালুম করছি। সেদিন বললেন, পি. সি. রায় বাঙালী জাতির সর্ব্বনাশ করছেন। যত সব ভিন্‌দেশীয়দের ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে বাংলার দফাটি শেষ ক'রে আনছেন। বিদেশে আর কারও কলম পিষে খেতে হবে না।"

সক্রোধে ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ করিয়া ঘন ঘন ওষ্ঠ সমেত গোঁফ নাড়িয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ডেঁপোমি নয় ছোকরা, বুঝবে। পি. সি. রায় যা সর্ব্বনাশ করছেন, এমন সর্ব্বনাশ তোমার কংগ্রেসও করতে পারে নি। কিনা কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখছেন,—বাঙালী, আত্মস্থ হও। তোমাদের হা-চাকরি বৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায়ে মনোযোগ দাও। মাড়োয়ারা-

ভাটিয়া মিলে তোমাদের বাংলা দেশ লুটে নিলে। তোমরা দেশের ছেলে হ'য়ে ভিখারীর মত জুল্‌জুল্‌ করে চেয়ে আছ আর ওদের দুয়োরে ধর্ণা দিচ্ছ, ওরা তোমাদেরই পয়সায় কলকাতার প্রায় সবটা কিনে নিলে। এই যে বিষ ছড়াচ্ছেন, এর ফল কি ভাল হবে ?"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, "তা সত্য। ঘরের মটকায় আগুন লেগেছে এ-কথা ব'লে ঘুম ভাঙানোও তো মহা অপরাধ! আর ঘুম যদি ভাঙাবেই তো এমন বেয়াড়া বেসুরো চীৎকার কেন? মোলায়েম ক'রে, কবিত্ব ক'রে বল!"

বিষ্ণুবাবু বিকৃত মুখেই বলিলেন, 'জ্ঞান তো ভারি! আমার এক আত্মীয় চাকরি করতেন এক ভাটিয়ার গদিতে। পরশু কাঁদ-কাঁদ মুখে এসে বললেন, 'দাদা, আজ আমার চাকরিতে জবাব হ'ল।' অপরাধ? সে বাঙালী এই অপরাধ। ভাটিয়া প্রভু বললেন, 'আমরা তোমাদের সব লুটেপুটে খাচ্ছি, আর কেন। তোমাদের পি. সি. রায়কে গিয়ে বল এর ব্যবস্থা করতে। তোমাদের ঠকিয়ে আমরা অন্ন করছি—সে অন্ন তোমাদের আবার দিয়ে পাপের ভাগী কেন হই?' শুনলে তো জবাব? দেবেন পি. সি. রায় ওঁকে একটি চাকরি? ওঁর বৌ-ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে যে শুকিয়ে মরবে—উনি তার কি ব্যবস্থা করবেন শুনি?"

বিষ্ণুবাবুর মুখে আবার হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সুখেন্দু বলিল, "চাকরির মায়া যে-বৃদ্ধ কখনও করেন নি তিনি কেরানীগিরি দিয়ে পোষণ করবেন আপনার আত্মীয়কে?"

বিষ্ণুবাবু দুই হাতে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "আলবৎ করবেন। কেন তিনি ভিন্ন জাত ক্ষেপিয়ে আমাদের অন্ন মারবার ব্যবস্থা করছেন?"

সুখেন্দু বিষ্ণুবাবুর উত্তেজনার মুহূর্তে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কোলাহলে অনেকেই প্রাতঃনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুবাবু ও সুখেন্দুর বাক্‌যুদ্ধ উপভোগ করিতেছিলেন। সুখেন্দুর সঙ্গে সকলেই সরবে হাসিয়া উঠাতে বিষ্ণুবাবু একেবারে নিবিয়া গেলেন। দুই হাতে কোমরের কাপড়ের কসি আঁটিতে আঁটিতে আপনার জায়গায় গিয়া বসিলেন এবং অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, "যত সব চ্যাংড়া—হ্যাঃ।"

হাসি থামিলে সুখেন্দু বলিল, "আমাদের অবস্থাটা কি রকম জানেন? সেই স্বার্থপর বুড়োর মত। বলুন না দীনেশবাবু—সেই রকম সুর ক'রে, 'ও বাবা মধু, এক বার জলে নেমে দেখ তো বাবা, কুমীর আছে কিনা, আমার রাধু নাইবে।' অর্থাৎ জলে যদি কুমীর থাকে তো প্রতিবেশীর ছেলে মধুই যাক, রাধু আমার বেঁচে থাক।"

—"হাঁ, অনেক দিন চাকরি করলে একটু মায়া পড়ে বইকি। যার আর কোন ব্যসন নেই, তার সায়েব-সংবাদ যে গীতা-সংবাদের চেয়ে মূল্যবান হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ।" বলিয়া বেচারা সূর্য্যবাবু বিষ্ণুবাবুর ঘর উদ্দেশ করিয়া একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই হাসিয়া উঠিলেন।

অনিল প্রফুল্ল কণ্ঠেই বলিল, "যাই বল ভাই, চাকরি আমাদের। ওয়েজকাটও নেই, রিডাক্‌শনের ভয়ও নেই। যখন মাইনে বাড়ে একেবারে পঞ্চাশ—"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, "আর কমবার মুখে দশখানি দশ টাকার নোট!"

অনিল বলিল, "তাও হয়। তবে সেটা খুব কম। কে ভাল কাজ করে না-করে সেদিকে সায়েবদের নজর খুব বেশী।"

সুখেন্দু বলিল, "কিছু দিন চাকরির উমেদারি ক'রে আমার ও-সম্বন্ধে একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। চাকরি কেমন জানেন?

ঠিক ভারতবর্ষের আবাদী জমির মত। যে-জমির উপর মেঘের মমতা পড়ল না সে-জমি শস্য সমেত শুকিয়ে গেল, যেখানে অতিবর্ষণ সেখানেও শস্যহানির সম্ভাবনা। সুবর্ষণ আর ক-টা জমিতে হয়। আমাদের চাকরির ক্ষেত্র এই অদৃষ্টনির্ভরশীল জমিগুলির মত।"

অমিয় এতক্ষণে বাহিরে আসিয়াছে। সুখেন্দুর শেষ কথাগুলি তাহার কানে প্রবেশ করিতেই বলিল, "না সুখেনবাবু, জমিতে চেষ্টা করলে তবু ফসল ফলানো যায়, নদীর জলে সেচ তৈরি বা বাঁধ বেঁধে বন্যার জল আটকানো—"

সুখেন্দু বলিল, "না অমিয়দা, কথাটা আপনি আমার সব শোনেন নি। আমি ভারতবর্ষের জমি বলেছি। যেখানে উপায় আছে, অথচ আলস্য অফুরন্ত; ধান বুনে চাষা মেঘ-দেবতার পূজা করে। তবে এ-কথা আপনি বলতে পারেন যে, আর যেখানে যত আলস্যই থাক, চাকরির চাষ-আবাদে আমরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক চাষা। ওখানে একবার বীজ বোনা হয়ে গেলে ফসল কেটে ঘরে না তোলা পর্য্যন্ত আমাদের অমানুষিক পরিশ্রম চলেই চলে। না হ'লে, ধীরেসুস্থে যখন অবসর নেবার সময় তখনও 'হা-চাকরি' বলে ঐ খুঁটি কেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।"

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সূর্য্যবাবু বলিলেন, "চুলোয় যাক চাকরি, এদিকের একটা সুসংবাদ শোনেন নি বুঝি?"

"কি, কি?" বহুকণ্ঠে প্রশ্ন হইল।

"অমিয়বাবুর যে এ-মাস থেকে মাইনে বাড়ছে।"

"সত্যি? সত্যি? তাহ'লে আমাদের খাওয়া?" বহুকণ্ঠের প্রশ্ন।

অমিয় হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, "পাঁচ টাকা মাইনে বাড়বে, কিন্তু কেটে নিচ্ছে যে টেন পারসেণ্ট।'

"সে তো সকলকারই সমান অবস্থা। কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।"

"আগে মাইনে পাই।"

সূর্য্যবাবু বলিলেন, "সে তো ইনক্রিমেণ্টের দরুন। আর একটা জবর ভোজও যে পেকে উঠছে।"

আবার বহুকণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, "কি, কি?"

সূর্য্যবাবু অমিয়র পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বলি, অমিয়-বাবু?"

অমিয়র সারা মুখে সূর্য্যাস্তের রং আসিয়া লাগিল; মাথা নীচু করিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বেশ তো, বলুন না।"

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, নিজের ঘরে একটু দ্রুত পদেই চলিয়া গেল।

গভীর লজ্জা অনুভব করিলেও গভীর আনন্দও সে সংবাদে ছিল বইকি। সূর্য্যবাবু তাহার রুম-মেট। সেদিন বাড়ী হইতে পাওয়া সেই চিঠিখানির আংশিক মর্ম্ম অমিয়ই যে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিয়াছে।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অমিয়র মুখে উদ্বেগের ছায়া হয়ত সুনিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। পাশে বসিয়া সূর্য্যবাবু হয়ত সেটুকু লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'খবর কি, অমিয়বাবু? বাড়ীতে কারো অসুখ করেছে কি?'

অমিয় শুষ্ক মুখে বলিয়াছিল, 'হাঁ, আমার স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে।'

'খুব জ্বর বুঝি?'

'না, জ্বর, পেটের অসুখ ও-সব কিছু নয়। কিছুই সে খেতে পারছে না।'

'আর?' সকৌতূহলে সূর্য্যববু প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

'আর খেতে গেলেই গা বমি বমি করে।'

সূর্য্যবাবুর কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু দু'টি হাসির দীপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রসন্ন কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বটে, তবে তো ভাগ্যবান পুরুষ আপনি।'

সূর্য্যবাবুর কৌতুকে অমিয় বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে লজ্জা ও আনন্দের গভীর স্বাদে সে হয়ত বিহ্বল হইয়াই পড়িয়াছিল। এ কি সৌভাগ্যের সূর্য্যোদয় তাহার জীবনের আকাশে। চাকরি হইয়াছে, সংসার ধীরে ধীরে গুছাইয়া উঠিতেছে, এমন শুভলগ্নে শিশু-অতিথি তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইবে। বাঃ রে জীবন! চঞ্চল দুরন্ত স্রোতে সুবাতাস পাইয়া তরীখানি বুঝি স্ফীত পালে অভীষ্ট পথেই ছুটিয়া চলিল! নিজের সৃষ্টিতে এমন অপরিসীম আনন্দ কে জানিত? প্রথম সূর্য্যালোকে নবজন্মের উত্তেজনায় রুক্ষ মাটি ভেদ করিয়া তৃণাঙ্কুর কি এমনই আবেগে কাঁপিতে থাকে?

অমিয় সূর্য্যবাবুর সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। সেই দিনকার আনন্দ আজ যেন নূতন করিয়া তাহার সারা অন্তরে তরঙ্গ তুলিল। এ আনন্দ একা এবং নির্জ্জনে কিছুক্ষণ ভোগ করা তার চাই, নতুবা সম্পূর্ণতা নাই। কোলাহলে ইহার মর্ম্মকথাটি মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া যাইবে। অন্য পাঁচ জনের মাঝে বিতরণ করিয়া যদিও এই বার্ত্তার পরম সার্থকতা, তথাপি নির্জ্জন মুহূর্ত্তে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়া সে এটি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিবে। মাথার উপর খোলা কলের জলধারা অবিশ্রান্ত ঝরিতে থাকিবে, মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত চলিবে এই শুভ আবিষ্কারের ফল্গুধারা! কে বলে সৃষ্টির সোমরস কেবল মাত্র দেবতারাই উপভোগ করিয়া থাকেন; ইহার মাদকতায় মানুষও যে পাগল হইয়া যায়।

কলের তলায় মাথা পাতিয়া অমিয় নূতন করিয়া এই অভাবনীয় উল্লাসকে মনের মধ্যে রোমন্থন করিতে লাগিল। কিন্তু সন্তানের আবির্ভাব-সংবাদের উগ্র উল্লাস অবিশ্রান্ত জলধারা-পতনের শীতলতায় ক্রমশঃ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া যে-ভ্রূণ রক্তমাংসের মানবশিশুতে নিঃশব্দে রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার আবির্ভাব অমিয়র জীবনে প্রথম বসন্ত-প্রকাশের যত মাধুর্য্য ও যত বিস্ময়ই বহিয়া আনুক না কেন, পুরাতন পৃথিবীর মৃত্তিকায় নূতন করিয়া রোমাঞ্চ জাগাইতে পারিবে কি? অবিশ্রান্ত জলধারা-পতনের সঙ্গে যাহাদের পদধ্বনি শব্দমুখর হইয়া উঠিতেছে, সেই শিশুদেবতার মিছিলের পুরোভাগে চলিয়াছে বিশ্বজিতের সন্তান, বীরেনের বংশধর, এবং আরও অনেক নাম-না-জানা ও আধজানা অযুত রুগ্ন, দুর্ব্বল, ক্ষুধাতুর ও মৃত্যু-অভিমুখী শিশু। তাহাদের পিছনের পটভূমিতে ও সম্মুখের প্রাঙ্গণে বিরাট অন্ধকার স্তূপ, মাঝখানে শুধু স্তিমিত আলোয় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উহাদের যাত্রা সুরু হইয়াছে। সেই অন্ধকার ও শিশু-জনতার মধ্য হইতে অমিয়র সন্তানকে পৃথকভাবে বাছিয়া লওয়া কি এতই সহজ?

অমিয় জোর করিয়া চক্ষু বন্ধ করিল ও অন্তরের দৃষ্টিকে বহু দূরে প্রসারিত করিয়া দিল। কতকগুলি আলোকবিন্দু অন্ধকার তরঙ্গে পড়িয়া ক্রমশঃ যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে; সেখানে কলরব বা কোলাহল নাই, মুক্তির কোন প্রয়াস নাই, আর্ত্তনাদের ঘটা নাই। স্থির নিঃশব্দ অথচ দ্রুত মৃত্যুর লীলায় অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে। দম বুঝি বন্ধ হইয়া আসে।

সজোরে অমিয় চক্ষু চাহিল। জলধারা তেমনই অশ্রান্ত পড়িতেছে, এবং সারা গায়ে কাঁটা দিয়া শীত-শীত বোধ হইতেছে।

তাড়াতাড়ি সে গামছা নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে লাগিল। পিছনে যাহার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড তাড়না, নিশ্চিন্তে দু-দণ্ড আলো বা অন্ধকার, সুখ বা দুঃখকে ধ্যান করিবার সময় তাহার কোথায়?

১৮

সপ্তাহ দুই পরে, সত্যই এক দিন বিষ্ণুবাবুর সংবাদটি আকস্মিক বজ্রপতনের মত সমস্ত আপিসকে ভয়চকিত করিয়া তুলিল।

উপর হইতে খবর আসিয়াছে, রিট্রেঞ্চমেণ্ট অবিলম্বে আরম্ভ হইবে। অফিসার হইতে সামান্য পিয়ন পর্য্যন্ত কাহারও মুখে নিরুদ্বিগ্নতার প্রশান্তি আর নাই। সকলেই অত্যাসন্ন বিপৎপাতের দিন-গণনায় দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কাহার কত দিন চাকরি হইয়াছে, কত টাকা ফণ্ডে জমিয়াছে, চাকরি গেলে সেই টাকা লইয়া কোন সুবিধাজনক ব্যবসা করিয়া সংসার চালান সম্ভব কি না, সাহেবদের কি মতামত, কাহার উপর কোপ বেশী, ভুলচুক করিয়া কে বা কাহারা সার্ভিস রেকর্ড শোচনীয় করিয়া রাখিয়াছে ইত্যাদির হিসাব-নিকাশে দৈনন্দিন কাজের বেগ কিছু মন্দীভূত হইল। কর্ত্তব্যঅবহেলার দরুন ইহাদের মনে ক্ষোভের চিহ্ন মাত্র কোন কালেই দেখা যায় না, আজও গেল না।

দাদার চেয়ারের সামনে ভিড়টা টিফিনের সময়েই জমে, আজ সকাল হইতেই সেখানে লোকের আনাগোনা সুরু হইয়াছে। অন্যে তো দূরের কথা, খোদ বড়বাবু পর্য্যন্ত একখানি চেয়ার টানিয়া সে-আসরে যোগ দিয়াছেন। খগেনবাবু তাঁহার পাশে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে (এ-ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ মানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই নহেন!)—অশ্রাব্য স্বরে গালি পাড়িতেছেন। পাশে দাঁড়াইয়া কেহ বা সে-গালিতে সাহস সঞ্চয় করিয়া আস্ফালন করিতেছেন, কেহ বা ভরসা না পাইয়া ফ্যাল ফ্যাল

করিয়া বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। বড়বাবুর মুখের এক টুকরা হাসিতে বা একটু সান্ত্বনাবাক্যে যেন ইহাদের প্রাণে মত্ত হস্তীর বল আসিবে। কিন্তু বড়বাবু আজ সে-বিষয়ে অত্যন্ত কৃপণ। নিজের মনের নদীতে যে প্রবল তুফান উঠিয়াছে, রিট্রেঞ্চমেণ্টের ব্যাপারে তাঁহার কতটুকু হাত সে তথ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত মুখে হাসি ফুটান কি এতই সহজ?

দাদা কচি ছেলেটির মত পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "আচ্ছা দাদা, সায়েবদেরও চাকরি যাবে তাহ'লে?"

বড় দুঃখেই বড়বাবুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "তুমি দিন দিন যেন ন্যাকা হচ্ছ, দাদা। কার চাকরি যাবে না-যাবে আমায় কি কেউ জানিয়েছেন! বলে নিজের জ্বালায় মরছি!"

খগেনবাবু বলিলেন, "তোমার আর কি ভাবনা ভাই, পাচ্ছ দু-শ, চাকরিও হ'ল ত্রিশ বছরের উপর, গ্র্যাচুয়িটিই তো পাবে দু-শ পনেরং তিন হাজার। তার পর, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কোন্ না বিশ হাজার জমেছে?"

বড়বাবু বলিলেন, "বিশ হাজার, না হাতী! মাইনে তো এই বছর কতক হ'ল বেড়েছে। মেরে কেটে হাজার দশেক হ'তে পারে। ব্যাঙ্কের ফিক্স্‌ড ডিপজিটে আজকাল কত ক'রে ইণ্টারেষ্ট দেয় হে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "ব্যাঙ্কের খাতাও খুলি নি, খবরও রাখি নে। যা পাবে, কাশীবাস করলে রাজার হালে চলবে। মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী নেই, ছেলেও তোমার কলেজে পড়ছে না।"

শান্তিবাবু বলিলেন, "দাদার কোন ভাবনা নেই। সেদিন তো নিজেই বলছিলেন, চাকরি আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে কোথাও গিয়ে দু-দণ্ড নিরিবিলিতে বাস করি।"

দাদা ব্যথিত হাস্যে বলিলেন, "সে বলেছিলাম কথার কথা। খাটতে হ'ত আমার মত তো তুমিও বলতে ও-কথা।" পরে বড়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আরে দুটো পানই নাও।"

"আর পান! ভাবনা-চিন্তায় কি আর পান চিবুতে ভাল লাগছে। যাই এক বার উপরটা ঘুরে আসি, সায়েবরা কি বলাবলি করছেন, জেনে আসি।" বলিয়া দাদাকে বিস্ময়সাগরে ডুবাইয়া দিয়া পান না-লইয়া বড়বাবু সত্যসত্যই মজলিস ত্যাগ করিলেন।

এতক্ষণে খগেনবাবুর আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটিল। সব্যঙ্গে বলিলেন, "ভাবনা তো ভারি! চাল নেই চুলো, ঢেঁকি নেই কুলো! রিট্রেঞ্চমেণ্ট-লিষ্ট যদি ওর হাতে না গিয়ে পড়ে তো কি বলেছি আমি।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কি রকম মনে হয় আপনার, সিনিয়রিটি ধরে টান দেবে, না, এফিসিয়েন্সির কলকাঠি টিপবে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "যম জানে! শুনছি তো যাদের ত্রিশ বছর সার্ভিস হয়েছে তাদের রিটায়ার করতেই হবে।"

এই কথার সঙ্গে অনেকের মুখই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজেন সোৎসাহে বলিয়া ফেলিল, "হে হরি, তাই যেন হয়। আমি কালীঘাটে গিয়ে এক দিন পূজো দিয়ে আসব।"

দাদার মুখের ছায়া গাঢ়তর হইল, শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "তাই নাকি, কোথায় শুনলেন আপনি?"

নিত্যহরি মনের ভয়কে দূর করিবার জন্য সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, "তুমিও যেমন, আজ এল খবর আজই অমনি খগেনবাবু সব জেনে ফেললেন?"

এই কথার সঙ্গে কয়েকটি মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইলেও, অনেকগুলি মুখ পুনরায় ম্লান হইয়া গেল।

"আচ্ছা, কি ভাবে রিট্রেঞ্চমেণ্ট সুরু হবে?"

"টেন পারসেণ্ট বোধ হয়?"

"ধরুন আপিসে এক-শ জন কেরানী আছে, তার মধ্যে দশ জনকে যেতে হবে তো?"

"তা হবে বইকি।"

সভয়ে সকলে পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। কে সেই ভাগ্যহীন যাহার নাম রিট্রেঞ্চমেণ্টের দেবপূজায় অতি শীঘ্রই উৎসর্গিত হইতে পারে!

সহসা খগেনবাবুর কর্কশ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, "দূর, দূর, যত সব আনাড়ি! ওয়েজ-কাট টেন পারসেণ্ট হয়েছে ব'লে কি এতেও তাই হবে। দশ পারসেণ্ট গেলে চলবে সেকশনের কাজ? একেই তো এক-এক জনের ঘাড়ে ডবল করে কাজ চাপানো।"

শম্ভুচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "একটা পান দিন দাদা, গলা শুকিয়ে যেন কাঠ মেরে গেছে। ভাবতে আর পারি না।"

পানের রসে গলাটা ভিজিলে তিনি আরম্ভ করিলেন, "আমারও মনে হয় জুনিয়রদেরই চাকরি যাবে। মানে, যাঁদের পাঁচ বছরের কম সার্ভিস, তাঁদেরই—"

অমনই গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "এ যুক্তিটায় মন নিচ্ছে। হ'তে পারে এইটাই সম্ভব, হওয়া উচিতও তাই।"

ভিড়ের ও-পাশ হইতে কে এক জন ছোকরা বলিল, "হওয়া উচিতও তাই! কেন, যাঁরা বুড়ো হয়েছেন, তাঁরা গেলেই তো আপদ চোকে। হাজার হাজার ছেলে 'হা-চাকরি' ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুড়োরা অনড়

পাহাড়ের মত চেয়ার দখল ক'রে বেকার সমস্যা সঙ্গীন ক'রে তুলছেন বই তো না!"

শান্তিবাবু বলিলেন, "বুড়োরা যাবে কোন্ দুঃখে। তাদের চাকরি গেলে কি আর চাকরি জুটবে? ছেলেদের উৎসাহ আছে, সামর্থ্য আছে—"

ভিড়ের ও-পাশ হইতে উত্তর আসিল, "কেন, চিরকালই কি চাকরি করতে হবে? ভগবানের নাম নেবার দরকার হবে না বুঝি? আমাদের শাস্ত্রে কি নেই পঞ্চাশোর্দ্ধে—"

খগেনবাবু ধমক দিলেন, "থাম ডেঁপো ছোকরা, শাস্ত্রজ্ঞানও আছে!"

দাদা সদুঃখে বলিলেন, "কি দিনকাল পড়ল বল তো খগেন ভাই! ধর, ত্রিশ বছরে যদি-ই রিটায়ার করতে হয়, আমার কথা বলছি না, যাদের ছেলে কলেজে পড়ছে, গুটি দুই-তিন মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি, তাদের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। উঃ!" বলিয়া ডিবা খুলিয়া গুটি দুই-তিন পান মুখে পুরিয়া দ্রুতবেগে চিবাইতে লাগিলেন।

শান্তিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা ধর যদি নীচের দিক্ থেকেই লোক ছাঁটাই হয়—আর টেন পারসেণ্ট হয়—তাহলে কার কার চাকরি যাওয়া সম্ভব?"

খগেনবাবু খাতা পেন্সিল লইয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠেই হিসাব কষিতে লাগিলেন. "এক—রমাপতি, দুই—নিশীথ, তিন—সুরেন, চার—অমিয়—"

বিশ্বজিৎ অমিয়র জামায় টান দিয়া বলিল, "এ-ঘরে এস। মিছে হয়তো তোমার মন খারাপ হয়ে যেতে পারে!"

অমিয় ম্লান হাসিয়া বলিল, "মন খারাপ হবারই কথা। যখন সংসার ছোট ছিল তখনকার ভাবনার চেয়ে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "এখনকার ভাবনা খুব বেড়েছে? মোটেই না।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "মোটেই না!"

মাথা নাড়িয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "উঁহু। ভাবনার কি ভল্যুম আছে নাকি? সে যখন মনকে পেয়ে বসে, কারণে বা অকারণে, তখন তার সবখানিই জুড়ে থাকে, পীড়া দেয়। চাকরি হবার আগে ভাবনা, বজায় রাখবার ভাবনা, আবার কখন যাবে ব'লেও ভাবনা! ভাবনাটা কোন্ সময় থাকে না বলতে পার, অমিয়?"

"তোমার ভাবনা হয় না, বিশ্বজিৎ-দা?"

"হয় না বললে মিথ্যে বলা হবে। খুবই হ'ত। তখন ভাবতাম যে, দুঃখ-দৈন্যের অতল সাগরে আমরা তলিয়েই যাচ্ছি—টেনে তোলবার কেউ নেই। এখন ভাবি, বেশ তো, সেই দুঃখসাগরের তলায়ও তো আমরা বাঁধতে পারি ঘর, সেখানেও কল্পনাকে রঙীন ক'রে দুঃখকে গ্রাহ্য নাও করতে পারি। বিষে যেমন বিষক্ষয়।"

"তা কি হয়। দুঃখ যা তা দুঃখই।"

"দুঃখকে সুখ তো বলিনি আমি। কেবল সহ্যশক্তির কথা বলছি। তোমায় একবার আঘাত করলে যে তীব্র যন্ত্রণা তুমি পাও, বার-বার আঘাত খেয়েও যন্ত্রণার সেই তীব্রতা তোমার থাকে কি?"

"তা কেন থাকবে! বার-বার আঘাত পেয়ে যন্ত্রণা অবশ্য কমে না, অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "এ-ও তাই। ঢুকে অবধি শুনছি চাকরি গেল গেল। মাইনে কাটার প্রথাটা নূতন হ'লেও, রিট্রেঞ্চমেণ্টের কাঁচি এই প্রথম চলছে না। চাকরি-সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে ও-ধারা চ'লে আসছে। এমন কেউ কি কোন দিন মনে করেছেন যে, চাকরি পাকা হ'লেই সেটি অচ্ছেদ্য বর্ম্ম হয়ে গেল! আগুনে পুড়বে না, তীর খেয়ে ফুটো হবে না?"

"আজ যদি তোমার চাকরি যায় তো তুমি কি কর, বিশ্বজিৎ-দা?"

"কি আর করব, তোমাদের মত যাদের স্নেহ করি, এখানকার বাসা ওঠাবার আগে তাদের ডেকে এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াই।"

"তুমি ঠাট্টা করছ।"

"কি দুঃখে ঠাট্টা করব? যাদের ভালবাসি, চাকরি গেলে তাদের কি আর তেমন প্রাণের আনন্দে খাওয়াতে পারব। আর কলকাতায় বাসও আমাদের চলবে না। কাজেই, ভোজের মধ্য দিয়ে বিদায়-আয়োজন করতে হবে। কিনা, পার্‌টিং কিক্!"

"দেশে গিয়ে কি করবে?"

"হয়তো কিছুই না। যতদিন ব্যাঙের আধুলি নাড়বার সুযোগ হবে, ততদিন নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে খাব, ঘুমোব, বউ-ছেলে নিয়ে আদর করব, ইচ্ছে হ'লে তাস পিটতেও পারি। হাঁ, আর একটি কাজ নিশ্চয়ই করব। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প'ড়ে চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা।"

"আবার চাকরির চেষ্টা?"

"কেন নয়?" বলিয়া বিশ্বজিৎ হাসিয়া উঠিল।

অমিয়ও হাসিল। বলিল, "তা বটে! আমরা প্রাণপণে চাকরি সংগ্রহের চেষ্টাই তো করছি। ছোট, বড় এবং মাঝারি। চাই চাকরি, চাই অর্থ। চাকরির ছায়ায় ব'সে আমরা হিট্‌লার, মুসোলিনীর জয়গান করি, বেকার অবস্থায় কার্ল মার্কস্, লেনিন আওড়াই।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বেশ তো, চাকরির নদীতেই চলুক না আমাদের সাঁতার কাটা। যার স্বাদ আমাদের পুলকবিহ্বল ক'রে তোলে—তার সৌন্দর্য্য, মোহ জেনেও ছাড়া শক্ত। চাই আঘাত, অমিয়, শক্ত আঘাত। আঘাত আমরা পাচ্ছি, আরও পাব। কম্যুন্যালিজম্, প্রভিন্সিয়ালিজম্ ইত্যাদির শাণিত অস্ত্রাঘাতে সে মোহও আমাদের অবিলম্বে কাটবে।" একটু থামিয়া বলিল, "আজ আমি যদি গোলদীঘির বেঞ্চের উপর

দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি, 'ভাই সব, এই সর্ব্বনেশে চাকরির মোহ ছেড়ে গ্রামে ফিরে চল, চাষবাস কর।' যারা শুনবে তারা নিশ্চয়ই হাত-তালি দিয়ে আমার বক্তৃতাকে সম্বর্দ্ধিতও করবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে হেসে বলবে, 'পাগল! তা কি হয়? জমি কোথায় চাষ করব, অর্থ কোথায় হাল বলদ কিনব? চাকরি না ক'রে বাঁচব কি করে?' একটু থামিয়া বলিল, "অথচ চাকরি ক'রেও যখন সাচ্ছল্য আসে না, মহাজনের রক্তচক্ষু কোমল হয় না, আধপেটা খেয়েও যক্ষ্মার ওষুধ কিনতে ডিস্‌পেন্‌সারিতে ছুটতে হয়—তখনও চেতনা হয় না কি? আমাদের চাকরি-মোহগ্রস্ত জীবনে সে চৈতন্যের মূল্য অল্প। এক বার যেখানে মাথা গুঁজেছি, রোদ, জল, ঝড় যাই হোক না কেন—মাথা গুঁড়ো হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখান থেকে তা তুলতে পারব না। কিন্তু আমাদের পরে যারা আসবে, তারাও কি ভুল করবে?"

অমিয় বলিল, "যদি তারাও ভুল করে। শিক্ষা যে আমাদের ভুল।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "শিক্ষার গলদ বেশী দিন চলে না। ঘনবাষ্পে ভরা মেঘ কতক্ষণ বর্ষণ না ক'রে থাকে? জান, অমিয়, আমার তো মনে হয়,—

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।'

অমিয় কথা কহিল না। বিশ্বজিতের স্বপ্নকে মিথ্যা আঘাত দিয়া লাভ কি?

দিন দুই পরে বড়বাবু দাদার টেবিলের সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "শুনেছ খবর?"

দাদা দুই বৃহৎ চক্ষুর উপর হইতে চশমাটি কপালের উপর উঠাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "না তো! রিট্রেঞ্চমেণ্ট বন্ধ হ'ল?"

বনে আগুন লাগিলে দিশাহারা প্রাণীগুলি যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে এক জায়গায় আসিয়া জমে, মুহূর্ত্তে দাদা ও বড়বাবুকে ঘিরিয়া জনতা সৃষ্টি হইল।

বড়বাবু দাদার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পরে আপন কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মিষ্ট করিয়া স্মিতহাস্তে আরম্ভ করিলেন, "বেদবাক্য মিথ্যা হ'তে পারে, তবু রিট্রেঞ্চমেণ্ট বন্ধ হয় কখনো! কিন্তু আশ্চর্য্য ওদের বিবেচনা শক্তি! সায়েব লোক—ওদের মেজাজই আলাদা। সাধ ক'রে কি আর বলে সায়েব-সুবো। সুবো কিনা, শুভ। বললে, 'ব্যানার্জ্জি, রিট্রেঞ্চমেণ্টের ব্যাপারে ডিপার্টমেণ্ট্যাল ইন্‌চার্জ্জের মতামত তো নিতেই হবে। সিনিয়র জুনিয়র ও-সব ফাঁকি চলবে না, আমরা চাই এফিসিয়েণ্ট লোক।' একটা লিষ্ট তৈরি করবার ভারও আমায় দিয়েছেন।" বলিয়া দাদার ডিবা হইতে গোটা দুই পান ও নিজের কৌটা হইতে কিছু দোক্তা লইয়া মুখে পুরিলেন। অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে ধীরে ধীরে পান চিবাইবার সময়ে মনে হইল, এই গুরুভার পাইয়াই সহসা যেন তিনি ভারমুক্ত হইয়া অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিতেছেন! পান চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে নামের লিষ্টগুলি তাঁহার বাঁধানো দাঁতের ফাঁকে আসিয়া জড়ো হইতেছে কিনা কে জানে?

বড়বাবুর উল্লাসে দাদাই শুধু খানিকটা মৌখিক উল্লাস প্রকাশ করিলেন, "আঃ বাঁচিয়েছেন ভগবান। তোমার উপর ভার পড়াতে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।"

শম্ভুচন্দ্র ও ফণীবাবু একযোগে অকৃত্রিম আনন্দগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "ভগবান না থাকলে আর দিনরাত হচ্ছে কি ক'রে।"

তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতির অবকাশে ভিড়ও সহসা পাতলা হইয়া গেল। যথাসময়ে টিফিনের ঘণ্টা বাজিলেও সেদিন ছুটির কলরব তেমন জমিল না।

ছুটির পর সকলেই শুষ্কমুখে পথে পা দিলেন। অন্যদিনও মুখ যে সকলের বিশেষ উজ্জ্বল বোধ হয় তাহা নহে, তবে আজিকার শুষ্কতা একটু বেশী মাত্রায় চোখে পড়ে। অন্য দিন নানাপ্রকার আলোচনায় সে-শুষ্কতা সুপ্রকট হইতে পারে না, আজ এক জন বক্তার পিছনে বহু শ্রোতা নীরবে শুষ্কমুখে পথ অতিবাহন করিতেছে। কাহারও মুখ হইতে ক্ষুদ্র সাহসের একটি স্ফুলিঙ্গ খসিয়া পড়িল তো সেই দীপ্তিতে অনেকেরই অন্তর ক্ষণতরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য ? নিশ্চিত মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও মানুষ বুঝি এত শঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন হয় না।

বিশ্বজিৎ বলিল, "কাল শনিবার, বাড়ী যাবে তো ?"

অমিয় বলিল, "না। মাসকাবারের শনিবার, হাতে টাকা নেই।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "তাহলে আমার ওখানে তোমার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, ভুলবে না তো ?"

"না।" বলিয়া দুই দিন আগে বিশ্বজিতের একটি কথা মনে পড়াতে অমিয় রহস্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "পার্টিং কিক্ নাকি, বিশ্বজিৎ-দা ! "

হাসিমুখে বিশ্বজিৎ বলিল, "কিছুই অসম্ভব নয়। ঘটা ক'রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করবার সময় আর না-ও পেতে পারি।'

"মাপ কর বিশ্বজিৎ-দা, কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল !" লজ্জিত মুখে অমিয় মাথা নামাইল।

অমিয়র পিঠে চাপড় মারিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "তোমার এতে লজ্জা পাবার কি আছে ? সকলের মাথার উপরই যখন সরু সুতোয় বাঁধা তলোয়ার ঝুলছে, তখন কার তলোয়ারে হাওয়ার বেগ লাগবে তার

ঠিক কি। আমরা চিহ্নিতনামা লোক ব'লেই ভাগ্যকে মিছে আঁকড়ে থেকে কঠিন সত্যকে ভুলতে পারি না। আসবে তো?"

"আসব।"

১৯

হেমন্তকালের দুপুরের একটি মূর্ত্তি আছে। সে-মূর্ত্তি ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিন কর্ম্মীর চোখে পড়া সম্ভব নহে। সংক্ষিপ্ত দিনগুলিতে সূর্য্যের কিরণ কোমল এবং আরামদায়ক মনে হয়; এ-দাক্ষিণ্য প্রথম উত্তরবায়ুর প্রসাদাৎ হয়তো মানুষ লাভ করিয়া থাকে। আরামের স্পর্শে দেহের আলস্য বেশী মাত্রায় পরিস্ফুট হয় বলিয়াই কি দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর পায়ে চাদর ঢাকিয়া একটুখানি নিদ্রার আয়োজন ভালই লাগে। হেমন্তের দিনে স্পষ্ট একটি পরিবর্ত্তন প্রকৃতির চারিদিকে ফুটিয়া উঠে। পথের ধুলি কিছু গাঢ়, আকাশের নীলের প্রকাশ ক্রমশই ধূসরত্বে ঢাকিয়া যাইতেছে, গাছের পাতাগুলি কিছু কর্কশ, কিছু ধুলিমলিন। মানুষের দেহেও রুক্ষতা ফুটিয়া উঠে, ত্বকের সে মসৃণতা থাকে না, নখ দিয়া গায়ে আঁচড় কাটিলে স্পষ্ট একটি সাদা দাগ পড়ে। মন,—হাঁ, মনও হিম-হাওয়ায় কিছু সতেজ হইয়া উঠে বইকি। আলস্য ও অবসাদের ধোঁয়া মনকে আর কুয়াশাচ্ছন্ন করিতে পারে না। বাহিরের সূর্য্যভ্রমণ-পথ সঙ্কীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদয়াচলে তাঁহার পরিক্রমার ক্ষেত্রটিও বুঝি প্রশস্ততর হইয়া উঠে।

রাস্তায় বাহির হইয়া স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে অমিয় বিস্ময় বোধ করিল। দশটায় আপিস-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পাঁচটায় বাহির হইবার সৌভাগ্য লাভ যাহার হয়—শীতের আরাম-দায়ক সূর্য্য, বর্ষার বাদলধারা, বসন্তের বিলাস ও গ্রীষ্মের প্রখরতা

তাহার ঋতু-পরিচয়ের ক্ষেত্রটিকে আর কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে! মানুষের জন্যই প্রকৃতির বেশবাস, অথচ কর্ম্মব্যস্ত মানুষ সেদিকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুখ তুলিয়া দেখে না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা একটানা সুরে অতিপরিচিত বিক্রেয় জিনিষের নাম দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, বেশ লাগে। কাঁসারী যখন বাসন বাজাইয়া বিক্রেয় জিনিষের ইঙ্গিত করে, খিলিপানের সুর যখন ইলিশমাছের মত শোনায়, শিশি-বোতল-কাগজ-বিক্রেতার কণ্ঠস্বর ও অন্ধ বুড়ার একাদশী বা তিথিবিশেষের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের বিচিত্র বাক্‌ভঙ্গী রাজ-পথের ঊর্দ্ধে উঠিয়া দ্বিতল ত্রিতলের জানালায় আঘাত করে তখন রাজধানীর নূতন রূপকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখা দুষ্কর নহে কি? ওগুলি কানের পথে গিয়া মনের সঙ্গে মিতালী পাতায়। বেশ কিছুক্ষণ মনকে লইয়া দোলাও দেয়।

এক বার অমিয়র জ্বর হইয়াছিল। বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে যেমনই চক্ষু চাহিয়াছে অমনই দুপুরের রংটি মনে হইয়াছে হলুদ। সেই হলুদে দুপুরে চক্ষু বুজিয়া ফেরিওয়ালার বিচিত্র কণ্ঠস্বর মেসের নির্জ্জন কক্ষে যে কোন উচ্চ সঙ্গীত-ধ্বনির মত মনে না হইলেও, সে উপভোগ করিয়াছে। দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে, নিঃসঙ্গতার অবসরে ঐ বিচিত্র রাগিণী বুঝি প্রাণবন্ত হইতে পারে।

পথের বহুদূরে আসিয়া বিশ্বজিতের কথা তার মনে হইল। সেখানে সে চলিয়াছে, অথচ এতক্ষণ হৈমন্তিক দুপুরের ক্ষণকালীন ভালবাসায় পড়িয়া সেখানকার কথা সে ভুলিয়াছিল। যাহার সম্মুখে অন্নসমস্যার নগ্নরূপ সুপ্রকট, সে হলুদে দুপুরের, কোমল ও সংক্ষিপ্ত দুপুরের, স্বপ্ন দেখে কি করিয়া?

কড়া নাড়িয়া বিশ্বজিৎকে ডাকিতে হইল না, সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বোধ করি অমিয়র প্রতীক্ষাই করিতেছিল। হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল, "এস।"

অমিয় সবিস্ময়ে বাড়ীখানার পানে চাহিল। চারি দিকে উহার বাঁশের ভারা উঠিয়াছে, রাজমজুর কর্ণিকের ঠুন্‌ঠান্‌ শব্দে ফোঁপরা দেওয়ালে ঘা দিয়া জমাট খসাইতেছে। নোনাধরা পাতলা ইটের দেওয়াল আরও কুৎসিত বীভৎস দেখাইতেছে।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "আশ্চয্য হয়ে দেখছ কি? আমাদের দুর্দ্দশা দেখে বাড়ীওয়ালার করুণা হয় নি, কর্পোরেশনের ঠেলায় আইন-বাঁচানো গোছ মেরামত চলছে।"

ভিতরে ঢুকিয়া অমিয় বিশ্বজিতের শিশুটিকে দেখিতে পাইল। শিশুটি বড় হইয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শীর্ণও হইয়াছে। মাথায় বিশ্বজিতের মতই কোঁকড়া চুল, চোখের ভ্রূ ও তারা বিশ্বজিতের মতই ঘন ও কালো, কিন্তু নাসিকা নিম্ন হইতে চিবুকাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিশ্বজিতের সঙ্গে মেলে না; খুব সম্ভব খোকা মায়ের মুখশ্রী লাভ করিয়াছে। খোকা এখন চলিয়া বেড়াইতে পারে, টলিয়া পড়িয়া যায় না। এ-বয়সের যেমন রীতি—এক জায়গায় একদণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। ষ্টোভের তেল ফেলিয়া, হাতে হলুদ মশলা মাখিয়া, বাসনের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলিয়া, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া, কুটনার খোসা ছড়াইয়া, বাপের পিঠে কিল বসাইয়া ও মায়ের মুখে চুমা খাইয়া, ঘরখানিতে—যতক্ষণ না নিদ্রা আসে—মাতামাতি করিয়া বেড়ায়। বিশ্বজিতের কাছে চড় খাইলে সুপর্ণার কাছে গাল ফুলা-ইয়া নালিশ জানায়, আবার সুপর্ণার কাছে তাড়া খাইলে মাটিতে পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দেয়। আদরের অর্থ বুঝিতে শিখিয়াছে, তাই অকারণ কান্নায় আবদার তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। অমিয় দেখিল,

গোটা দুই কাঠি লইয়া রেলিঙে শব্দ তুলিয়া খোকা বাজনা বাজাইতেছে ; মা তাহার হয়তো ঐ ফালি বারান্দার এক পাশে বসিয়া অসতর্ক মুহূর্ত্তে মাথার কাপড় নামাইয়া ডাল সাঁতলাইতেছে।

তাঁহাকে সতর্ক করিবার মানসে অমিয় হাঁকিল, "কি খোকা, বাজনা হচ্ছে ?"

কণ্ঠস্বরে সুপর্ণা মাথায় ঘোমটা তুলিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "অমিয় দিন-দিন যে দেখি নূতন হ'চ্ছ !"

অমিয় হাসিমুখেই ঘরে ঢুকিল।

ঘরে ঢুকিয়া সে আর একবার বিস্মিত নয়নে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। বিশ্বজিৎ কি কোথাও যাত্রার আয়োজন করিতেছে ? তক্তাপোষের উপর ট্রাঙ্ক ইত্যাদি গোছানো, ঘরের রাশীকৃত ক্যালেণ্ডার ও আয়নাগুলি খুলিয়া এক জায়গায় জড়ো করা হইয়াছে ; বালি-খসা দেওয়ালে শুধু ঘনবিন্যস্ত পেরেকের সারি। জলের কুঁজাটি মাত্র ঠিক জায়গায় আছে, আর সমস্তই গুছাইয়া তক্তাপোষের উপর স্তূপীভূত করা হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ বলিল, "বলেছি তো আইন-বাঁচানো গোছ মেরামত চলছে। মাসের আর পনেরোটা দিন আছে, একেবারে নোটিশ দিয়েই দিলাম। দিন-কতকের জন্যে ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক, আমিও কোন মেস-টেস দেখে নিই। আছে জায়গা তোমার মেসে ?"

অমিয় বলিল, "একবার বাসা ওঠালে আবার বাসা খুঁজে নেওয়াও তো কম হাঙ্গামা নয়।"

"শুধু হাঙ্গামা ! আমাদের আবার বামুনের গরু না হলে তো চলে না। জায়গা বেশী, ভাড়া কম, কল-পায়খানার সুবিধা—অনেক কিছু দেখতে হয়। যাই হোক আমিও কিছুদিন ছুটি নেব ভাবছি।"

"ছুটি ? দেবে তোমায় ছুটি ?"

"শুনছি তো আজকাল ছুটি ঝপাঝপ মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে।"

"কত দিনের ছুটি নেবে?"

"দিন পনেরোর। কিন্তু আজকাল কর্তৃপক্ষের যা দয়া তাতে ছুটির মেয়াদ অফুরন্ত না ক'রে দেন।"

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, "আশ্চর্য্য কি!"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বেলা অনেকটা হয়েছে, ভাত দিতে বলি।"

অমিয় বলিল, "এই তো এলাম, একটু জিরোই। খোকা গেল কোথায়?"

"বারান্দায় ওর মার সঙ্গে খুনসুটি করছে হয়তো।"

"আর ছড়া ব'লে ঘুম পাড়াতে হয় না?"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "ছড়া বলতে হয় বইকি, তবে ঘুমপাড়ানি গান আর শোনাই নে।"

সকৌতুকে অমিয় বলিল, "কি শোনাও তবে?"

"শুনবে? খোকন, খোকন, এদিকে এস তো।" বাপের ডাকে খোকন প্রকাণ্ড একটা লাঠি টানিতে টানিতে দুয়ার গোড়ায় উঁকি দিল। অমিয়কে দেখিয়া একটু সঙ্কোচও বুঝি তার হইল, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই।

অতঃপর 'বাবা' 'বাবা' শব্দে টলিতে টলিতে আসিয়া বিশ্বজিতের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; লাঠিটা সশব্দে মেঝেয় পড়িয়া গেল।

বিশ্বজিৎ আদর করিয়া বলিল, "ছড়া শুনবি? খুব ভাল ছড়া।"

খোকা আহ্লাদে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁ।"

বিশ্বজিত খোকাকে দোলা দিতে দিতে আরম্ভ করিল:

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—
বাজা শঙ্খ বাজা,

গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।

সঙ্গে সঙ্গে খোকাও হাততালি দিয়া উঠিল।

তন্ময় হইয়া বিশ্বজিৎ আবৃত্তি করিয়া চলিল :

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা।

চঞ্চল খোকা বেশীক্ষণ ছড়া শুনিবার লোভে বিশ্বজিতের কোলে বসিয়া রহিল না। তাহার তন্ময়তার অবসরে কোল হইতে নামিয়া ভূপতিত লাঠিখানি তুলিয়া লইল ও 'হেট' 'হেট' শব্দে সেই লাঠি টানিতে টানিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বজিৎ তখন আবৃত্তি করিতেছে :

নাহি নাহি ভয় হবে হবে জয় খুলে যাবে এই দ্বার,
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার ;
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে চেতনা,
সুপ্তি-নিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার ॥

অমিয় এত আশ্চর্য্য কোন দিন হয় নাই। তন্ময় হইয়া কবিতা আবৃত্তির ক্ষণে বিশ্বজিৎকে সে যেন আজ স্পষ্ট পরিপূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইল। সামান্য কেরানী সে নহে, সে মানুষ। যেমন মানুষ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তারা

—হিট্‌লার, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা, ষ্ট্যালিন, আতাতুর্ক। এঁদের গোড়ার ইতিহাস কি এমনই অসমুজ্জ্বল ছিল না? সেখানে কি দিন-গুজরানের সঙ্গীন সমস্যা ও দুঃখ-আবর্ত্তের প্রচণ্ড বেগ প্রতিনিয়ত ইঁহাদের নিম্ন-অভিমুখী করিয়া টানিত না? কিন্তু সে দুরন্ত বেগ ইঁহাদের দুরন্ত ইচ্ছার কাছে মাথা নামাইয়াছে। দুঃখে ইঁহারা ভাঙিয়া পড়েন নাই, তাই দুঃখকে পায়ের তলায় ফেলিয়া আজ মাথা উঁচু করিয়া সারা জগতের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বজিৎ রাষ্ট্র গড়িবে না সত্য, সে সুযোগ ও সুবিধা থাকিলেও সে হয়তো রাষ্ট্রনায়ক হইতে পারিত না, কিন্তু দুঃসাহসী দুঃখজয়ীর জয়টীকা তাহার ললাটে প্রথম সূর্য্যকিরণের মত স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অমিয় ভাবিতে লাগিল, এই বিশ্বজিৎই এক দিন বলিয়াছিল, "দুঃখদৈন্যের অতলে যে আমরা তলিয়ে গেলাম, আমাদের টেনে তোলবার কেউ নাই।"

অমিয় উত্তর দিয়াছিল, "টেনে কেউ তুলবে না, নিজের চেষ্টাতেই দুঃখ জয় করতে হবে।"

হাসিয়া বিশ্বজিৎ উত্তর দিয়াছিল, "তাও জানি। মাস-কাবার হোক, আপনিও তা বুঝবেন।"

অনেক বার মাস-কাবার হইয়াছে, ক্রমশঃ গভীর ভাবে সে তথ্য অমিয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। আজ আর সে সদ্য কলেজফেরত ছাত্রের মত বড় বড় কথা বলে না; বৃহৎ স্বপ্ন-দেখার দিনগুলি তাহার ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। রিট্রেঞ্চমেণ্টের খড়্গ যদি বিশ্বজিতের মাথায় পড়ে তো এই সংসারের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অস্বস্তি ঠিক বিশ্বজিতের জন্য নহে। আসলে নিজের ভাবনাই সে ভাবিতেছে।

বিশ্বজিৎ প্রসন্নমুখে বলিল, "শুনলে তো আমার ছড়া, ওতে ছেলের নামে আমিও মেতে উঠি।"

অমিয় বলিল, "তুমি অনেক বদলে গেছ, বিশ্বজিৎ-দা।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কল্পনার আতঙ্কে অনেক সময় আমরা মরে থাকি কি না; কিন্তু আর্য্য ঋষিরা মিথ্যা বলেন নি। ইচ্ছা করলে অনায়াসে আমরা অনেক দুঃখকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।"

"হ'তে পারে এ তোমার ভাববিলাসিতা।"

"হ'তে পারে। ভাবের জোয়ার যে-মুহূর্ত্তে আসে—তখন বস্তুতন্ত্রের পৃথিবীর অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে হয়; সে জোয়ার চলে যায়ও তেমনি অকস্মাৎ, তখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় আর নির্ব্বোধ মনে হয়। কিন্তু বেকার অবস্থার কল্পনা ক'রে কষ্টের শেষ ধাপ অবধি যতই নামছি ততই ভাববিলাসিতা আমায় শক্তিমান্ ক'রে তুলছে, আনন্দময় ক'রে তুলছে; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মত এর মধ্যে অনির্ব্বচনীয় মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি। এই ভাববিলাসিতার মধ্যে আজকাল ফাঁকা মুহূর্ত্ত আবিষ্কার করতে পারি না। এ-জোয়ার যেন প্রত্যহের, তিথি-অনুসারী নয়; এ আসছে—আসছেই। মন আমার কানায় কানায় পরিপূর্ণ।"

বিশ্বজিতের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। হয়তো মনের মধ্যে এই দুঃখজয়ের সাধনা তাহার কোন অপ্রত্যক্ষ মুহূর্ত্তেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অমিয় বলিল, "তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবছ না, বউয়ের ভবিষ্যৎ?"

বিশ্বজিৎ উজ্জ্বল মুখে বলিল, "শক্তি যদি পেয়ে থাকি অমিয়, সে তোমার বৌদিদিরই কাছ থেকে। আমায় মাঝে মাঝে ভাবতে দেখে ও বলত, 'তুমি এত ভাব কেন?' এক দিন চাকরির সঙ্গীন অবস্থা সব খুলে বললাম।

ও সব শুনে বললে, 'যদি তাই হয়, বেশ তো, আমরা দেশে ফিরে যাব'।

'সেখানে গিয়ে খাবে কি ?' বললাম।

ও বললে, 'সবাই যা খায়, ভাত।'

'তা জোটাবার জন্য যে টাকার দরকার হয়, আসবে কোত্থেকে সে টাকা ?'

সত্যি বলছি, অমিয়, সুপর্ণা হাসলে। বললে, 'ভেবে ভেবে তুমি টাকা রোজগারের বন্ধ পথটিতে খুলতে পারবে কি ? তবে দেহ নষ্ট কর কেন ?'

বললাম, 'আমার জন্যে ভাবি নে। তোমাদের যে আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী করেছি—'

'তুমি ভেব না। আমি যত দিন থাকব—খোকার ভাবনাও তুমি ভেব না। ওকে মানুষ করবার ভার আমার।'

অল্প আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই শহরের জন্য তোমার মন কেমন করবে না ? সিনেমার জন্য, জু-গার্ডেনের জন্য, লেকের জন্য ?'

সুপর্ণা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে, 'এ তো শহরের নেশা—শহর ছাড়লে আপনিই যাবে। এখন ওগুলো না দেখলে সময় কাটে না, তাই দেখি ; তখন খোকাকে মানুষ করবার কাজে আর সবই অনায়াসে ভুলব।' একটু থেমে বললে, 'ভয় নেই গো, ভয় নেই, আমি কেরানীর বউ, চাকরি তালপাতার ছাউনি—তা জানি।'

'সব জেনেও কোনদিন একটি আধলা জমাবার চেষ্টা তো কর নি !'

'কেন করব। অতিসঞ্চয়ী শেয়ালের গল্প কি পড়ি নি বইয়ে। জমানো মানেই তো ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাবনা। সামান্য আয়—এক দিনের অসুখে যা খরচ হয়ে যায় ! না, না, যখন মনে হবে সুখে আছি, তখন সব দিক দিয়ে সুখে থাকাই তো ভাল। ভাবনা-চিন্তা ওসব আমার পোষায় না, বাপু।'

সত্যি বলছি অমিয়, ওর কথায় যেন বুকে বল পেলাম; আমার হারানো শান্তি আবার ফিরে পেলাম। আজকে যা পেলাম তাই আমার পরম লাভ, কালকের জন্য সঞ্চয় ক'রে মিছে দুঃখভোগ কেন? এ-যে কত বড় দুঃখজয়ের অস্ত্র তুমি হয়তো বুঝবে না।"

"কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই অস্ত্রের ধার—"

বাধা দিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "জীবনের মেয়াদ কার কত দিন কেউ জানে না! শেষ যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলো জ্বালতে যাওয়া মূর্খতা। যদি জ্বালবার চেষ্টা কর, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিও প্রদীপ। অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থাক্, আমরা সোনার বর্ত্তমানে সাহসী বীরের মত পা ফেলে চলব।" বলিয়া গাহিল:

আগে চল, আগে চল,
আগামী কালের কথা ভেবে আজ কেন হোস চঞ্চল?
আগে চল, আগে চল।

সুপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বন্ধুটিকে কি কবিতা শুনিয়ে রাখবে, খেতে দেবে না? বেলা একটা যে বাজে।"

সস্মিত মুখে বিশ্বজিৎ বলিল, "তোমার দুঃখজয়ের সহজ বার্ত্তাটি অমিয়কে শোনাচ্ছিলাম, শুনে ও অবাক হয়ে গেছে!"

সকোপ কটাক্ষে বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া সুপর্ণা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "দুঃখ তো ম্যালেরিয়া জ্বর নয় যে সহজ কথার কুইনিন-পিল খেলেই জ্বর পালাবে। আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ঠাকুরপো, হাতমুখ ধুয়ে নিন।"

কথাশেষে সুপর্ণা আহারের আয়োজনে মনোযোগ দিল। পরিপাটি করিয়া আসন বিছাইয়া জল-হাত দিয়া সুপর্ণা জায়গাটি মুছিয়া লইল। অতঃপর জলের গ্লাস ও ভাতের থালা দিয়া বিশ্বজিৎকে আহারের জন্য ইঙ্গিত করিল।